কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন। ১২৮৮ হইতে ভাদ্র। ১২৮৯

দ্বিতীয় বৎসর।

কলিকাতা।

৫৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ক্যানিং প্রেসে

শ্রীশশীভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

কল্পনা।

আরাধনা।

কল্পনে!

এস, চারুমতি, এস আরবার
এ বঙ্গ-আসরে উরগো আবার,
গাও নবগীতি সুগভীর স্বরে
ওই ভাঙা বীণা তুলি রাঙা করে।
ছিঁড়িয়াছে তার—কি কাজ ভাবিয়া?
কি কাজ তাহাতে সরমে মরিয়া?
গিরা দিয়া তায় ধর আরবার
ধর নবগীতি—উঠুক ঝঙ্কার
কর তারে তারে অঙ্গুলী তাড়ন
বেহাগ খাম্বাজ সুর-আলা [illegible]
তারা যারা গ্রাম [illegible] ধ্বনি
লক্ষ্ণৌয়ে গজল কিম্বা [illegible]মিয়া
গেওনা, কল্পনে, গেওনা ঢলিয়া
প্রেমের মদিরা এ বঙ্গ-সাগরে
বহিয়াছে বহু প্রবল পাথারে
তাজও বেতাজও নও বেনও—
শেষে ছিল 'নিধু'—গাহিয়াছ তাও,
গাহিয়াছ, কিন্তু কর নিরীক্ষণ
সেই সে কুহকে বঙ্গ অচেতন।

অচেতন বঙ্গ!! গেওনা সে গান,
জীমূত জিনিয়া ধর ঘোর তান
জাগে যদি কেহ সে রব শুনি।

কল্পনে!

তাই বলি আজ সাজি দিব্যসাজে
জাগাও এ বঙ্গে গভীর আওয়াজে,
কর তারে তারে আঙুল-আঘাত
ফাটুক হির্মাদ্রি—ছুটুক প্রপাত—
জ্বলুক অনল [illegible]—
[illegible]
[illegible]
[illegible] শ্রেণী [illegible]—
দেখুক বিমানে আখণ্ডলগণ
হ'ক্ ছিন্ন তারে কুসুম বর্ষণ
পার যদি গাও এ হেন গান।

মৃতসঞ্জীবনী সুরে বাঁধি বীণা
হর হর বম্ তাধিনা তাধিনা
গাও, সুরবালে, গাও একবার
হয় যদি তবু জীবন সঞ্চার
অসাড়ের দেহে। কাঁদিয়াছ বটে

দেখুক সকলে ভাবের দর্পণ
বলিতে যা আছে বল সবাকারে
কাজ কি সরমে?—ভয় কিবা কারে?
কেহ তব নয়—তুমি নহ কার
তুমি সকলের—সকলে তোমার
গাও উচ্চে গাও মরমগান।

জ্বলুক ও তারে জ্বলন্ত অনল,
শত উল্কাপাত চটুক প্রবল,
ডাবা ডাবা ডাডা প্রতি সুরে সুরে
উঠুক উঠুক অশনি ঝঙ্কারে।
প্রাণের যা কিছু প্রাণপ্রদ তার
মহা উত্তেজক উগ্র সুবাসার
মৃতের যা কিছু মৃত-সঞ্জীবনী
পতিতের যাহা পতিতপাবনী
যা কিছু সকলি একত্র করিয়ে
মহাগানে আজ ভবন মাতা'য়ে
দাও তবে দাও বীণায় টান।

ঐরাবত তুণ্ডে—মহোক্ষের শৃঙ্গে
ভীম হালাহলে—কালাগ্নির অঙ্গে
কোটি উল্কাপিণ্ডে—দ্বাদশ তপনে
বিদ্যুৎ প্রবাহে—মেঘের গর্জ্জনে
সাগরের তলে—জাহ্নবী-উচ্ছ্বাসে
নক্ষত্র ভুবনে—বায়ুর নিঃশ্বাসে
নরকের দ্বারে—রৌরব ভীষণে
স্বর্গ মর্ত্ত বসা—যা আছে যেখানে
হ'ক ভীতিময়—হ'ক সে ভীষণ
দেখাও সকলে খুলিয়া দর্পণ
দেখুক সকলে অবাক্ হ'য়ে।

দেখাও সকলে—দেখুক সকলে
অই বারিরাশি কেমনে উছলে,
কেমনে সে জলে জলদ সম্ভব,
মুষলের ধারা অশনির রব,
সাহারা মাঝারে কত বালুরাশি
খনির ভিতরে কেন মণি-হাসি?
ভিসু'ভিস্ ভেদি কেন অগ্ন্যুৎপাত?
কেন নায়াগ্রায়ায় সে উচ্চ প্রপাত?
নরকে নন্দনে—ইণ্ডিয়া ভারতে
কাচে ও কাঞ্চনে—কেথা পারিজাতে
দেখাও প্রভেদ দেখুক চেয়ে

চিনি চিনি পুনঃ চিকাবির বোলে
হিল্লোলিয়া স্বর গাও সুররোলে
প্রাচীন গিরীশ—প্রাচীন মিশর
তারোচেয়ে কত সুপ্রাচীনতর
এ ভারতভূমি আর্য্যপ্রসবিনী
কেন তায় আজ শিথায় যুনানী?
শিখায় যদিরে ভাগ্যের লিখনে
না শিখি' নকল শিখেনা সে কেনে
যে মন্ত্রে তাদের হেন তেজোরাশি
যে বলে দুর্ব্বার বৃটানিয়াবাসী
সে জাতিত্ব, শিল্প শিখেনা কেন?
তাই বলি দেবি বীণাবিধায়িনি!
গাও উচ্চে গাও মধুরভাষিণি!
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ন্যায়, দরশন
কৃষি, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসাদর্পণ,
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, দামামা বাজনা,
কোদণ্ড টঙ্কার, অসির চালনা,

...বিবচন, আত্মোৎসর্গব্রত,
...রো যাহা আছে—অন্য কব কত ?
...মি ডিমি ডিমি রণ রণ নাদে
...ও সুগভীরে গাও ঘোর হ্রাদে
ঘুম ভেঙে উঠে সবাই যেন।
...রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী
...সঙ্গে লয়ে যাও বীণাপাণি,
বের পারে যুরোপসদনে
...শ, বৃটান, রুশিয়া, জর্ম্মানে,
...চেয়ে দূরে—আমেরিকাপুরে
জ্যোতিঃ যথা জ্বলে ঘুরে ঘুরে
...সে পুরাণ তিমিরত তাতারে,
...ন্য, তুরকি, আরব কান্তারে,
...বা স্বদেশে—সে কুরুশ্মশানে,
...ভস্মময় অই রাজস্থানে
যাও যবে দেবি ছুটিয়া যাও।
...রে করি দেখাও সবায
...ছে কোথায়, কি ছিল কোথায়,
...নাহি কোথা, থাকে কি বা হ'লে
উচ্চে গাও শুনাও সকলে,
...মূর্চ্ছনা গমকে গমকে,
...আকাশ চপলাচমকে,
...আগুনের স্ফুলিঙ্গ সিঞ্চন,
...দেহ পুনঃ লভুক চেতন,
...মন্ত্রে আজ সুরকণ্ঠ সাধি
...ই, কলপনে, তোমারে আরাধি
সপ্তমে চড়া'য়ে দীপকে গাও।
"দেখ্‌চেয়ে, দগ্ দেগ্ অই আগে"
গায় কলপনা দীপকের রাগে।
গায় কলপনা কাঁপে চরাচর,
কাঁপে অষ্টবসু কাঁপে বৈশ্বানর,
চন্দ্র সূর্য্য যম দশ দিক্‌পাল
কাঁপিল আকাশ কাঁপিল পাতাল,
মরভূ, কান্তার, নদ, নদী, গিরি
যেখানে যা ছিল কাঁপে থর থরি
কাঁপা'য়ে সঘনে কাঁপিয়ে আবার
অই বীণাতারে উঠিছে ঝঙ্কার
গায় কলপনা—"দেখরে চেয়ে
কি মহাশ্মশান! কিবা অন্ধকার!
ধূ ধূ শব্দে চিতা জ্বলে অনিবার!
শবমাংস লোভে কুক্কুর শৃগাল
অই সে শ্মশানে ফেরে পালে পাল।
পাখশাট মারি অই সে গৃধিনী
দগ্ধ অস্থি ল'য়ে করে টানাটানি।
ভূত প্রেত দানা কবন্ধ শরীর
হিহিঃ হিহিঃ হাসে, পিইছে রুধির।
বম্ বম বম্ বাজাইয়ে গাল
অই নাচে তাল, নাচিছে বেতাল,
নাচিছে চামুণ্ডা আপনি ধেয়ে।
তাধিয়া তাধিয়া—মাভই মাভই,
শবোপরে বামা নাচে থেই থেই!
লক্ লক্ লক্ বিকট রসনা
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বালার্চ্চি শোভনা
গলে মুণ্ডমালা মেখলা কটিতে
ঝরিছে শোণিত কাটামুণ্ড হ'তে
অবদ্ধ চিকুর চণ্ড খড়্গাধার

দে দে দে রণ দে ছাড়ি হুহুঙ্কার
জ্বালিয়ে খর্পর শ্মশান বাসিনী
মহাশক্তি কালী কালের ঘরণী
অই নাচে দেখ্ নয়ন মেলে।
জাগিতে জাগা'তে যদিরে বাসনা
বাক্যব্যয়ে স্বধু হ'বেনা হ'বেনা।
এ শ্মশানে কর শক্তি আরাধনা।
শক্তি আরাধনা! অন্য পূজা নাই!
আর্য্য কি অনার্য্য হও ভাই ভাই।
কিসের কাফের কিসের যবন?
জৈন বৌদ্ধ শিখ্ ব্রাহ্ম হিন্দুগণ?
এক পদে যবে সবারি দলন,
একই শৃঙ্খলে সবারি বন্ধন
কেন তবে আর? ভুল ধর্ম্ম নানা
এক প্রাণে কর শবের সাধনা।
শবের সাধনা—শক্তি আরাধনা।"
তারে তারে তারে গায়িল কল্পনা।
শক্তি আরাধনা! গাও পুনঃ তবে
শত বজ্র জিনি গভীর আরাবে,
শক্তি আরাধনা! গাও মহাগান
ভাঙ্গিয়ে পাষাণ হ'ক খান খান,
হ'ক হৃদ্‌পিণ্ড পুড়ে ছার খার
শক্তি আরাধনা! দীপকের ধার!
উঠুক ব্রহ্মাণ্ড উঠুক জ্বলে।

আর্য্যচিকিৎসা।

(২০৮ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

[চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।]

চিকিৎসা অতি কঠিন ব্যাপার। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা ও অনুমান আছে। শরীরের মধ্যগত দৈবঘটিত ক্রিয়া সকল চিন্তা করিয়া রোগ নির্ণয় করতঃ ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বিপুলবুদ্ধিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের ও এক এক সময় বুদ্ধি আকুলীভূত হইয়া উঠে। অনেক সময় চিকিৎসককে কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

অতএব চিকিৎসক মাত্রেরই শাস্ত্রের যথাসাধ্য যথার্থ মর্ম্মাবগত হইয়া রোগের কারণ, রোগ শান্তির উপায়, ও রোগ যাহাতে না হয় তদুপায় নির্ণয় করিতে, এবং প্রিয়ভাষী, সত্যপরায়ণ, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, তার্কিক, মেধাবী, কার্য্যতৎপর, ও বহুদর্শী হইতে চেষ্টা করা অতীব আবশ্যক। ইহাতে যাঁহারা অবহেলা প্রদর্শন করেন তাঁহারা চিকিৎসক হইবার যোগ্য নহেন। অন্ধ ব্যক্তি হস্ত প্রসারণ করিয়া যেরূপ ভয়ে ভয়ে রাজপথে পরিভ্রমণ করে, চিকিৎসাকালে তাঁহাদিগের অবস্থাও সেই রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেই যে চিকিৎসক কোন স্থানে অকৃতকার্য্য হইবেন না, তিনি সকল রোগই অক্লেশে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। পৃথিবীর মধ্যে এমন চিকিৎসক দুর্লভ, যিনি কখন কোন স্থানে বিফলপ্রয়াস হন নাই বা হইবেন না। চিকিৎসকের রোগটী সাধ্য, যাপ্য কি অসাধ্য এইটী নির্ণয় করিয়া স্থিরভাবে চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই যথেষ্ট হইল।

[চিকিৎসা বিধি।]

রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র তৎপ্রতীকারার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। কোন রোগকেই সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। অগ্নি, শস্ত্র ও বিষ অল্প পরিমিত হইলেও যেরূপ বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, ব্যাধিও সেই রূপ অতি সামান্য বলিয়া প্রথমে উপেক্ষিত হইলে, পরে অসাধ্য হইয়া উঠে।

রোগ অসাধ্য হইলে, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল উত্থানশক্তিরহিত ও আহারহীন হইতে থাকে, এবং অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। অতএব রোগের সূত্রপাত হইলেই তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। কোন রোগই একেবারে অসাধ্য হইয়া প্রকাশ পায় না। উহা প্রথমাবস্থায় অত্যল্প রূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ কুপথ্যাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

[রোগ।]

শরীরে বায়ু পিত্ত, কফ, ও সপ্তধাতু অর্থাৎ রসরক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এবং মল বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে রোগ কহে।

রোগ তিন প্রকার ; আগন্তু, শারীরিক ও মানসিক। আঘাত, অগ্নি-দাহ, বিষদোষ ও বাত্যাদি জন্য যে ব্যাধি জন্মে, তাহাকে আগন্তু; ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য দ্বারা ও বায়ু পিত্ত কফ ইহাদের বিকৃতি ভাব হইতে যে ব্যাধি জন্মে তাহাকে শারীরিক ; এবং ক্রোধ, শোক, লোভ, ভয়, হর্ষ, ঈর্ষা, দৈন্য, ও কাম ইহাদের বিকৃতি ভাব হইতে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে মানসিক রোগ কহে।

রোগের অবস্থাও ত্রিবিধ। সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। যে রোগে পীড়ার কারণ, পূর্ব্বলক্ষণ, ও লক্ষণ অল্প হয়, বাতাদির গতি একরূপ থাকে, অত্যল্প ঔষধ দ্বারা অতি শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে উপকার দর্শে এবং পীড়ার নবত্ব থাকে, তাহা সাধ্য। যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য হয় না, এবং মারাত্মকও নহে তাহা যাপ্য। অন্তর্ধাতুস্থ, নানাধাতুস্থ, মর্ম্মস্থানস্থ, বহুকালিক, ত্রিদোষজ বা সর্ব্বকালিক এই সকল রোগ অসাধ্য।

[ঔষধ।]

যাহাদ্বারা রোগ শান্তি হয়, তাহার নাম ঔষধ। ঔষধ তিন প্রকার। দৈবব্যাপাশ্রয়, যুক্তিব্যাপাশ্রয়, ও সত্বাবজয়। বিবিধ মন্ত্র, মাঙ্গল্য কর্ম্ম, ঈশ্বরোপাসনা, স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, গায়ত্র্যাদি পাঠ, তীর্থ যাত্রা ও স্থান পরিবর্ত্তনাদি দৈবব্যাপাশ্রয় ঔষধ। পথ্যাহার ও রোগনাশক দ্রব্যাদি যোগকরণ যুক্তিব্যাপাশ্রয় ঔষধ। এবং দেহের অনিষ্টকর রূপ রসাদি হইতে চিত্তনিবৃত্তকর কার্য্যসমূহ সত্বাবজয় ঔষধ।

ঔষধ প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইলেই, তাহা প্রয়োগ করা উচিত। অবসর নষ্ট করা কোন মতে বিধেয় নহে। যে ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহার মাত্রা ও গুণ বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া তাহা প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন, বরং চিকিৎসা না হয় সেও উত্তম, উত্তপ্ত লৌহখণ্ড ভক্ষণ করাও বরং শ্রেয়, তথাপি অবিজ্ঞাত ঔষধ অনুপযুক্ত মাত্রায় কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে।

পরিমাণ ও সময় বিবেচনা করতঃ যুক্তি পূর্ব্বক জ্ঞানানুসারে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা সাধ্য রোগের চিকিৎসা করাই বিধি।

অসাধ্য রোগের ঔষধ নাই। যিনি ঔষধদ্বারা অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা

করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার জনসমাজে কখনই যশঃ লাভ হয় না। উত্থানে অসমর্থ কূপে পতিত পুরুষকে হস্তাবলম্বন করতঃ বলের সাহায্য প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি যে রূপ শীঘ্র অক্লেশে উপরে উত্থিত হয়, ঔষধ সেইরূপ সাধ্য রোগীর রোগ যাতনাদি সত্বর নিবারণ করিয়া তাহার সুস্থতা সম্পাদন করে।

সাধ্য রোগ মাত্রেই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয়। কিন্তু কুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলে সাধ্য রোগও সহস্র সুউপায় সত্বে আরোগ্য হয় না। যে কোন ঔষধ হউক, তাহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে বহুদৃষ্টকর্ম্মা সুনিপুণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কারণ তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুচিকিৎসকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় অসাধ্য রোগও যাপ্য হইতে পারে। সাধ্য রোগ যে অল্পায়াসে নিবারণ হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

(ক্রমশঃ)

হেতু—ধূমাৎ।

আজ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর ভূতক্রোড়ে লুক্কায়িত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষ একটি ভীষণ তরঙ্গের প্রচণ্ড অভিঘাতে আসমুদ্র আন্দোলিত হইয়া উঠে। সে বিধ্বংস প্রলয়ঙ্কর ঘটনাবর্ত্তের বিবরণ অতি রোমহর্ষণ ও ভীতিজনক। এখনও সে কথার স্মৃতিমাত্রে বিষাদ ও আতঙ্কে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, এখনও ইতিহাসে সে ভয়ঙ্কর রুধিররঞ্জিত অংশ পাঠকালে হৃদয় গভীরতম আশঙ্কাসাগরে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু, কেন এ ঘটনা সংঘটিত হইল? বৃটীষ বৈজয়ন্তী তখন ভারতের দিগ্‌দিগন্তে উড্ডীন হইতেছিল, বৃটীষরাজের দুর্ব্বার সৈন্যে ভারতক্ষেত্র ছাইয়াছিল, তবে কোন্ অমানুষ সাহসে মুষ্টিমাত্র হিন্দু সৈন্য এই দুষ্কর কার্য্য সংসাধিত করিল? ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় সমুদ্রতুল্য প্রশান্ত, সমুদ্রতুল্য প্রশান্ত সে হৃদয়ে কি এমন বাত্যা বহিয়াছিল যাহাতে এই ভুবনবিলোড়ন তরঙ্গাভিঘাত সমুত্থিত হইল?

প্রচণ্ড তরঙ্গে প্রচণ্ড বাত্যাই সম্ভব; সম্ভবমত সে প্রচণ্ড বাত্যাই বহিয়াছিল। "মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"—ইহাই ভারতীয়দিগের আমজ্জ চিরন্তন হৃদ্গত বিশ্বাস এ বিশ্বাস সহজে বিচলিত হইবার নহে; সহজেও তাহা বিচলিত হয় নাই, সহজে রাজভক্ত ভারত সৈন্য রাজদ্রোহ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই।

তুমি রাজা, তুমি একজন সামান্য হিন্দুকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিতে আদেশ কর, নিঃশব্দে তোমার সে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে; ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্মুখে দণ্ডায়িত করাইয়া তাহার মস্তক ছেদনের জন্য শাণিত কৃপাণফলক উত্তোলিত কর, নিঃশব্দে তোমার সে অসিব আঘাতমুখে আপন মস্তক বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্মভয় দেখাইওনা, তাহার সনাতন ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাইওনা; মেষশাবক আর মেষশাবক থাকিবে না, মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। এই কারণেই তেমন নিরীহ শান্তিপ্রিয় হিন্দুসেনা উন্মত্ত হিংস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। অন্ধ বিশ্বাসে হউক, অমূলক জনশ্রুতিতে হউক এই ধর্ম্মের অবমাননাশঙ্কায়ই সে লোমহর্ষণ বিপ্লবে ভারতের শ্যামল ক্ষেত্র ইংরাজরক্তে প্লাবিত হইয়াছিল। মৌলিক কারণ অন্যান্য সহস্র থাকিতে পারে; কিন্তু যদি সে টোটাব্যবহারের আদেশ বাহির না হইত, যদি সে টোটা সম্বন্ধে অন্যায় অসত্য জনরব সমূহ না উঠিত, তাহা হইলে কখনই এ ঘটনা সংঘটিত হইত না। হিন্দুগণ জানিল, ইহা গোবসা দ্বারা প্রস্তুতীকৃত, মুসলমানগণ শুনিল টোটায় শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত, অশুভক্ষণে লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ এ বিষয়ে কোন ও মনোযোগ করিলেন না—ধূমায়িত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষ টলমল করিয়া উঠিল, রক্তে নদী বহিল, প্রবলপ্রতাপ বৃটীষ গভর্ণমেণ্ট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন, দিগ্‌দিগন্তে প্রজাসমূহ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। এতক্ষণে চেতনা জাগিল; গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন, ভারতীয়ের নিকট ধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নম্বেবর মাসের প্রথম দিবসে শ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে রাজকর্ত্তব্যগুলি একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে লিপিবদ্ধ হইল। প্রজাবর্গ অভয় পাইয়া আশ্বস্ত হইল। লিখিত হইল—

"Firmly relying ourselves on the truth of Christianity, and acknowledging with gratitude the solace of religion, we disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our royal will and pleasure that none be in any wise favored, none molested or disquicted by reason of their religious faith or observances; but that all shall alike enjoy the *equal and impartial protection* of law; and we do *strictly charge and enjoin* all those who may be in authority under us that they *abstain* from all interference with the religious relief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure."

প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত হইল বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। প্রতিজ্ঞাপত্রের কয়টি কথাই বা এতাবৎ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে? পত্রের কথা পত্রেই রহিল, কালে আবার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ আরম্ভ হইল। বিশেষ তখন বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, ভারতের নূতন সিংহাসনে নূতন প্রতিনিধি বসিয়াছেন, নূতন নূতন পদে নূতন নূতন কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত হইয়াছেন, সে পুরাতন কথা আর নাই। অনেকে সে বিদ্রোহের কথাও ভুলিল, যাহারা বা ভুলিতে পারিল না, তাহারাও প্রতিহিংসাবশে সে সমস্ত ভুলিতে চেষ্টা করিল। বহুবর্ষ বনবাসের পর বুর্বোঁরাজ ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও পূর্ব্বের কোন বিষয় ভুলিতে পারেন নাই, বহুতর নির্য্যাতনের পরও অনেক ইংরাজ পুর্ব্বতন স্বভাব ভুলিতে পারেন নাই। প্রজার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করণে এতাবৎ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নিরীহ ভারতবাসীগণ এখনও বড় একটা কিছু উচ্চবাচ্য করে নাই। কি করিবে? মধ্যে ২ মনের দুঃখে ক্রন্দন করে, মধ্যে ২ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ সকলের হইয়া কাঁদিয়া ২ উচ্চৈঃস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া থাকেন; সে রোদনধ্বনি অনেকের নিকট পৌঁছে না, অথবা তাহা হইলেও অনেকে শুনিয়া শুনেন না; কাজেই হতভাগা ভারতবাসী নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া নীরবে নূতন আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহা কি ন্যায়ানুগত? শুনিয়াছি, খৃষ্টধর্ম্মের সততা অনেক, এ ব্যবহারপ্রণালী কি খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত? আমরা অজ্ঞ, রাজনীতিশাস্ত্র বুঝি না, একবার

একটি কথা বলিয়া অভয় দিয়া আবার কিছুকাল পরে সে কথার সম্যক্ বিপরীতাচরণ করা কোন্ রাজনীতিশাস্ত্রসম্মত তাহাও জানি না; কিন্তু এরূপ কার্য্যের পরিণাম কি কখনও মঙ্গলকর হইবে? মাত্র জনরবে যদি তাবৎ ভারত হৃদয় অমূল আলোড়িত হইয়া উঠিতে পারে, প্রত্যক্ষ—একবার নয় বার বার—এ প্রকার ব্যবহারে যে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কে জানে?

গোহত্যা লইয়া সে দিন অমৃতসহরে যে কি অসন্তোষকর ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল তাহা কাহার স্মরণ নাই? মৃজাপুরে ও না জানি সে দিন কি তুমুল কাণ্ডই ঘটিত! আবার—আবার এই মুলতানের ব্যাপার! জানি না, আজও হিন্দু মুসলমানে এ প্রকার বিবাদ ঘটে কেন? হিন্দুর ও যে দশা মুসলমানের সেই সমদশা, হিন্দু ও ভারতের মুসলমানও ভারতের, তবে আজও কেন পরস্পরে এ মনোমালিন্য, কেন পূর্ব্বের ন্যায় কথায় ২ শত্রুতাসাধন? জগদীশ! তোমার কি অসন্তোষ হইয়াছে জানি না, তোমার শাপে ভারতের সর্ব্বনাশ যথেষ্ট হইয়াছে, আর এ মৃতপ্রায় দুই জাতিকে গৃহকলহে কেন জর্জ্জরিত কর প্রভু! মনে তো হয় না, যদি আবার কখনও ইহার প্রতি সুপ্রসন্ন হও, আবার যদি কখনও উঠিবার চেষ্টা করিতে পারে, এ দুইটি বাহুই তাহার সহায়; এককালে এ দুই বাহুর উপর ভর না থাকিলে সে চেষ্টা করিতে পারিবে না, দুর্ব্বল এ বাহু দুটি অনর্থক গৃহবিবাদে কেন দুর্ব্বলতর করিতেছ দয়াময়! কিন্তু, ইংরাজ, তোমার কি ইহা উচিত হইয়াছে? তোমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাস্য থাকিতে পারে, তোমার দেখাদেখি অদ্যকার সভ্যতাভিমানী দুই একটি যুবকের সে জ্ঞান সম্ভাবিতে পারে, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য সে দিনকার সে সম্পাদকশ্রেষ্ঠ তৃণখণ্ডের ন্যায় অসার ও লঘু যুক্তি সকল প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার কি ইহা উচিত হইয়াছে? সম্পাদক যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, যে যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া মহামতি রো বাহাদুর মুসলমানদিগের প্রতি পক্ষপাতিতা করিয়াছেন তাহা বড় হাস্যের কথা। যুক্তি হইল, মুসলমান রাজ্যে যদি হিন্দুরা গোহত্যা সকল অবাধে দেখিতে পারিত, এখনই বা না পারিবে কেন?—উত্তম যুক্তি। তবে তোমরা হইতেছ ইংরাজ, তাহারা ছিল মুসলমান—

তোমাতে ও তাহাতে প্রভেদ? মুসলমান অত্যাচারী, ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ এ কথা তবে কে বলিবে? হইতে পারে তোমরা সাধারনের কথা তত গ্রাহ্য কর না—ভালই; কিন্তু ইহাই কি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়িক কার্য্য? একজন ডেপুটি কমিশনারের যথেচ্ছার নিকট ভারতেশ্বরীর প্রতিজ্ঞার মূল্য কি এতই সামান্য? স্বচ্ছন্দে রো বাহদুর একটিবার ও হিন্দুদিগের মুখ তাকাইলেন না, মুসলমানদিগের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার নিজের যথেচ্ছা সাধন হইল বটে; কিন্তু একবার কি ভাবিয়াছিলেন পরিণামে ইহার কি ফল দর্শিবে? ইহাতে রাজ্যমধ্যে কত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে?

অশান্তি!—মিথ্যা নহে, আমরা অমূলক ভয়ে ভীত হই নাই—অশান্তি বটে। হিন্দুহৃদয় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, ধর্ম্মের আঘাতের ন্যায় হিন্দু অন্য গুরুতর আঘাত জানে না; আজ সেই আঘাতে আহত হইয়া সকলে প্রাণে বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। মিরর (Indian mirror) বলেন, জনরব—শিখ্ এবং হিন্দুসৈন্যগণ গম্ভীর ভাবে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রাণালীর প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহাই বলিতেছিলাম, জানি না পরিণামে কি ফল দর্শিবে? জানিনা যে ধূমের সঞ্চার হইতেছে ইহাতে কি অগ্নি জলিয়া উঠিবে! আমাদের এ আশঙ্কা মূলশূন্য নহে, ধূম অগ্নির হেতু; অতএব যাহাতে সে অগ্নি সন্ধুক্ষিত না হইতেই এই ধূম তিরোহিত হয় তাহার উপায় বিধান আশু কর্ত্তব্য। রিপনবাহাদুর এক্ষণে বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি, ধার্ম্মিকপ্রবর বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি, তাঁহার শাসন কালে প্রজার এরূপ ধর্ম্মাবমাননা বড় দুঃখের কথা। হিন্দুরা অন্য কিছু চাহে না, নূতন আইনের প্রার্থী তাহারা নহে, মুসলমানদিগের সহিত সমতোলে থাকিতে পাইলেই যথেষ্ট অনুগৃহীত হইবে। মহারাজ্ঞী ও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তবে কোন্ গ্রহবৈগুণ্যে এরূপ অঘটন ঘটিতেছে বলিতে পারি না। সার জন লরেন্স প্রজার মনোভাব বুঝিতেন, তাহা বুঝিয়াই অতি বিচক্ষণতার সহিত তিনি আইন করেন, গো সকল সহরের বাহিরে নিহত হইবে, এবং সেই সকল গোমাংস বাজারে এরূপ ভাবে বিক্রীত হইবে, যেন হিন্দুদিগের বিরক্তির কেনও কারণ উপস্থিত

না হয়। ইহা বড় অধিক দিনের কথা নহে, মূলতানের ডেঃ কমিশনারের নূতন কিছুই করিতে হইত না, একটু অমুষ্ণমস্তিষ্কে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এ হিতকর আইনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, তাহা না বুঝিয়া ভাল করেন নাই। গণনা করিলে রাজকীয় সৈন্যবিভাগে শিখ্ ও হিন্দুসৈনাই বহুতর। এ বহুতর সৈন্যের যুগপৎ অসন্তোষপ্রকাশ বড় শুভ চিহ্ন নহে। ঈশ্বর জানেন, নানা সাহেব আজও জীবিত আছেন কিনা, ঈশ্বর বলিতে পারেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত একবিন্দুও শোণিত আজও পঞ্জাবশিরায় প্রবাহিত হয় কি না; কিন্তু অচিরেই যাহাতে এ বহ্নিসূচক ধূম রাশি নির্দ্ধূমিত হইয়া যায় তাহার প্রতিবিধান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা ইংরাজ রাজ্যের পক্ষপাতী, তাহাদিগের সুবিচার গুণ আমরা উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া থাকি, সামান্য কারণে অনিষ্ট ঘটিলে আমাদিগের ভয় হয়, আমরা ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু, আমরা ভয়ে বলি আর ক্ষোভে বলি, বহ্নি যে জ্বলিতে পারে না এ কথা নিশ্চয় কে বলিবে? হেতু—ধূমাৎ।

বাঙ্গালার কবি ও কাব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিহৃদয়ে সকল স্রোত প্রশান্ত ভাবে বহমান দেখিতে চাহি না। তাহার কারণ আমরা অন্যদেশীয় কবিদিগের মত তেমন গভীর রূপে কোন একটি ভাবকে অনুভব করিতে সক্ষম নহি, ঘটনা ঘটে, আমরা তাহা স্বচক্ষে দর্শন করি; কিন্তু সেই সকল বিষয় আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না—হৃদয়স্থ পদ্ম পত্রের উপর পড়িয়া একবার মাত্র টলমল করিয়াই নিমেষের মধ্যেই গড়াইয়া যায়। আমাদিগের নিকট এমন কিছুই ঘটিতে পারে না যাহা আমাদের স্থূল চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক এই হৃদয়ের ভিতর একটা গুরুতর আন্দোলন করিয়া তোলে। যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্যহৃদয়ে থাকিয়া মনুষ্যকে উত্তেজিত করিতে

পারে সেই সকল মনোবৃত্তির কয়টা আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা যে কেবল অল্প অনুভব করিতে পারি তাহা নহে আমাদের কল্পনাও তাদৃশ পরিমার্জ্জিত নহে, আরও একটি আমাদের মহৎ দোষ—ঔদাসিন্য। আমরা সকল বিষয়েই উদাসীন, অলস ও নির্জ্জীব। এই বৈরাগ্যই বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে দিতেছে না; সেই নির্জ্জীবতাতেই আমরা সকল বস্তুই অর্দ্ধমুদিত নেত্রে দর্শন করি, কোন একটা স্থান দিয়া গমন করিলে আমরা চারিদিকে না চাইয়া মাটির দিকে চাইয়া চলি। প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্যের জন্মভূমি যে কোন স্থানে, তাহা আমাদিগের অনেক কবিরা দেখিতে পান না। পাঠক দেখুন প্রণয়ের দুইটি চিত্র আমরা উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিতেছি। একটি——

"কোথায় প্রাণেশ মম জীবন ঈশ্বর!
হৃদয় সরোজরবি! এ ঘোর জঞ্জাল
হ'তে কে বাঁচাবে বল প্রাণেশ্বর!
তোমার আদরমাখা যতনের ধন!
বুঝিলাম নাথ!
ভালবাসা মহা যজ্ঞ হ'ল না পূরণ।"

কষ্টে পড়িয়া নায়িকা নায়ককে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে "জীবন—ঈশ্বর" "হৃদয়-সরোজ-রবি"—তোমার যতনের ধনকে রক্ষা করিতে পারিলে না সুতরাং তোমার (অথবা আমার) ভালবাসা মহাযজ্ঞ পূর্ণ হইল না। ভালবাসা মহাযজ্ঞ পূর্ণ হইল না বলিয়াই নায়িকা অধীরা হইয়া পড়িলেন। ইহাই কল্পনার চরমোৎকর্ষ হইয়াছে! আর একটি দেখুন কবির কল্পনা কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহার নমুনাস্বরূপ আমরা এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি— সূর্য্য সহসা ডুবিয়া গেল, ভীষণ ঝড় উপস্থিত হইল, সাগরের ঢেউ দাপটে বেলায় ঝাঁপিয়া পড়িল, চপলা আকাশে মুহূর্মুহু বাণ হানিতে লাগিল, মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল, জলধির ফেণরাশি আকাশে বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল, এমন সময়ে——

"এঘোর প্রলয়ে—দাঁড়ায়ে কে ওই?
হের কল্পনা, হের গো ফিরে,
মথিত সাগর উরস হইতে

আবার কমলা উঠিল কিরে ?
ওই যে দামিনী, নড়েনা চড়েনা,
চাহিয়ে তাপস-কুঠির পানে,
ধরিয়ে একটি অশোকের ডাল,
তাকায়ে রয়েছে আপন মনে।
কে জানে কোথায় বইছে ঝটিকা,
কে জানে কোথায় ছুটিছে জল
কে জানে কোথায় ভাসিছে আঁচল
ভাসিছে ফুলের গহনা দল।
আসুক বিজয়, কহিব তাহারে
জানিয়াছি তার মমতা যত,
এই মরমের নিভৃত বিজনে
কে জানিবে ঝড় বহিছে কত ?

এমন অভিমান-পোরা ভালবাসা কয়জন কবি বর্ণনা করিতে পারে ? কল্পনার ন্যায় ক্ষুদ্র পত্রিকায় এরূপ প্রকার সমালোচনা করিলে প্রস্তাবিত বিষয় দীর্ঘকালে সম্পূর্ণ হইবার আশঙ্কায়, আমরা এক্ষণে এ বিষয়ের মীমাংসা পাঠকের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি।

সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে কবিতার প্রকৃত লক্ষণ গুলি আমাদের স্মৃতির প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জলদ অক্ষরে অঙ্কিত রাখা কর্ত্তব্য। কেন না সাহিত্যের শৈশব অবস্থাতেই মানব হৃদয় কবিতা রূপেই প্রকাশ পায়, কবিতাই সাহিত্যের মূলভিত্তি, কবিতাই সাহিত্যের জীবন। সুতরাং বাঙ্গালার কাব্য সমালোচনার পূর্ব্বে কবিতা সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলা উচিত। সেই জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতের সহিত আমাদের মত একত্র করিয়া পাঠক সমীপে প্রকাশ করিব।—

প্রথমতঃ "বঙ্গ-সাহিত্য" (১) কার বলেন, "যে ছন্দোময়ী রচনা পাঠ করিলে মনে কোন একটি বিশেষ প্রতিমা বিভাসিত হয়; বা কতকগুলি ভাব পরম্পরার উদ্রেক হয়; এবং সেই প্রতিমা বা ভাব পরম্পরার আবির্ভাবে হৃদয়ের কোমলতর রস গুলি উত্তেজিত হয় সেই রচনাকেই কবিতা বলে।" গ্রন্থকারের এ কথায় আমাদের তৃপ্তিলাভ হইল না,

(১) শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত সি এস প্রণীত।

উপরোক্ত কবিতার লক্ষণগুলিকে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমেই কোমলতর রস কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে, কিন্তু লেখক সে বিষয়ে কোন যত্ন লন নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন সমগ্র রস গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি কোমল আর কতকগুলি উগ্র বা কদর্য্য। করুণ, শান্তি বা ভক্তি বা প্রেম এই সকল কোমল—আর বীভৎস, রৌদ্র বা ভয়ানক ইত্যাদি রস উগ্র—সুতরাং ইংরাজি Finer Sensibilities. অর্থাৎ কোমলতর রস গুলি বলিতে উপরি উক্ত দুই ভাগের একটিকে মাত্র বুঝাইবে। গ্রন্থকারও যে একটি বিভাগের উপর লক্ষ্য করিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন না তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন Finer Sensibilities করুণ, ভক্তি বা প্রেম ইত্যাদি রসই কোমলতর রসের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলে হাস্যরসটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে ইহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হাস্য রসটিতে অবস্থা বিশেষে কোমলতর ও কদর্য্যতার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে এই কূটতর্কের মীমাংসা করিতে বলিতে পারি না, কেন না তিনি স্বয়ংই তাহার পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, হাস্যরস কবিতার সীমাগত নহে। হাস্য রস যে কিসে কবিতার সীমাগত নহে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি—যে মহাকবিরা হাস্য রসটি যে কবিতার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন তাহা নহে, পাছে প্রস্তাবিত রচনা বিশেষের প্রকৃতজীবনের হানি করে এই হেতু তাঁহারা সেই সেই রচনাতে হাস্য রসের পূর্ণ বিকাশ করিতেন না, বরং তাঁহারা জানিতেন হাস্য রসের ঈষৎ আভাসের দ্বারা মহাকাব্যের উদ্দেশ্য রক্ষা করে। কালিদাস প্রচলিত রীত্যনুসারে মাধব্যের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা নাটকের গাম্ভীর্য্য যতই গাঢ়তর হইতে লাগিল মাধব্যের বিদূষকত্ব ততই হ্রাস হইয়া গৌণভাবে বিকাশ পাইতে লাগিল।" যদি "প্রকৃতির মুখে দর্পণ ধরাই প্রকৃত কবির কার্য্য হয়; অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই উভয়েই যদি কবিতার আয়ত্তাধীন হয় তাহা হইলে অন্য সকল রস উপেক্ষিত হইয়া কোমলতর রসগুলিই বা কিসে প্রধান

হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মহাকবি সেক্সপিয়র যে ফল-ষ্ট্যাক সৃজন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সেই ফল্-ষ্ট্যাককে আজ আমরা কবিত্বের চরমোৎকর্ষ বলিয়া কেন না স্বীকার করি? বেণীসংহারে রাক্ষস রাক্ষসীর কথোপকথন, মিল্টনের মৃত্যু ও পাপের কল্পনা, মালতীমাধবের শ্মশান বর্ণনা, দান্তের নরকবাসী ইউগোলাইনের বর্ণনা—এই সকলই ত বীভৎসরসাত্ম, কিন্তু কে আজ সাহস করিয়া রমেশ বাবুর কোমলতর বৃত্তির অনুরোধে এই সকল স্বর্গীয় দিব্য চিত্রগুলিকে বা উক্ত মহাকবিদিগের কার্য্য সকলকে কবিতার সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে সাহস পাইবে?

(ক্রমশঃ)

রায়েঞ্জি।

আভেণ্টাইন গিরিখণ্ডের যে স্থলে টাইবর স্রোতঃস্বতী ঈষৎ ভঙ্গীনত্রা হইয়া রোমনগরীর পদপ্রান্ত চুম্বন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, একদা নৈদাঘ সন্ধ্যার শ্যাম ছায়ায় এক জীর্ণোদ্যানে বসিয়া একটি যুবক আপন মনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সম্মুখে সন্ধ্যার কৃষ্ণক্ষেত্রে রুধিরাপ্লুত গতপ্রাণ ভ্রাতৃদেহ নিপতিত রহিয়াছে, জ্যেষ্ঠের চক্ষে জল নাই, তাহা বিষম প্রতিহিংসায় জ্বলিতেছে। শীকরসম্পৃক্ত সান্ধ্যসমীর সায়ন্তন কুসুম নিচয় বিধুনিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, অলক্ষিতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে বায়ুর সঙ্গে মিশাইল; "প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!" "হতভাগ্য রোম! কবে তোর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে?"—অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া আসিয়া বজ্রধ্বনি-তুল্য দুই একটি কথা সে বায়ুর অঙ্গে আহত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন উদ্যানখণ্ডে সেই সকল কথা শুনিবার

অন্য লোক ছিল না; আভেণ্টাইন উন্নতকণ্ঠে তাহা শুনিল, টাইবরের বিশাল হৃদয়ে সে শব্দ গিয়া স্থান লাভ করিল, সমীরণ তাহা যতনে বহিয়া বহিয়া তরু লতাকে শুনাইল। রোমের কোনও স্বার্থসংকুল মনুষ্যের নীচ কর্ণ সে সকল উচ্চ কথা তখন শুনিল না।

তখন শুনিল না, কিন্তু পরে শুনিল। কয়েক বর্ষ পরে অতি আগ্রহের সহিত সকলে সে সমস্ত কথা শুনিল। যাহারা শুনিতে পাইল না, যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে শুনাইল। সমগ্র রোম রায়েঞ্জির নামে প্রতিশব্দিত হইয়া উঠিল। রোমের তদাতন অবস্থাপর্য্যায় অতি শোচনীয়——সিংহমহিষী শৃগালীর ন্যায় পাদদলিত, সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী নীচজনের উপহাসের আস্পদীভূত, পোপ ক্ষমতাচ্যুত, প্রজাবর্গ বিবিধ অত্যাচারে নিপীড়িত, সামান্য বিষয়ে সামান্য কীটের ন্যায় তাহাদিগের জীবন হন্য। প্রভুশক্তি অপ্রতিরোধ্য, সুতরাং যাদৃচ্ছিক অত্যাচারের শেষ নাই। লর্ডগণ সর্ব্বে সর্ব্বা, এক এক জনের এক এক দুর্গ, সে দুর্গরক্ষায় বিদেশীয় সৈন্য সকল নিযুক্ত। দিগ্বিজয়ী সিজারসন্তানগণ তখন অস্ত্র ধরিতে জানিত না, জানিলেও হীন কর্ম্ম বোধে তাহা করিতে চাহিত না, প্রজাগণ সে সকল কার্য্য হইতে আইনের সাহায্যে দূরে সংরক্ষিত; রোম আত্মরক্ষায় অসমর্থ, বেতনভোগী কয়েক জন জর্ম্মাণ সৈন্য তাহার রক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জর্ম্মানেরা জানিত রোমকেরা হীনবল, তাহাদিগের আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই, সুতরাং জার্ম্মানেরা মনে মনে হাসিত; হাসিবার অন্য কারণও তাহাদিগের ছিল। এই সময়ে দস্যুপতি ওয়াণ্টর ডি মণ্ট্রিল রোমের প্রান্তভাগে দলবলে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার ভোগলালসাময়ী লোলয়িত দৃষ্টি টাইবরের প্রসন্নসলিলসিক্ত রোমের উপর সন্নিবদ্ধ। জর্ম্মাণগণ তাহার সহিত যোগ দিবার চেষ্টায় ছিল, সুতরাং তাহারা মনে মনে হাসিত। লর্ড মণ্ডলী এ সমস্ত বিষয় বুঝিত না, তাহারা আপন আপন অহঙ্কারেই উন্মত্ত, প্রজার উপর ইচ্ছামত পীড়ন করিয়াই সন্তুষ্ট। সেই সকল শার্দ্দূলবৃত্তিপরায়ণ লর্ড সমষ্টির মধ্যে আবার দুইদল প্রবলতর——এক কলোনা, অপর ওর্সিনি। উভয় দলে বিজাতীয় শত্রুতা, কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হয়। এমন দিন ছিল না যে এ দুই দলে কোনও বিবাদ

না হইয়া অতিবাহিত হইত, এমন চক্ষু ছিল না যাহা এক দিনের তরেও উভয় দলের মধ্যে কাহারো ছিন্ন শির দেখিতে না পাইত। প্রজাবর্গ সতত সশঙ্কিতচিত্ত, সতত পুত্র কন্যার জন্য ভাবিয়া আকুল। এইরূপ রোম যথেচ্ছাচারের বিলাসভূমি, স্বজাতিদ্রোহের যাদৃচ্ছিক ক্রীড়াক্ষেত্র। এই সময়ে সেই সকল প্রজাসমূহ একবার ভ্রাতৃশোকাতুরের কথা শুনিল, পীড়িত ব্যক্তি পীড়িতের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিল, বহুদিনের গাঢ় নিদ্রার পর রায়েঞ্জির ভৈরব চীৎকারে রোম একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

আশৈশব যে আগুন নীরবে হৃদয় মধ্যে গোপনে গোপনে ধূমায়িত হইতেছিল, উপযুক্ত বায়ু সঞ্চারে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল: মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রায়েঞ্জি রোমের অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আজ জীবনের পঞ্চবিংশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে সে অবস্থা আরো ভয়ানক। নিষ্ঠুর কলোনা সেনাপতি নিরপরাধ বালককে নিহত করিল, বিচার প্রার্থনা করিলেন, অহঙ্কারে কলোনাপতি তাহা শুনিল না,—এত অহঙ্কার, এত অত্যাচার রক্তমাংসের শরীরে কত সহিবে? কি জন্য অত্যাচার? কিসের কলোনা? কলোনা রায়েঞ্জি অপেক্ষায় বংশমর্য্যাদায় কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। রায়েঞ্জির মনে পড়ে—শৈশবের হিন্দোলদোলায় শায়িত হইলেই যেন তাঁহার কাণে কাণে কে বলিত—তিনি দরিদ্র সন্তান বটে কিন্তু অনুচ্চবংশীয় নহেন, তাঁহার পিতা সপ্তম হেনরির বংশোদ্ভব, সুতরাং তিনিও রাজবংশীয়। এ উচ্চাভিলাষের কথা রায়েঞ্জির মনে সদাই জাগিত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে২ এ উচ্চাভিলাষ সাধনের চেষ্টাও হৃদয় মধ্যে বাড়িয়া উঠিল। রোমের সাহিত্য সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের নিকট উন্মুক্ত,—বংশগৌরবের সহিত বিদ্যা-গৌরবের স্পৃহা বলবতী হইল।

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ বাল্যকালে যথেষ্ট অধীত হইয়াছিল, এখনও নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক পাঠে অনেক সময় অতিপাতিত হইয়া থাকে, এখনও বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া রোমে ভূয়সী প্রশংসা। বক্তৃতা বুঝি রায়েঞ্জির কার্য্যোদ্ধারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল, কেটোর মহাপ্রাণতা এবং সিসিরোর হিতৈষিণী বাক্‌পটুতা যুগপৎ সমভাবেই তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া তাঁহার চেষ্টার স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়াছিল। কে

বলিল বাক্যের ফল ফলে না? 'বাক্যব্যয়ে কার্য্যক্ষতি সুধু'—এ কথা বিকার-বিজৃম্ভিত উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। অদ্যকার মৃত ভারতে একথা শোভা পাইতে পারে, "ভারতোদ্ধার" * লিখিয়া ভারতের কবি নিজের উচ্চ শিক্ষা ও কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, ভারতের লেখক "আর্য্য-সভা" † লিখিয়া আপনার মহামনস্বিতার ও লিপিপটুতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে পারেন; বক্তৃতায় যে কার্য্য হয় না, বক্তা যে মাত্র শ্লেষের পাত্র ভারতীয়দিগের ন্যায় রোমকেরা তাহা জানিত না। "প্রভবতি শুচি র্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাংচয়ঃ"—হইতে পারে মৃৎপাত্রে রশ্মি প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু মণিখণ্ডে হইয়া থাকে, হইতে পারে 'ভারতে ভারত কথা বিকায় না আর,' কিন্তু রোম আগ্রহের সহিত সে সকল কথা শুনিত। যে ক্লিমেণ্ট নির্দ্দয়তার অবতার, যুক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনধীন সে ক্লিমেণ্ট ও এক দিন বক্তৃতার মনোহারিত্বে বক্তার অলোকসামান্য গুণগরিমায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের প্রথম রেখা-পাত হইল, রায়েঞ্জি উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন। সে উচ্চপদাভিষেক তাঁহার অনেক উপকারে আসিল. এক্ষণে তিনি সহজেই অনেকের সহিত বিমিশ্রিত হইতে পারিলেন, সহজেই অনেককে আপনার মতানুবর্ত্তী করিতে সক্ষম হইলেন। সমগ্র রোম একবার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিল,—সাক্ষাৎ হিতৈষীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ঘাটে, মাঠে, পথে রায়েঞ্জি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, দলে দলে প্রজাবর্গ সে বক্তৃতা শুনিতে লাগিল, সে বক্তৃতা শুনিয়া দলে দলে তাঁহার অনুচর শ্রেণীভুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। সে বক্তৃতা উন্মাদকরী, একবার শুনিলে মনের গতি ফিরে। তাহাতে অনেক রোমকের মনের গতি ফিরিল। যে যৎকালে সে বক্তৃতা শুনিত, একবার বক্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, একবার দারুণ অত্যাচারের কথা স্মরণ হইত, মুহূর্ত্তের জন্য অলক্ষিতে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইত, মুহূর্ত্তের জন্য বক্তৃতার উত্তেজনায় মহা-প্রাণতার প্রস্ফুরণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। কলোনা বা ওর্সিনিগণ

* ভারতোদ্ধার কাব্য—শ্রীরামদাস শর্ম্ম বিরচিত।

† Aryan meeting (Bengal magazine, Oct. 81.)

সে বক্তৃতা শুনিয়া হাসিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে অনেক টিটকারী করিত। রায়েঞ্জির হৃদয় সমুদ্রতুল্য, সমুদ্রতুল্য সে হৃদয় সামান্য উপহাসে বিক্ষোভিত হইত না; দ্বিগুণ বলে রায়েঞ্জির বিরাট কণ্ঠ নিনাদিত হইত, দ্বিগুণ উৎসাহে প্রজাবর্গ "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া উচ্চরব করিয়া উঠিত; মুহূর্ত্তের জন্যও বিদ্রূপকারীদিগের সে লৌহহৃদয় ও সে ভীম গর্জ্জনে বিকম্পিত হইয়া উঠিত।

সময়ের স্রোতের সঙ্গে ২ দিনে ২ রায়েঞ্জির জীবনস্রোতঃ বহিয়া চলিল। দিনে ২ অনেক নূতন ২ বন্ধু আসিয়া রায়েঞ্জির সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রায়েঞ্জি দেখিলেন তাহার সমসুখদুঃখভাগী সঙ্গী অনেক। একদিকে ধর্ম্মযাজক বিসপ রেমণ্ড সমস্ত ধর্ম্মযাজীবৃন্দের অধিনায়ক হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সমুপাগত, অন্যদিকে পণ্ডিতপ্রধান পাণ্ডুলফো সমস্ত কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মুখপাত্র স্বরূপ তাঁহার সহচরীভূত, রাজ্যের সাধারণ প্রকৃতিসংঘের সেনাপতিস্বরূপ কর্ম্মকারশ্রেষ্ঠ সেকোডেলভেকো তাঁহার প্রিয় অনুচর, গর্ব্বিত কলোনার ভ্রাতুষ্পুত্র তেজস্বী বীরধর্ম্মা এড্রিয়ান তাঁহার ভগ্নীর পানিপ্রার্থী, আপনি স্বয়ং লর্ড রাসেলির জামতা—রায়েঞ্জির পার্শ্বে নাইনাসুন্দরী যথার্থই সাহসের পার্শ্বে উদ্দীপনা। রায়েঞ্জি আপনার অবস্থা বুঝিলেন, নির্জ্জনে একটি ভগ্নগৃহে বিশ্বস্ত অনুচর বর্গের সমক্ষে গভীর নিশীথে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। খ্রীষ্টের পবিত্র অস্ত্র ক্রুশ হস্তে শোভা পাইতেছিল, একবার বামস্কন্ধের উপর সে ক্রুশ আঘাত করিলেন, ঝর ঝর করিয়া প্রবল বেগে শোণিত গড়াইয়া পড়িল, ধূমায়িত সেই শোণিত দেখাইয়া রায়েঞ্জি জলদগম্ভীর স্বরে যে শপথ করিলেন তাহা অতি ভয়ানক। স্থির হইয়া অনুচরবর্গ সে ভয়ানক শপথ শ্রবণ করিল, এককালে সেই অন্ধকার মধ্যে শত ২ শাণিত অস্ত্রফলক ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, শত শত অস্ত্রের ঝনঝনাতে কর্ণ বধির হইল, ঝর ঝর করিয়া ক্ষতমুখ হইতে স্কন্ধদেশ দিয়া উত্তপ্ত শোণিত গড়াইয়া পড়িল, যুগপৎ সকলে মিলিয়া সে ভয়ানক শপথ উচ্চারণ করিল। সে সময়ে সে ভয়ঙ্কর শপথ যেই শুনিত সেই শীহরিয়া উঠিত, দূরে ভগ্নগৃহের কোটরাভ্যন্তরে একটা পেচক লুক্কায়িত ছিল গা ঝাড়িয়া পাখা নাড়িয়া বিকট রূপে চীৎকার করিয়া উঠিল। নিকটে

গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ওয়াণ্টের ডিমণ্ট্রিল গোপনে সে সকল কার্য্য দেখিতেছিল. নখাগ্র হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। স্থির হইয়া শুনিল ভীষণ শব্দ, তাহা নৈশ অন্ধকার বিদারিত করিয়া তাবৎ সৌধমণ্ডলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গগণমার্গে সঞ্চরণ করিতেছে; গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ভৈরব হুঙ্কারে তাহার চতুর্দ্দিকে যেন শব্দ হইতেছে—"অত্যাচার বিনষ্ট হউক, সাধারণ তন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হউক।" ওয়াণ্টর বুঝিল, অচিরাৎ যে কালাগ্নি জ্বলিবে ইহা তাহারই স্ফুলিঙ্গসিঞ্চন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

পাগলের প্রলাপ।

প্রলাপ নং ১।

প্রস্তবনা।

আমি পাগল, কেন না সকলেই আমায় পাগল বলে। হৃদয় যাহার প্রেতভূমি, জীবন যাহার লক্ষ্যশূন্য, সংসারে যাহার বৈরাগ্য, ভোগবিলাসে যাহার স্পৃহা নাই, সে পাগল নয় ত কি? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ সংসারে পাগল নয় কে? কয়জন মনুষ্য নামের যোগ্য? কয়জন সে নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে? তুমি ধনী, আপন ধনগৌরবে আপনি উন্মত্ত, তুমি পাগল না হইয়া তুমি হইলে 'বাবু'। তুমি তৃতীয় পক্ষে সংসার করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে গোঁপে কলপ দিয়াছ, কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া প্রপৌত্রির সমবয়ঃস্কা স্ত্রীর প্রেমালাপে উন্মত্ত রহিয়াছ, তুমি পাগল না হইয়া তুমি হইলে "রসিক চূড়ামণি"। তোমার বুদ্ধি না থাকিলেও তুমি বুদ্ধিমান্, জ্ঞান না থাকিলেও তুমি জ্ঞানী; তুমিই সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এ সংসারে ধনের এত গৌরব কেন প্রভো! ধনী নির্ধনী কেন? এত বৈষম্য কেন? নির্ধনের উপর এত অত্যাচার কেন? তোমার সুখময় রাজ্যে এত অসুখ কেন?

এত অশান্তি কেন? তোমার সে অনন্ত প্রেম, অনন্ত সুখ, অনন্ত ভালবাসা কোথায় প্রভো! এ সংসার তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি তবুত তোমার সৃষ্টির প্রধান জীব মনুষ্যতে তাহার কণামাত্রও দেখিতে পাইলাম না। ঐ যা কি বলিতে কি বকিতেছি, বলিতেছিলাম—আমি পাগল, পাগলের কথা কেহ শুনিবে কি?

কিন্তু আমায় পাগল করিল কে? পাগল করিল কে শুনিবে? তবে বলি শুন—সে তোমার সংসার, সে তোমার সমাজ, সে তোমার স্বদেশ। দিন কতক বাঙ্গালির পারিবারিক সামাজিক আর রাজনৈতিক বিষয় ভাবিয়াছিলাম, তাহার পর সকলে আমায় বলিল তুমি পাগল, সেই অবধি আমিও আমায় পাগল বলিয়া জানি। যখন ঐ সকল বিষয় ভাবি, তখন কখন কাঁদি কখন হাসি, কাঁদি মর্ম্মবেদনার বিষের জ্বালায় হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হই বলিয়া, হাসি ঘৃণার হাসি, হাসি আবার কাঁদি তাই আমি পাগল। এ সংসারে হাসে নাই বা কে? শিশু মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধপান করিতে করিতে হাসির লহরী তোলে, বালক উত্তম খাদ্যদ্রব্য পাইলে হাসিতে হাসিতে নাচিতে২ খেলিয়া বেড়ায়, যুবতী অনেক দিনের পর স্বামী পাইলে সুন্দর অধর প্রান্তে বৈদ্যুতিক হাসি হাসে; প্রবীনেরা তাস পাশা খেলিতে খেলিতে যে হাসির ধ্বনি তোলে তাহাতে কত গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়া যায়; রণস্থলে তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলে প্রকৃত বীর পুরুষের হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে, তখন তাঁহার ও বীর মূর্ত্তি হাসে। তবে এ সংসারে হাসে নাই কে? আবার কাঁদে নাই বা কে? ক্ষুধা পাইলে শিশু কাঁদে, পড়িতে হইলে বালক কাঁদে, বিরহকাতরা রমণী বিদেশ গমনোন্মুখ পতির হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া কাঁদে, পতিও কাঁদিয়া হৃদয়স্থ সেই সুন্দর মুখখানি ভাসায়, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সংসার জ্বালায় কাঁদে, দারিদ্র্য যন্ত্রণায় কাঁদে আর শোকে কাঁদে; তবে এ সংসারে কাঁদে নাই বা কে? কিন্তু আমার এ হাসি কান্নায় আর ঐ সকল হাসি কান্নায় প্রভেদ কি? কয়জন সে প্রভেদ বুঝিয়াছে? রৌদ্র বৃষ্টির একত্র সমাগমের শোভার ন্যায় যে শোভা কয়জন সে শোভা দেখিয়াছে? আমার ন্যায় কয়জন কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়াছে, আবার হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়াছে? দূর হ'ক ও সকল কথায় কাজ নাই;—কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম যে—হাঁ, অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া

বাঙ্গালি জীবনের এই তিন অবস্থার বিষয় ভাবিয়াছি, ভাবিয়াছি, আর কাঁদিয়াছি—আবার কান্নার কথা! দূর হ'ক ও কথা তবে এখন আর লেখা হইল না।

অনেক সময় মনে হয় আমার জীবনে কাজ কি? পাগলের জীবনে কি ফল হইবে? সেই জন্য একবার মনে করিয়াছিলাম এ দেহ বৃন্ত হইতে এ জীবন পুষ্প ছিঁড়িয়া ফেলি, কিন্তু তখনি আবার মনে হইল আমি এ জীবন নষ্ট করিবার কে? যাঁহার কার্য্যে আসিয়াছি তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনিই নষ্ট করিবেন। তাঁহার উপর কি আমার কর্তৃত্ব? এ পাঁচ রকম ভাবিয়া তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম না, আর তাঁহার কার্য্যে আমার হস্তক্ষেপ করিবারই বা অধিকার কি?

মনের কথা খুলিয়া বলিলেই যদি সকলে পাগল বলে—বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, পাগলের যাহা কার্য্য পাগল তাহা করিবে, তাহার নিন্দায় ভীত নই, তাহার প্রশংসায় গর্ব্বিত নই, যে কার্য্যের জন্যে আসিয়াছি, সে কার্য্য শেষ হইলেই হাসিতে হাসিতে অবসর লইব। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া মনের কথা সকলকে বলিব। বলিব বটে, কিন্তু শুনিবে কে? "পাগলের প্রলাপ" কাহার ভাল লাগিবে? কেহ শুনুক বা না শুনুক কাহার ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহাতে আমার কি? পাগল হইলেই প্রলাপ বকিতে হয়, তাহা না হইলে আমি কিসের পাগল? ঐ যে ক্ষুদ্র মল্লিকাটি ফুটিয়া রহিয়াছে তাহার সৌগন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইতেছে কি না সে কি তাহা ভাবে? পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যে সুধার রাশি ছড়ায়, চকোর সে সুধা পান না করিলে চন্দ্রের ক্ষতি কি?

পাগলের মনে কত সময় কত রকম ভাবের উদয় হয়, এবং উদয় হইতে না হইতে তাহা হৃদয় মধ্যে লীন হয়, কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে না; যে দুই একটি ভাব—প্রলাপ প্রকাশ হয়, কেহ তাহা শোনে না, যদি কেহ শোনে ত বোঝে না। আমিও অনেক ভাবিয়াছি, অনেক প্রলাপ বকিয়াছি, কিন্তু সে নির্জ্জনে। এখন পাগলামী বাড়িয়াছে, নির্জ্জন স্থান ভাল লাগে না, তাই জনসমাজে বাহির হইলাম।

ইতি প্রস্তাবনা।

সুহাসিনী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নাগা দেখিল।

Bruttus— Do you know them?
Lucius— No sir: their hats are plucked about their ears,
And half their faces buried in their cloaks,
That by no means I may discover them
By any mark of favor.

Shakespeare.

গৌড়, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন নগর সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে ঢাকা নগরী অতি নবতরা। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক আবুলফাজলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আইন আকবরীতে ইহার কোন ও উল্লেখ নাই। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তদাতন বঙ্গশাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে স্বকীয় শাসনস্থান এইখানে স্থানান্তরিত করেন। দিল্লীর সৌবর্ণ সিংহাসনের মৌক্তিক ছত্রতলে তখন রমণীরত্ন জগদ্বিখ্যাত নুরজাহান সুন্দরীর হৃদয়রত্ন জগদ্বিখ্যাত জাহাঙ্গীর বাদসাহ শোভা পাইতেছিলেন; দিল্লীশ্বরের নামানুকরণে ইহার নাম রক্ষিত হইল জাহাঙ্গীর নগর। রাজ-আজ্ঞায় এক অত্যুচ্চ বিবিধরত্নোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদ ও বিশালপরিখাপ্রাকারসম্বেষ্টিত একটি ইষ্টক-দুর্গ বিনির্ম্মিত হইল। ধ্বংসরাজের প্রচণ্ড আক্রমণে কচিৎ যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ ভিন্ন এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, যে সময়ের আখ্যায়িকা লিখিত হইতেছে, তখন ইহার অবস্থা অতি রমণীয় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সেই উন্নত দুর্গের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে ২ কলনাদিনী বুড়িগঙ্গা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। তাহার প্রায় সার্দ্ধক্রোশৈক অন্তরে যে স্থলে বুড়িগঙ্গা ঈষৎ ভঙ্গীমতী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথায় এক

প্রকাণ্ড আম্রকানন মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভগ্নগৃহের ভীষণ ছায়া নদীহৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া সর্ব্বদা অতি ভীষণ দেখাইত। মুসলমানদিগের জল-দেবতা খাজি খিজিরের নামে সেই গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাতা কে, অথবা কোন সময়ে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কেহ জানিত না, জানিবার কোন সম্ভাবনা ও ছিল না। বহুদিন হইতে সে গৃহের জীর্ণসংস্কার নাই, স্থানে ২ স্খলিত সুধারাশি ও ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কাননখণ্ড ও তন্মধ্যস্থ সেই গৃহ মধ্যাহ্নসূর্য্যাব-রোধকারী নানাবিধ জাঙ্গলিক বৃক্ষে পূর্ণ। গৃহভিত্তিগাত্র হইতে উত্থিত হইয়া বট, অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী প্রভৃতি প্রকাণ্ড ২ মহীরুহগণ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নিয়তঃ সময়ের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছিল। জনশ্রুতি ছিল, খাজি খিজিরের সঙ্গে অনেক মামদো বাস করে, সুতরাং পাছে বাস-ভূমির হানি হইলে অপদেবতাগণ রুষ্ট হয়েন এই ভয়ে কেহ কখন সে জঙ্গল কাটাইত না। রাজ্য মধ্যে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে রাজ্যস্থ তাবৎ মুসলমান সমবেত হইয়া সেইখানে সেই জলদেবতার পূজা করিত, মধ্যে২ দল বাধিয়া অনেক হিন্দু ও সেই পূজায় যোগ দিত, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে কেহ কখন তথায় যাইত না। কল্পনাপ্রিয় প্রাচীনেরা কহিতেন তাঁহারা স্পষ্ট শুনিয়াছেন, মধ্যে ২ মামদোরা গভীর নিশীথে সেই গৃহে বসিয়া নমাজ করিয়া থাকে। ভয়ে দিবাদ্বিপ্রহরেও কেহ একাকী তথায় যাইতে সাহস করিত না।

অকস্মাৎ একদা গভীর রাত্রে সেই গৃহে আলোক দৃষ্ট হইল। রাত্রি তখন দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিয়াছিল, নিদ্রার আরামক্রোড়ে শয়ন করিয়া রাজ্যস্থ নরনারী শান্তি লাভ করিতেছিল; সুতরাং সে আলোক অনেকের চক্ষে পড়িল না, যাহাদিগের চক্ষে বা পড়িল ভূতযোনি বিশ্বাসে তাহারা তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে সাহস করিল না; দূরে নীরবে বসিয়া জনৈক সশস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ কি চিন্তা করিতেছিল, সে আলোক গিয়া তাহার চক্ষুর উপর প্রতিভাসিত হইল। হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার নাই, কৌতূহলদীপ্তমনে সুদীর্ঘবর্শাফলকহস্তে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবিত হইল। দেখিতে ২ গাঢ় অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিল, যোদ্ধৃপুরুষ সেই আম্র-

কানন মধ্যে উপনীত হইলেন; বৃক্ষশাখার ঘনপত্রবিন্যাসে ক্ষণেকের জন্য সে আলোক অদৃশ্য হইল। লতাগুল্মদল, পতিত ইষ্টকরাশি পদে ২ গতির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল, সে সমস্ত চরণে দলিত করিয়া বেগে যোদ্ধৃপুরুষ দৌড়িয়া চলিল। আলোক দেখা দিল, তখন সে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে সেই প্রেতপুরী পতিত গৃহ ভীষণ ভাবে অন্ধকার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মাথার উপর একটি ভগ্ন গবাক্ষ দিয়া তাহার মধ্য হইতে সেই পৈশাচিক আলোক নিঃসৃত হইতেছে। অগণ্য বৃক্ষলতায় সে গৃহগাত্র পূর্ণ, ধীরে ২ তরবারি দ্বারা দুই একটি শাখা ছেদিয়া নির্ভীক যোদ্ধা উপরে উত্থিত হইল, ধীরে ২ উপরিস্থ সেই ভগ্ন গবাক্ষপ্রান্তে মুখ রক্ষিত করিল, সেই ঘোরন্ধকারে ভগ্নগবাক্ষপার্শ্বে বৃক্ষশাখাবলম্বনে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে যোদ্ধ পুরুষ যাহা দেখিল তাহা অতি ভীষণ দৃশ্য। দেখিল, দুই জন—তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই, উভয়েরই আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর ছদ্মবেশে আবৃত—দুইজন সেই আলোক সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। নিঃশব্দে যোদ্ধৃপুরুষ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

———o⊂⊃o———

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহা শুনিল।

They are the faction. O conspiracy!

Julius Cæsar.

সেই নিশীথান্ধকারসংস্পৃষ্ট উদ্যানখণ্ডে সেই ছায়ালোকপূর্ণ ভীতিময় গৃহের জীর্ণগবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে যাহা শুনিল তাহা অতি রোমহর্ষণ। শুনিল, প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে—"আপনাকে বিশ্বাস?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তদুত্তরে বলিল—"আমায় বিশ্বাস এই জন্য যে, আমিই প্রথমে পত্র দিয়া আপনাদিগকে ডাকাইয়াছি।"

প্রথম। সে তো আরো অবিশ্বাসের কারণ, হইতে পারে সহজে আমাদিগকে করায়ত্ত করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়। যদি তাহাই মনে করেন, তবে তাহাই হইয়াছে।

প্রথম। উত্তম, কিন্তু জানিবেন আমার ও সঙ্গে এ বিশ্বাসঘাতকতার ঔষধ আছে।”—তাহার স্বর তীব্র; চক্ষুর্দ্বয় সমুজ্জ্বল; কোষবদ্ধ কৃপাণফলক কটিতটে ঝুলিতেছিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে অসি কোষমুক্ত হইল; গৃহস্থিত দীপালোক তাহার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝলমল করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি একপদও নড়িল না, শুষ্ক ওষ্ঠে একটু শুষ্ক হাসি হাসিল, বলিল—

“একবিন্দু বারি শুখাইলে সমুদ্র শুষ্ক হইবে না, আমার মৃত্যুতে সুবাদারের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আপনি শত্রুপুরী মধ্যে অবরুদ্ধ।”

ইতিমধ্যেই কি ভাবিয়া প্রথম ব্যক্তি আপনার তরবারি কোষবদ্ধ করিয়াছিল, উত্তর শুনিয়া চিন্তিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা বুঝিল, আবার ধীরে ধীরে একটু হাসিল, বলিল- “চিন্তিত হইবেন না; আমায় বিশ্বাস করুন, আপনাদিগের ভাল হইবে।”

প্রথম। বুঝিলাম না, ভাল আপনি কাহাকে বলেন?

দ্বিতীয়। ভাল হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে আপনাদিগের জয় হইবে।

প্রথম। জয় পরাজয় মাতা মেরীর হস্তে, তাহার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?

দ্বিতীয়। সম্বন্ধ বিস্তর, কাসিম খাঁ সুবাদার বটেন, কিন্তু এ যুদ্ধের প্রকৃত কর্ত্তা আমি, আমার অনুমতি না পাইলে একটিও পদাতিক আপন স্থান হইতে নড়িবে না; তাই বলিতেছিলাম, আমাকে বিশ্বাস করেন বিনা বাক্যব্যয়ে আপনাদিগের বঙ্গবিজয় হইবে, বিশ্বাস না করেন চোরের ন্যায় সুবর্ণরেখাপারে তাড়িত হইবেন; আপনার মাতা মেরী আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

মাতা মেরীর নাম লইয়া এরূপ কথা বলাতে প্রথম ব্যক্তি হৃদয়ে বড়ই রাগিল; কিন্তু সে রাগ বাহিরে প্রকাশ করিল না। বলিল—“বুঝিলাম,

কিন্তু এত ক্ষমতা যদি আপনার, তবে ধর্ম্মবিগর্হিত এ রাজদ্রোহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ?"

দ্বিতীয়। কেন ? কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার করিব বলিয়া। রাজদ্রোহ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য তাহা আমি জানি ; কিন্তু রাজদ্রোহ কাহাকে বলেন ? আমি হিন্দু, মুসলমান আমার কিসের রাজা ? ম্লেচ্ছ যবন হিন্দুদিগের উপর কিসের জন্য রাজত্ব করিবে? তবে আমাদিগের বল নাই, অথবা বল থাকিলেও জাতীয়তা নাই, ঐক্য নাই—এ কণ্টক উৎপাটনে অক্ষম ; কিন্তু ইহার জ্বালা বড় তীব্র, সুতরাং অন্য কণ্টকের আশ্রয় লইয়া ইহা তুলিয়া ফেলিব।

উত্তর শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি ঈষদ্ধাস্য করিল, বলিল—"বুঝিলাম ; কিন্তু যে কণ্টকের আশ্রয় লইতেছেন, সেই কণ্টকই যদি ফুটিয়া পীড়া জন্মায় ?"

দ্বিতীয়। সবলে উপাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম। ভাল, কিন্তু সে তো দূরের কথা, উপস্থিত ক্ষেত্রে এ কার্য্যে আপনার লাভ ?

দ্বিতীয়। লাভ ? তবে শুনুন ; সে কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিব না।" ইহা বলিয়া ধীরে ২ প্রথম ব্যক্তির কানে ২ কি বলিল। ভয়ঙ্কর কথা ! মুহূর্ত্তের জন্য সে লৌহহৃদয় ও চমকিয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল—"আমাদিগের ও সে যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে, এক্ষণে সে কোথায় ?"

দ্বিতীয়। এই শিবির মধ্যেই অবস্থান করিতেছে, কিন্তু দেখিবেন, সে বড় চতুর।

প্রথম। নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই তাহার ছিন্ন শিরা দেখিতে পাইবেন।

মহাহর্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল ; বলিল—"মার্জ্জনা কবিবেন, যাঁহার সহিত হৃদয়ের এত কথা হইল, তাঁহার নাম জানিতে পাইলে সুখী হইব।"

প্রথম। অধীনের নাম সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালে, মহাশয়ের নাম ?

দ্বিতীয়। ভূপেন্দ্রনারায়ণ।

গৃহের আলোক নিবিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহা ঘটিল।

Why crush I not the viper?——

Crabbe.

আকাশে তারা নাই, বৃক্ষে খদ্যোত নাই, রজনী নিবিড়-অন্ধকারময়ী; তলস্থ আম্রকাননে অন্ধকার আরও নিবিড়তর। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই ব্যক্তি আম্রকানন দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছে। কাননভূমি নির্জ্জন নীরব শব্দশূন্য; রহিয়া ২ নৈশ বায়ু ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে; রহিয়া ২ দূরস্থ প্রহরীদিগের চীৎকারধ্বনি পরিশ্রুত হইতেছে, নিকটেই বুড়িগঙ্গার খরস্রোতঃ কলকলশব্দে নৈশ গভীরতা আরও ভীতিময় করিয়া তুলিতেছে। অন্যদিকে দৃক্‌পাত নাই, দুই জনে নিঃশব্দে ত্বরিতপাদে চলিতেছে। দেখিতে ২ একটা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের ভীষণ ছায়া পথিকদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; হঠাৎ শন্ শন্ বেগে একটা তীর আসিয়া পোর্ত্তুগীজের বক্ষে লাগিল, ভীষণ বর্ম্মায় ঠেকিয়া দূরে গিয়া সে তীর ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত পরে আবার এক বর্শা, ভীমবলে সে বর্শা গিয়া পায়ে লাগিল, পোর্ত্তুগীজ ভূমে পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণ চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে পতিত গঙ্গালের মাথার উপর উত্তোলিত শাণিত কৃপাণফলক অন্ধকার মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। চিন্তার অবসর নাই, বেগে ভূপেন্দ্রনারায়ণ সে অসির উপর প্রতিঘাত করিল। অন্য হইলে তৎক্ষণাৎ সে অসি শত হস্ত দূরে গিয়া লাফাইয়া পড়িত, কিন্তু যে মুষ্টিতে তাহা ধৃত হইয়াছিল তাহা বজ্রতুল্য; বজ্রতুল্য সে মুষ্টি স্খলিত হইল না, অসি পড়িল না। ভুপেন্দ্র আরও চমকিত হইলেন। এই সময়ে কঠোর স্বরে সেই আঘাতকারী যোদ্ধৃপুরুষ বলিল—"নরকের কুক্কুর! ইষ্টদেবতার স্মরণ কর, আজ তোর পাপের ভরা নামাইব।"—স্থির হইয়া ভূপেন্দ্র সে স্বর শুনিল। হরি হরি! একি!—চারুচন্দ্র! ভূপেন্দ্র অন্তরে শীহরিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া চারুচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। চারুচন্দ্র ও তজ্জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না, উভয়ে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইত্যবসরে গঙ্গাল ধীরে ২ উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে চারুচন্দ্রকে

আক্রমণ করিল। অতি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যথাক্রমে চারুচন্দ্র দুইজনের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। সেই অন্ধকার মধ্যে তরবারি সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, অস্ত্রের ঝন্ ঝনাশব্দ নৈশবায়ু আরোহণ করিয়া নদীবক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য নৈপুণ্য! অদ্ভুত শিক্ষা-কৌশল! ধন্য বীরত্ব! দুই দিক্ হইতে দুইজনে আক্রমণ করিতেছিল—ক্ষতি নাই—চারুচন্দ্র একাকী কেশরীর ন্যায় মহিষদ্বন্দ্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, দুইজনের সঙ্গে একের যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভবে? ক্রমে চারু হতবীর্য্য হইতে লাগিলেন. সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইতেছে, সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে, নয়নে নিমেষ নাই, মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রচালনে বিশ্রান্তি নাই—চারুচন্দ্রকে দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ রুধিরাক্তকলেবরে ক্রোধ সংগ্রামক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে।

বিস্মিত হইয়া দুইজনে একবার দুই জনের প্রতি চাহিল। কঠোরস্বরে ভূপেন্দ্র বলিল—"বন্ধো! প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নপর হও।" কঠোরস্বরে গঙ্গালে উত্তর করিল—"চিন্তিত হইবেন না, এই দণ্ডেই এ হতভাগের ছিন্ন শিরা আপনাকে উপহার দিব।" আর বাক্যের অবসর নাই, দুইজনে দুই দিক্ হইতে দ্বিগুণ বলে একবার শেষ আক্রমণের চেষ্টা করিল। সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইলে চারুচন্দ্রের কি হইত বলা যায় না; কিন্তু অকস্মাৎ তন্মুহূর্ত্তে সেই নিস্তব্ধ কাননভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া খল খল শব্দে কে হাসিয়া উঠিল। যুগপৎ তিন জন স্তম্ভিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে পৈশাচিক অট্টহাস্য আরও নিকটতর হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে ভীমবেশা আলুলায়িতকুন্তলা এক উন্মাদিনী ত্রিশূলহস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উন্মাদিনী আসিয়াই আবার সেই পৈশাচিক হাসি হাসিল। "পলাও—পলাও" বলিয়া উন্মত্তভাবে ভূপেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল। অবাক্ হইয়া চারুচন্দ্র দেখিল, ভূপেন্দ্র বাত্যান্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায়, যূপকাষ্ঠবদ্ধ ছাগবৎসের ন্যায় ভীষণ রূপে কাঁপিতেছে। ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে কাঁপিতে ২ ভূপেন্দ্র ভূমে পড়িয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ক্ষত মুখ হইতে রুধিরস্রোতঃ ছুটিল, ভূপেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উন্মাদিনী

বিকট হাসি হাসিতে লাগিল। নির্ভীক হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ভয় আসিয়া স্থান লাভ করিল; মূকের ন্যায় চারুচন্দ্র একবার পোর্ত্তুগীজের জন্য চাহিলেন—পোর্ত্তুগীজ নাই। আম্রকানন নিঃশব্দ, অন্ধকার গাঢ়তর, সম্মুখে অজ্ঞানাবস্থ ভূপেন্দ্র নিপতিত, তাহার উপর সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য—চারু সভয়ে পশ্চাৎ হটিলেন।

কিঞ্চিৎ পশ্চাতে যাইয়াই দেখিলেন, নদীর শ্যাম সলিল সেই অন্ধকারে গা ঢালিয়া দিয়া অনন্ত ধূম্রময়ে মিশাইয়াছে, সেই নদীবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া তরতর বেগে ছুটিতেছে, একদৃষ্টে চারু-চন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন। বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সেই তরণী হইতে শব্দ আসিল—"জোরে বাহিয়া চল।" চারু বুঝিলেন, আরোহী বাহকদিগকে সত্বর নৌকা চালনা করিতে আদেশ করিতেছেন; বুঝিলেন, সে আরোহী সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে যারে চায়।

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং—— ——

ভর্ত্তৃহরি।

ঢাকার প্রকাণ্ড দুর্গের একতম প্রকোষ্ঠে সুবাদার কাসিম খাঁ একাকী বসিয়া আছেন, দূরে খোজা প্রতীহারী আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে। সুবাদারের ললাট চিন্তাপ্রদীপ্ত, কি প্রকারে অনতিবিলম্বে দিল্লী-শ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে তাহাই প্রধান চিন্তা। দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের বিশেষ কিছুই হয় নাই; প্রথম কয়েক-মাস আয়োজনেই কাটিয়া গিয়াছিল, তৎপরে ভয়ানক বর্ষায় ভীমা

পম্মা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং সে বৎসরও বৃথায় কাটিয়া গেল; তৎপর বৎসর সৈন্য কুচ করিবার সমস্ত উদ্যোগ হইল কিন্তু সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহচিহ্ন দেখা দিল, ক্রমে ২ প্রধান২ অনেক সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কাসিম খাঁ ফাঁফরে পড়িলেন, সুতরাং সে বৎসর ও কিছুই স্থির হইল না। অনেক চেষ্টায় সে বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের উপর বিশেষ প্রত্যয় নাই। অগণ্য সৈন্যসমষ্টির মধ্যে চারুচন্দ্রের ন্যায় কাসিম খাঁ কাহাকে ও বিশ্বাসী বলিয়া জানিতেন না, চারুচন্দ্রও অবিশ্বাসকে কখন ও হৃদয়ে স্থান দিতেন না। এ কয় বৎসরে চারুচন্দ্র প্রভুভক্তি ও বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ ও সেনাপতির প্রকৃতিতে গঠিত হইয়াছিল। কৃতঘ্নতা বা রণপরাঙ্মুখীনতা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিত না। উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে থাকিয়া তাহারা সুবাদারের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। চারুচন্দ্রই এক্ষণে সুবদারের সৈন্য মধ্যে সেনাপতিশ্রেষ্ঠ, চারুচন্দ্রের উপরেই সুবাদারের একমাত্র নির্ভরতা। কিন্তু, আজ বিগ্রহসচিব স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলেন, চারু ঘোর বিদ্রোহী। প্রথমতঃ বিশ্বাস হইল না, ভূপেন্দ্র অনেক প্রমাণ দর্শাইলেন, কাসিম খাঁ দেখিলেন বটে, সেই রাত্রে যখন ভূপেন্দ্রকর্তৃক গঞ্জালেস সংবাদ পাইয়া দুর্গপ্রাচীরে উত্থিত হইয়াছিলেন, শেষ রাত্রির সেই অস্পষ্ট ছায়ায় স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন চারুচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই আম্রকানন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মনে সন্দেহ জন্মিল। ভূপেন্দ্র কার্য্য সাধিয়া চলিয়াগিয়াছেন, সুবাদার একাকী বসিয়া তাহাই চিন্তা করিতেছেন। চিন্তা করিতেছেন, তবে কি তিনি এতকাল প্রতারিত হইয়া আসিয়াছেন, মালাভ্রমে তবে কি এত দিন কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।

ভাবিতে ভাবিতে নানা চিন্তা হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, ভৃত্য আসিয়া গৃহে প্রদীপ দিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সুবাদার তাহা জানিতে পারেন নাই, উন্মুক্তগবাক্ষপথে নেত্র সঞ্চালিত করিয়া শূন্যদৃষ্টে বহির্দেশে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বোধ হইল, খেলিতে ২ একখানি বিদ্যুৎ তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কাসিম খাঁ বিস্মিত হইলেন। চিনিলেন—মতিয়া।

একবার প্রতীহারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; শশব্যস্তে প্রতীহারী সুদীর্ঘ সেলাম করিল। আদেশ হইল—"দরিমন, মতিয়া বেগম কোথায় চলিয়াছেন, গোপনে পশ্চাৎ অনুসরণ কর।"

দরিমন দৌড়িল। কি ভাবিয়া সুবাদার আবার ডাকিলেন, দরিমন আসিলে বলিলেন—"না, বেগম সাহেবকে সেলাম দাও, একবার এখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

মুহূর্ত্তমধ্যে দরিমন হুকুম তামিল করিল। মহূর্ত্তমধ্যে যে বিদ্যুৎ কাসিম খাঁর চক্ষু ধাঁধিয়াছিল তাহা সেই গৃহে আসিয়া খেলিল। সুবাদার চাহিয়া দেখিলেন—মোহিনীমূর্ত্তি। রূপের তুলনা নাই, সৌকুমার্য্যের ইয়ত্তা নাই, সে সৌন্দর্য্যরাশি চক্ষে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে সুবাদার অনেক রূপরাশি দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন কখন দেখেন নাই, এ রূপরাশি দুর্ল্লভ। নবীন সূর্য্যাগ্রে সদ্যঃপ্রফুল্ল দলমলায়মী নলিনীর ন্যায়, বসন্তবায়ু সঞ্চালিত নবকুসুমিতা ব্রততীর ন্যায়, প্রাবৃট্ পয়োদভিন্ন মধুরদীপ্তি বিদ্যু-ল্লতার ন্যায় মাধুর্য্য ঢল ঢল করিতেছে। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর অলঙ্কারের রাশি, গৃহস্থিত রত্নদীপের উজ্জ্বল আলোক তাহার উপর নিপতিত; সুবাদার অতৃপ্ত নয়নে দেখিলেন—মোহিনী মূর্ত্তি। কথা সরিল না, অবাক্ হইয়া সেই লাবণ্যলীলা দেখিতে লাগিলেন। সুবাদারের সে ভাব দেখিয়া মতিয়া মোহন অধরে একটু মোহন হাসি হাসিল। বলিল—"অমন করিয়া কি দেখিতেছেন?"

কাসিম খাঁ অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন—"ব্রত উদ্যাপনের আর কত কাল বাকি?"

ম। এখন ও এক বৎসর।

কা। এক বৎসর!—নিষ্ঠুর।

ম। নিষ্ঠুর জানিয়া তবে ডাকিলেন কেন?

কা। ডাকিয়াছি—রাত্রিকালে এ বেশে কোথায়?

ম। যথা ইচ্ছা।

কা। যথা ইচ্ছা!—কোথায় যাইবে বলিয়া যাও।

আমি বলিব না

কাসিম খাঁ হাসিলেন। বলিলেন—এ পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের আজ্ঞার উপর কেহ একথা বলিতে সাহস করে নাই। ভাল, তোমায় ক্ষমা করিলাম, মিথ্যা বলিওনা। কোথায় চলিয়াছ?

ম। অনেক দূর।

কা। অনেক দূর!—কোথায়?

ম। এই নিকটেই।

সুবাদার রাগিলেন। বলিলেন—"এ ব্যঙ্গের সময় নয়; আমি বুঝিয়াছি কোথায় যাইবে। তুমি পাপীয়সী—" সুবাদার মতিয়ার কেশাকর্ষণ করিলেন।

চীৎকার ছাড়িয়া মতিয়া বলিল—"ছাড়িয়া দিন—ছাড়িয়া দিন—বলিতেছি।"

"বল" বলিয়া কাসিম খাঁ কেশ ছাড়িয়া দিলেন।

"তবে শুনুন। আমি পাপীয়সী—আমি অভিসারে যাইব।" ইহা বলিয়াই দ্রুতগতি বিদ্যুতের ন্যায় সে বিদ্যুৎবরণী গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অবাক্ হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া কাসিম খাঁ তথায় বসিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে যারে চায় না।

"পোড়া প্রাণ কেন চায়, যে জন ফিরিয়া না চায়।"

গীত।

কবি লিখিয়াছেন—"পাগল, কবি ও প্রণয়ী এ তিন ব্যক্তি সমান"—জগতসংসার ধ্বংস হইতে বসিয়াছে—কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই—পাগল আপন বিষয় লইয়াই উন্মত্ত; প্রচণ্ড ঝটিকাতাড়নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলোড়িত হইতেছে—দৃক্‌পাত নাই—কবি আপন ভাব সংগ্রহেই ব্যস্ত; প্রলয়ের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া ত্রিসংসার পর্য্যুদস্ত হইতেছে—কিসের ক্ষতি!—প্রণয়ী আপন

প্রণয় চিন্তায়ই সমাকুল। যে সময়ে কাসিম খাঁ যুদ্ধের জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন, সকলে সহসা গঞ্জালেৱ আগমন সংবাদে সশঙ্কিত হইতেছিল, নিজেও মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যখন সেই ভাবনায় আকুলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ভয়ানক সময়েই শিবিরমধ্যে নিভৃতে বসিয়া চারুচন্দ্র অন্য চিন্তায় সন্নিবিষ্ট। শয়নে, স্বপনে, দিবাভাগে, রজনীকালে, রাজসভায়, যুদ্ধক্ষেত্রে যে চিন্তা প্রতিনিয়তঃ হৃদয়ের পরতে পরতে আগুণ জ্বালিতেছে, আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে চিন্তা চারুচন্দ্রের অস্থির অস্থি, মর্জ্জার মর্জ্জা, প্রাণের প্রাণ—সেই চিন্তাই চারুকে দগ্ধ করিতেছে।

সুহাসিনী কে? বিপুল রাজ্যের অধীশ্বরের একমাত্র কন্যা; আর চারুচন্দ্র কে? অজ্ঞাতকুলশীল, নিঃস্ব, পরান্নপালিত। সুহাসিনী বিমল আকাশের বিমল চন্দ্রমা; আর চারু ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মনুষ্য—বামন; সুহাসিনীর সহিত চারুর বিবাহ কেমন করিয়া হইবে? তবে এ আশা কেন? এ ইচ্ছা কেন? বোবার কবিত্ব, বধিরের সঙ্গীতানুরাগ, অন্ধের রূপোন্মাদ সে কেবল তাহাদিগের যন্ত্রণার জন্য; এ আশা ও বুঝি সেই যন্ত্রণার জন্যই হৃদয়ে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল। সুহাসিনী দেবদুর্ল্লভ সামগ্রী, তবে সে সুহাসিনী কেমন করিয়া চারুর প্রাপনীয়া হইবে? কিন্তু সুহাসিনী কি কখন ও চারুকে ভাল বাসে? গুরুদেব! এ জগতে নিজের মন নিজেই বুঝিয়া উঠা দায়, পরের চিত্ত কেমন করিয়া বোধগম্য হইবে? আর, ভালবাসিলেই বা কি হইবে? সতীশচন্দ্র চিরকাল সত্য-পালনে স্থিরসংকল্প; সতীশচন্দ্র কি কখনও প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইতে পারেন? হয়তঃ এতদিনে বিনোদ সুহাসিনীকে বিবাহ করিয়াছে; হয়তঃ যতক্ষণ তিনি সুহাসিনীর জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছেন, ততক্ষণ সুহা-সিনী বিনোদের অঙ্কশায়িনী হইয়া পরমাহ্লাদে সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। সুহাসিনী পরস্ত্রী, পরস্ত্রী-চিন্তা মহাপাপ; চারুচন্দ্র কি তবে মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন? ভগবন্ সহায় হও, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? নিজের শরীর দিয়া মাতৃভূমির কার্য্য সাধিবার প্রতিজ্ঞায় তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কৈ প্রায়শ্চিত্ত তো হইল না, চিন্তা তো ছাড়িল না। তবে কি হইবে? অনলপতনোন্মুখ এ ক্ষুদ্র পতঙ্গের দশা কি

হইবে? অধম কীটাণু কেমন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে? প্রভো! দুর্ব্বলের বল! এ দুর্ব্বলকে বল দাও; হৃদয় হইতে চিন্তা না ছাড়ে, তোমার আশীর্ব্বাদে হাসিতে হাসিতে চারুচন্দ্র এ ছার হৃদয় উপাড়িয়া ফেলিবে।

চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া চারুচন্দ্রকে আকুল করিয়া তুলিল। দূরে এক প্রহর রজনীর ঘন্টা বাজিল, তখন ও সেই অবস্থায় বসিয়া। পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"চারু!"

চমকাইয়া চারু পশ্চাতে চাহিলেন। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দেখিলেন—মোহিনী বেশে শৈলবালা। ঘৃণায় চারুচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। শৈলবালা তাহা বুঝিল, বলিল—"তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"—উত্তর নাই। ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া শৈলবালা আবার বলিল—"কথা কহিতেছ না কেন? আমার উপর কি রাগ করিয়াছ?"

কতক্ষণ পরে চারু কথা কহিল। বলিল—"শৈল, কেন তুমি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া জ্বালাতন কর?

"আমি আসিলে যদি জ্বালাতন হও, তবে আর আসিব না।"

"আসিওনা!"—চারুচন্দ্র আবার অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

দুইবিন্দু—দুইবিন্দু অশ্রু চক্ষে দেখা দিল, শৈলবালা কাঁদিল। চারু তাহা দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলবালা অন্য মূর্ত্তি ধরিল। ক্রোধে, হিংসায়, অভিমানে তাহার সেই আর্দ্র চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, স্বভাবতঃ তেজস্বিনী শৈলবালা রাগিল। বলিল—"নিষ্ঠুর! এই কথার কি এই উত্তর।"—স্বর তীব্র, তাহা হৃদয় ভেদ করিয়া আসিল; স্থির কর্ণে চারুচন্দ্র তাহা শুনিল; বলিল—"এ উত্তর কি আজও তোমার জানিতে বাকি ছিল?"

"বাকি ছিল না, অনেক দিন হইতেই ইহা জানিতাম। তবে যে জানিয়াও আবার আসিয়াছি কেন, তাহা তোমায় কি বলিব? তুমি পাষাণ, তোমার হৃদয় নাই, তুমি তাহার কি বুঝিবে?"

"শৈল, রাগ করিও না; তোমাদ্বারা আমি যথেষ্ট উপকৃত, ইচ্ছা করিয়া তোমার মনে কষ্ট দিই নাই?"

"ভদ্রতায় সুখী হইলাম; কিন্তু কেন অভাগিনীকে মজাইলে?"

"শৈল, পাগলের ন্যায় ও কি বলিতেছ?"

"কি বলিতেছি?—বলিতেছি আমি পাগল! কিন্তু এ পাগল করিল কে? এ হতভাগিনীর মাথা কে খাইল? এত যদি নিষ্ঠুরতা করিবে, তবে কেন সে সময়ে—সেই বাল্যে, কৈশোরে, এই ছার যৌবনে—কেন তবে তেমন মধুর মূর্ত্তিতে দেখা দিলে? তোমারি জন্য—নহিলে কেন এখানে আসিব? কেন সেই সতীশচন্দ্রের পিতার ন্যায় স্নেহ, সুহাসিনীর ভগীর ন্যায় ভালবাসা—কেন সে সকল ত্যাগ করিব?—সে তো তোমারি-জন্য। নহিলে, কাসিম খাঁ আমার কে?" শৈলবালা কাঁদিল। চারুর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈলবালা আবার বলিতে লাগিল—"ছিঃ ছিঃ আমি সর্ব্বনাশী কেন মরিলাম না? যবন শিবিরে প্রবেশের পূর্ব্বে কেন গরল খাইলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম না! একবার ইচ্ছা হইয়াছিল—সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিলাম—কিন্তু পারিলাম না। সে যে পারি নাই, সেও তো কেবল ঐ মুখখানি দেখিয়া। তারপর—তারপর লজ্জা গেল, মান গেল, সাধিতে সাধিতে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছে, তবুও দয়া হইল না! নিষ্ঠুর! আবার বল ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দেও নাই?"

তিরস্কারে চারুচন্দ্র লজ্জিত হইলেন। বলিলেন—"শৈল, ক্ষমা কর, কেন বৃথা কুভাবকে পুষিয়া আপনি কষ্ট পাইতেছ? তুমি কি জাননা, তুমি আমার ভগিনী?" স্বর অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত।

শৈলবালা সে স্বর শুনিল মনে ২ বলিল—"পৃথিবি! দোফাক্ হও।" ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে তাহার গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল; মাথা হেট করিল। আবার চক্ষে জল দেখা দিল, ধীরে ধীরে তাহা মুছিয়া ঈষৎ বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলিল—"তবে এক্ষণ চলিলাম; কিন্তু আরও একটি কথা বলিবার ছিল—সুহাসিনীর কি সংবাদ পাইয়াছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া চারুচন্দ্র চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি, সুহাসিনীর সংবাদ! কৈ না; তুমি কি কিছু জানিয়াছ?"

"জানিয়াছি।" শৈলবার চক্ষুঃ জ্বলিতেছিল।

"কি সংবাদ ?"

"বলিব কেন ?"

"শৈল, আর জ্বালাইওনা ; তোমার পায়ে পড়ি, কি হইয়াছে বল।"

ধীরে ধীরে শৈল বলিল—"বিবাহ। বিনোদ বাবু এখানে আসিয়াছেন; তাঁহার সহিত সুহাসিনীর বিবাহ হইয়াগিয়াছে।"

এই সময় যদি চারুচন্দ্র একবার ভাল করিয়া দেখিতেন ; দেখিতে পাইতেন, শৈলবালা প্রকৃতিস্থ নহে, তাহার স্বর স্বভাবিক নহে, মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করা। কিন্তু সে সকল দেখিবার অবসর ছিল না। যাহা শুনিলেন তাহাই যথেষ্ট। চারুচন্দ্র মুখ বিকৃত করিলেন, কোন ও কথা বাহির হইল না। শৈলবালা সে ভাব দেখিল ; গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জানিবার জন্য অত আগ্রহ—এখন কথা কহিতেছ না যে !"

"সংবাদ নূতন নয় ; আমি অনেক দিন হইতেই ইহা প্রত্যাশা করিতে-ছিলাম।"

"অদৃষ্ট ! ভাবিয়াছিলাম, এ খোসখবর দিতে পারিলে কিছু লাভ হইবে।"—শৈলবালা যে স্বরে এ কয়টি কথা উচ্চারণ করিল তাহা বিদ্রূপাত্মক ; সে বিদ্রূপও সহজনয়—ভয়ানক মর্ম্মপীড়ায় কদাচিৎ সে স্বর সম্ভবিতে পারে ; কিন্তু সে স্বর চারুর কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না, চারু অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন, হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্বলিতেছিল।

ধীরে ২ শৈলবালা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ধ্যাননিমগ্ন তাপসের ন্যায় স্থাণুবৎ চারুচন্দ্র সেই খানে বসিয়া রহিলেন। নৈশবায়ু উদ্যানস্থ কুসুমনিচয় বিধূনিত করিয়া মুক্তবাতায়নপথে প্রবাহিত হইতেছিল, অলক্ষিতে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সে বায়ুর অঙ্গে মিশাইল ; একটি—একটি কথা সে বায়ুর সঙ্গে বহির্গত হইল ; অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া আসিয়া শব্দ হইল—"হৃদয় দগ্ধ হও।"

—o◯o—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারপর।

What next—and next?

Lytton.

আকাশ অন্ধকারময়। পশ্চিম কোণে দুই একখানি মেঘ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, ক্রমে অনেকগুলি আসিয়া একত্রে মিশিল, অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল; কে যেন জলস্থ ভূমিখণ্ডোপরি ঘনকৃষ্ণবরণের একখানি চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিল। সেই অন্ধকার মধ্য দিয়া একখানি শিবিকা চলিয়াছে, আকাশের গতিক দেখিয়া বাহকেরা দ্রুতপদে ধাবিত হইয়াছে। সম্মুখেই গভীর কষাড়বন, তথায় অন্ধকার আরো গম্ভীরতর। বাহকেরা বলিল—"আর কতদূর আছে, মা?" ভিতর হইতে বামাস্বরে উত্তর আসিল—"একটু জোরে চল, নিকটেই সে মন্দির। আরোহী—শৈলবালা।

চারুচন্দ্রের নিকট প্রত্যাখিত হইয়া শৈলবালা সে রাত্রে আর আপন গৃহে গমন করে নাই। সে জানিত, তাহার এমন অদৃষ্ট নয় যে, কখনও চারু তাহাকে ভাল বাসিবে; জানিত, প্রত্যাখ্যান সে পাইবেই পাইবে। সে তাহা জানিত, অনেক দিন হইতে তাহা তাহার অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আর সহ্য হয় না—যে একটু আশা ছিল তাহা তো নির্ম্মূল হইল; তবে আর কেন? কেন? সুহাসিনীর কিসের জোর যে তাহার চারুকে কাড়িয়া লইবে? সুহাসিনীর কি অধিকার যে, সে তাহার সম্মুখে তাহারই সামগ্রী লইয়া ভোগ করিবে? সুহাসিনী!—সুহাসিনি! সাবধান! এইবার শেষ উপায় অবলম্বিত হইবে। জগদীশ! অভাগিনীর পাপের ভরা এইবার ডুবিল, শৈলবালা শেষ উপায় অবলম্বন করিল। আজ কয়দিন হইতে তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসা বৃত্তি জ্বলিতেছিল, সে তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি সাধিবার চেষ্টায় ছিল। সুযোগ ঘটিল, সহায় ও জুটিল। একদিন সুহাসিনী আপনার গৃহের জানালা খুলিয়া বসিয়াছিল; দেখিল, গৃহের পশ্চাতে কাহারা দুইজনে গোপনে কথা কহিতেছে—সে কথোপকথন অধিকাংশ চারু ও সুহাসিনীপূর্ণ। স্থির হইয়া শৈলবালা সে কথাবার্ত্তা

শুনিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিগ্রহসচিব—শৈলবালা তাহাকে দেখিলেই যেন 'চেন চেন' করিত; কিন্তু চিনিতে পারিত না—একজন সেই বিগ্রহসচিব ভূপেন্দ্রনারায়ণ; কিন্তু অপর ব্যক্তি কে? শৈল চিনিল—বিনোদ! বুঝিল, সহায় জুটিয়াছে। রাত্রে চাকর নিকট আসিবার পূর্ব্বেই শৈলবালা বিনোদকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—নগর প্রান্ত—উগ্রচণ্ডার মন্দির—বিশেষ প্রয়োজন—একজন অপেক্ষায় রহিবে।" পত্র মধ্যাহ্নে প্রেরিত হইয়াছিল; রাত্রে একবার চাকর শেষ কথা শুনিবার জন্য শৈলবালা গিয়াছিল। শুনিল—যথেষ্ট। আকাশ অন্ধকার—ক্ষতি নাই—হৃদয়মধ্যে যে অন্ধকার ছাইয়া রহিয়াছে তাহার নিকট ইহার কিসের তুলনা? বিভীষিকাময়ী চপলা ক্ষণে ক্ষণে চমকিতেছে; কিন্তু হৃদয়ে যে প্রবল আগুন জ্বলিতেছে তাহার নিকট ইহার কিসের বিভীষিকা? শিবিকাদি প্রস্তুত ছিল; শৈলবালা সেই মন্দিরোদ্দেশে শিবিকারোহণে চলিল।

তারপর? তারপর যাহা ঘটিল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। সে ঘটনার পরে আরও কি কিছু হইয়াছিল? হইয়াছিল বৈ কি; শুনিবে?—

রাত্রি তখন ও শেষ হয় নাই, সে রাত্রির সে ভীষণ ঝটিকা তখনও উপশান্ত হয় নাই; তখনও আকাশ পৃথিবী, নক্ষত্র, নীলিমা সমস্ত গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত; ভূপেন্দ্র আপন শিবির মধ্যে বসিয়া আছেন; নিকটে একজন মুসলমানবেশী পোর্ত্তুগীজ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভূপেন্দ্র বলিল—"কি সংবাদ?" পোর্ত্তুগীজ কথা কহিল না, বস্ত্রমধ্য হইতে একটি পদার্থ বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল। দীপালোক তাহার উপর পতিত হইল। ভূপেন্দ্র চমকিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! এ কাহার ছিন্নমুণ্ড? এখন ও তাহা দিয়া রক্ত টোপাইতেছে, এখন ও তাহার চক্ষু ভীষণ প্রতিজ্ঞায় জ্বলিতেছে। ভূপেন্দ্রের কথা সরিল না। পোর্ত্তুগীজও কোন কথা না বলিয়া একখানি পত্র দিয়া ধীরে ২ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

কতক্ষণ পরে ভূপেন্দ্র দীপাগ্রে সে পত্র পড়িল। তাহাতে লিখিত—"আমার সত্য পালন হইল। বড় সুবিধা হইয়াছিল, কি জন্য জানিনা,

হতভাগ্য অন্ধকার দিয়া আপন শিবির হইতে শিবিকারোহণে দূরবনে গমন করিয়াছিল। আরও কে বনমধ্যে তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল; বাঙ্গালা-ভাষায় ততদূর বিজ্ঞ নহি, সুতরাং সে সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, আপনার সেই পাগলীকে ও সে বনমধ্যে একবার দেখিয়াছিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই দেখি হতভাগ্য ফিরিতেছে—তারপর—এই মুণ্ড পাঠাইলাম, আমার প্রতিজ্ঞাপালন হইল। ঝড় বৃষ্টি আপনার জন্য কিছুই গ্রাহ্য করি নাই, এক্ষণে আপনার কথা পালন হইলে বাধিত হইব—(সাক্ষর) প্রেতপুরীর বন্ধু।" ভূপেন্দ্র পত্র পাঠ করিল। দীপালোকে আনিয়া সেই মুণ্ড ভাল করিয়া দেখিল। হরি হরি! একি! মতিয়া—মতিয়ার ছিন্নশির! ভূপেন্দ্রের বক্ষঃবেপন আরম্ভ হইল; আলোক আরো উজ্জ্বল করিয়া দিল, ভাল করিয়া দেখিল। একবার সেই নিরুদ্দিষ্টা অপহৃতা কন্যার কথা মনে জাগিল—যেন যেন—আর ভূপেন্দ্র স্থির থাকিতে পারিল না; আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন মরীচিকা।

ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে,
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্নপতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।

কবিতাবলী।

পরদিন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া শুনিল, সুবাদারের প্রধানা বেগম মতিয়া গোপনে নিহত হইয়াছে; হত্যাকারী ও ধৃত হইয়াছে—তাহার গৃহে সে ছিন্নমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে; সকলে আরো আশ্চর্য্য হইল, সে হত্যাকারী চারুচন্দ্র। এ হত্যা কেন হইল—তাহারও প্রমাণাভাব নাই, চারুর সহিত মতিয়ার গুপ্তপ্রেম ছিল, বেগমের জনৈক বাঁদী বিবিজান তাহা সুবাদারের

নিকট ভয়ে প্রকাশ করিয়াছে। বিষম আশঙ্কা! আবার বিগ্রহ সচিব স্পষ্ট বলিতেছেন, চারু গঞ্জালের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে প্রবৃত্ত। গুরুতর অপরাধ—দণ্ড ও গুরুতর। জীবনদণ্ড তো হইবেই, কিন্তু মুসলমানদিগের জীবনদণ্ড-প্রণালী বহু প্রকার—জীবন্তকে প্রাচীরমধ্যে গ্রথিত করিত, শূলে আরোহণ করাইত, কুক্কুর দিয়া গাত্রমাংস ভক্ষণ করাইত—আরো বহুতর ছিল। কি প্রকার জীবনদণ্ডের আজ্ঞা হইবে তাহারই চিন্তায় সকলে সশঙ্কিত।

সেই ভীমকান্ত দুর্গের উপর অপরাহ্নে ভীমকান্ত সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুবাদারের মূর্ত্তি আরো ভীমকান্ত। রোষে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে। অদূরে বদ্ধহস্ত চারুচন্দ্র অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দুইবিন্দু অশ্রুর সঙ্গে তাহার ও চক্ষুঃ জ্বলিতেছে, ঘৃণায়, ক্রোধে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সভাস্থ সকলে নীরব, একটি ও নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে না, ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির ন্যায় সে সভা ভীষণ নিস্তব্ধ।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে কাসিম খাঁ বলিলেন—"বিদ্রোহি! হত্যাকারি!"—ক্রোধে সুবাদারের আর কথা সরিল না। সেই কঠোর শব্দ শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া একবার সেই দিকে চাহিল—সে মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর দিয়া যেন অগ্নি ছুটিতেছে। তাহা দেখিয়া সভয়ে সকলে একবার চারুর প্রতি চাহিল; দেখিল, দীর্ঘকায় নির্ভীক যোদ্ধা সেই অগ্নিসম্মুখে নিষ্কম্পভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তাহার মস্তক উন্নত, চক্ষের একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না, কেবল বিশাল বক্ষঃ গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে। ধীরে২ চারু বলিল—"জাঁহাপনা! এ দাস সে সব দোষে নির্দ্দোষী।" স্বর স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত।

গর্জ্জিয়া কাসিম খাঁ বলিলেন "মিথ্যাবাদিন্! এখনও তোর জিহ্বা কুক্কুরভোজ্য হইল না? সে রাত্রে কি জন্য আম্রকানন হইতে আসিতেছিলি?"

ইহার উত্তর কি দিবে? চারুচন্দ্র যাহা বলিতে যাইতেছিল দারুণ ক্রোধে তাহা বাহির হইল না, একবার ওষ্ঠ কম্পিত হইল মাত্র, চক্ষুদ্বয় জ্বলিল, সেই অগ্নিময় দৃষ্টিতে একবার ভূপেন্দ্রের প্রতি চাহিল। ভূপেন্দ্র

অন্তরে শীহরিল, বলিল—"জাঁহাপনা! এ হত্যাকারী, ইহাকে বিশ্বাস নাই; হঠাৎ কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে। প্রভুর সম্মুখে এ প্রকার আকারেঙ্গিত মার্জ্জনীয় নহে।"

ভূপেন্দ্রের সে কথা সুবাদারের ক্রোধে আহুতি স্বরূপ হইল, কর্কশ স্বরে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! মতিয়ার ছিন্ন শির কেন তোর গৃহে পড়িয়াছিল? কেন তাহাকে হত্যা করিয়াছিলি?

অতি ধীরস্বরে চারু উত্তর করিল—"প্রভু! এ প্রহেলিকা আমি কিছুই বুঝিতেছি না।"

ক্ষিপ্তপ্রায় কাসিম খাঁ তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"এ বাঁদী কি বলিতেছে? বিশ্বাসঘাতক! এই জন্যই কি কালসর্প পুষিয়াছিলাম?

মুহুর্ত্তের জন্য চারুচন্দ্র সে বাঁদীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সভার এক পার্শ্বে অবনতমস্তকে বিবিজান দাঁড়াইয়া ছিল। বলা বাহুল্য, সে পত্র বহনের দিন অত কাঁদিলেও পুরস্কারের লোভে বিবিজান আরো অনেকবার মতিয়ার দূতীর কার্য্য করিয়াছিল। চারু বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু বিবিজান তাঁহার বিরুদ্ধে কি বলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। অবাঙ্মুখে মাটীপানে চাহিয়া রহিলেন।

কাসিম খাঁ বলিলেন—"মস্তকচ্ছেদ তোর পক্ষে অতি সামান্য দণ্ড; কিন্তু তুই সৈন্যমধ্যে থাকিয়া এক সময়ে বাদশাহের অনেক কার্য্য সাধিয়াছিস—অন্য দণ্ড দিব না।" তৎপরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জল্লাদ, অবিলম্বে ইহাকে বধ্যভূমে লইয়া যাও।"

জল্লাদ আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইল। কাসিম খাঁর দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার পুত্র তরুণ যোদ্ধা এনায়েত উল্লা দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে সে কঠোর আজ্ঞা শুনিল। একবার চারুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল তখনও সে মূর্ত্তি স্থির, নিষ্কম্প। হৃদয় গলিল। চারু আসিয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা এনায়েতের পার্শ্বে বিচরণ করিত। এনায়েত উল্লা ও বীরধর্ম্মা, চারুর বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, পিতার নিকট অনেক সময় তাহার প্রশংসা করিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল, মাত্র জাতিভেদ ভিন্ন

উভয়ে কোনও প্রভেদ ছিল না। আজ সেই প্রিয়তম সহচরের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হইবে তাহাতে বিস্ময় কি? এনায়েত উল্লা ধীরে ২ ভূতলন্যস্তজানু হইয়া পিতার চরণ স্পর্শ করিল। ধীরে ২ বলিল—"পিতঃ অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করিবেন—সাহস হয় না—যদি অনুমতি করেন, একটি কথা বলি।"

যুগপৎ সভাস্থ সকলের বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্র তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। বিস্মিত হইয়া কাসিম খাঁ বলিলেন—"অনুমতি করিতেছি, যাহা বলিবার থাকে নিঃশঙ্কে বল।"

এনায়েত তথাপি কিছু না বলিয়া তিনবার ভূমে শির নত করিল, একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল; তারপর সজল নয়নে বলিল—"এক সময় আপনার এক দাসীর মৃত্যুশয্যায় বসিয়া তাহার বালককে কি ভিক্ষা দিবেন বলিয়াছিলেন, আজ—

এনায়েতের কথায় বাধা দিয়া সুবাদার স্তম্ভিতপ্রায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মৃতার কথায় চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল; ধীরে ২ সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিলেন। একটি গভীর নিশ্বাসে হৃদয়ের দুঃখ ব্যক্ত হইল। সকলে বুঝিল, সুবাদার মৃতা ভার্য্যার শোক আজও ভুলিতে পারেন নাই। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কাসিম খাঁ বলিলেন—"আজ—আজ কি বলিতেছিলে?"

যুক্ত করে এনায়েত বলিল—"আজ সেই বালক সেই ভিক্ষা চাহিতেছে—অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বাঙ্গালীর প্রাণ রক্ষা করুন।"

অকস্মাৎ যদি সে সভামধ্যে বজ্রপাত হইত তাহাহইলেও সভাস্থ সকলে এত চমকিত হইত কি না সন্দেহ। সুবাদারও চমকিত হইলেন। ক্রোধে মুখ বিকৃত করিলেন; বলিলেন—"সুবাদারের আজ্ঞায় কথা কহিলে প্রাণদণ্ড হয়।"

এনায়েত উল্লা নিরুত্তরে অধোমুখ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাসিম খাঁ আবার বলিলেন—"কিন্তু মৃতার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; আল্লা জানেন, তুমি পুত্র, তুমি এ কার্য্য করিলে কখনও ক্ষমা করিতাম কি না। ভাল, আমি উহার প্রাণরক্ষা করিলাম; কিন্তু আর উহার মুখ আমি দেখিতে চাহিনা;

এখনি এ স্থান হইতে দূর হউক।"

সেই রাত্রের ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী বুড়ীগঙ্গা দিয়া দ্রুতগতি চলিয়াছে। দেখিতে২ অনেক দূর গিয়া পড়িল; তরিখানি একটি তীরে লাগিল। অন্ধকারছায়ার মধ্যে তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি উপরে উত্থিত হইল। দুইজনে অনেক কথা হইল, দুইজনে দুইজনের গলা ধরিয়া কাঁদিল। কতক্ষণ পরে কাঁদিতে ২ একজন ফিরিয়া আসিয়া সেই তরণীর উপর আরোহণ করিল। মূহূর্ত্তপরে আবার সে ব্যক্তি দুর্গে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু অপর ব্যক্তি আর ফিরিল না। যে ব্যক্তি ফিরিল তাহাকে দুর্গস্থ প্রহরীরা দেখিল। দেখিল—এনায়েত উল্লা। কিন্তু যে ফিরিল না, সেই দিন হইতে তাহাকে আর কেহ কখন সেখানে দেখিতে পাইল না।

প্রতাপ।

চরিত্র-গঠনই কবির প্রধান উদ্দেশ্য। কাব্য হউক, নাটক হউক, বা নবেল হউক তাহাতে যদি উৎকৃষ্ট চরিত্র অঙ্কিত না থাকে, তাহা হইলে কেবল বর্ণনা কিম্বা কোন একটি রসের প্রাধান্যে পাঠকগণের ততদূর মনোহরণ করিতে পারে না। মহাকবি সেক্সপীয়ার চরিত্র গঠনে অদ্বিতীয় বলিয়া আজ সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পূজা করিতেছে, এবং যতদিন ইংরাজী ভাষা থাকিবে ততদিন সর্ব্বত্রে সম্মানের সহিত পূজিত হইবেন। ভারতে অসংখ্য কবি থাকিতে ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে কালিদাসের এত মান, এত গৌরব, এত যশ কেন? পশ্চাত্য কবি লোপডিভেগার (Lope de Vago) সে নিপুণতা ছিল না বলিয়া অসংখ্য নাটক লিখিলেও তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার যশোগৌরব চলিয়া গিয়াছে; এখন সেই অসংখ্য নাটকের মধ্যে কয়খানি দেখিতে পাওয়া যায়? তাহার মধ্যে কয়খানিই বা লোকে

আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকে? চিত্রকর যেমন রং ফলাইয়া যেখানে যে রং দিলে চিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদন হইতে পারে, তুলির সাহায্যে সেই খানে সেইরূপ রং দিলে উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়, কবিও সেইরূপ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহার বর্ণিত চরিত্র সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই খানে সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার চরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে।

কোন এক প্রসিদ্ধ জীবনবেত্তা লিখিয়াছেন যে, ইতিহাস অপেক্ষা জীবন-চরিত পাঠ করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। কারণ, ইতিহাসে সমস্ত দেশের একত্র বহুসংখ্যক লোকের জীবনচরিত, তদ্ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সকল একত্রে সমাবেশিত থাকায় কেহই পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু কাহার ও জীবনচরিত পাঠ করিলে তাঁহার উপর আমাদের সহানুভূতি জন্মায়, তাঁহার বিপদে যেন আমাদের নিজের বিপদ মনে হয়, তাঁহার উদ্ধারে যেন আমরাও উদ্ধার হই; সুতরাং তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন একটা দাগ থাকিয়া যায় এবং বিশেষ ফল ও দর্শে। কাল্পনিক জীবন চরিত পাঠে ও সেই রূপ এবং এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক ফল দর্শিতে পারে; কারণ কবি তাঁহার কল্পনা প্রভাবে তাঁহার নায়কের জীবন চরিত এরূপ প্রকারে লিখিয়া থাকেন যাহাতে তাহা পাঠ করিলে সমাজের কোন উপকার ঘটিতে পারে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে জীবনবেত্তা অন্য কোন পথ অবলম্বন করিতে পারেন না।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কবি চরিত্র গঠনে সৃষ্টির যথাযথ অনুকরণ করিবেন না তাঁহার কল্পনা প্রভাবে নূতন সৃষ্টি করিয়া জগৎকে চমকিত করিবেন! আমরা বলি, প্রকৃত কবিকে দুই করিতে হইবে। অনুকরণের দ্বারা সাদৃশ্য-সৌন্দর্য্য দেখাইয়া কল্পনার প্রভাবে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইবে।

বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান লেখক, চরিত্র গঠনে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা; তাই সমস্ত বঙ্গদেশ আজ তাঁহার যশোগৌরবে পরিপূর্ণ। তাঁহার সূর্য্যমুখী, তাঁহার কুন্দনন্দিনী, তাঁহার কমলমণি, তাঁহার আয়েষা, তাঁহার তিলোত্তমা, তাঁহার কপালকুণ্ডলা, তাঁহার লবঙ্গলতা, তাঁহার ভ্রমর প্রভৃতি

সকলেই এক একটি রমণীরত্ন। আমরা কাহাকে রাখিয়া কাহারও প্রশংসা করিতে পারি না; অথচ সকল গুলিই ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত। স্ত্রীচরিত্র গঠনে তিনি যে রূপ কৃতকার্য্য হইয়া যশঃস্বী হইয়াছেন, পুরুষ চরিত্র গঠনে ততদূর কৃতকার্য্য না হন, কিন্তু তিনি যে অপটু নন আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ণবাবু তাঁহার রমণীরত্নগুলির বহুমূল্যতা দেখাইয়া যে "কাব্য সুন্দরী" লিখিয়াছেন তাহা ও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অমূল্য রত্ন এবং তিনি ও তাহাতে যশঃস্বী হইয়াছেন। আমাদের লেখনী ততদূর তেজস্বিনী নয়, সুতরাং আমরা যশের প্রত্যাশী নই। আমরা যদি বঙ্কিম বাবুর পুরুষ চরিত্র গুলির বহুমূল্যতা দেখাইতে না পারি তাহাতে তাঁহার প্রতিভায় কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না, মাত্র আমাদের দুর্ব্বল লেখনীর পরিচয় দেওয়া হইবে। আমরা প্রথমে চন্দ্রশেখর হইতে প্রতাপের চরিত্র লইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

চন্দ্রশেখর-পাঠক মাত্রেই প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন, ইন্দ্রিয়সংযম এবং সাহসের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে বঙ্কিম বাবু প্রতাপ চরিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গসমাজে আনিয়াছেন; কারণ, প্রতাপ—চরিত্রের ন্যায় চরিত্র বঙ্গসমাজে বহুল পরিমাণে অভাব আছে। সমাজের অত্যাচারে প্রতাপের ন্যায় অনেকে অত্যাচারিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন প্রতাপের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমী? কয়জন তাহার ন্যায় সাহসী? কয়জন তাহার ন্যায় আত্ম বিসর্জ্জনক্ষম? কবি প্রথমে সমাজের ঘোর অত্যাচারের দৃশ্য দেখাইলেন, তাহার পর অত্যাচরিত ব্যক্তির কি রূপ গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত তাহা শিক্ষা দিলেন; এই রূপ শিক্ষার জন্যে সমাজে কবির আদর এত অধিক এবং সেই জন্যেই কবির নিকট সমাজ বিশেষ উপকৃত ও ঋণী।

বাল্যকাল হইতে প্রতাপ শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে শিখিল। দুইটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুইটি ক্ষুদ্র নদী একদিকে ছুটিল। বঙ্কিম বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন,—"অঙ্কুরে ও বৃক্ষের গুণ আছে। জন্মাবধি মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম স্নেহশালিতা। বালকের ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে জানে না।"

ভালবাসা হইল, কিন্তু বিবাহ হইল না। যে দুইটি ক্ষুদ্র নদী তরঙ্গের পর

তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে মিলিতে আসিতেছিল, তাহা মিলিতে পারিল না, মিলিবার সময়েই বাধা পাইল, সে বাধা সামাজিক—শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি কন্যা।

যদিও আমরা বিবাহ পদ্ধতিকে সমাজের বিশেষ মঙ্গলকর বলিয়া স্বীকার করি, তত্রাচ আমাদের সমাজের বিবাহপদ্ধতি যে সময়ে সময়ে প্রকৃত প্রণয়ের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাও স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নই। বিবাহ সমাজের বন্ধন বই আর কিছুই নয়, এই বন্ধন না থাকিলে সমাজের অনেক সময় অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে পারে। এখনও যে সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই বিবাহ পদ্ধতি নাই তাহারাই ইহার প্রমাণস্থল। কিন্তু আমরা এ কথাও স্বীকার করি যখন শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়ের প্রণয় গাঢ় হইয়াছিল, তখন তাহাদের বিবাহ না হইলেও শৈবলিনী প্রতাপের, প্রতাপ শৈবলিনীর,—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ করিবার কে? মনে মনে উভয়ে যখন উভয়ের সম্মতিতে উভয়কে মন, প্রাণ, হৃদয় সমস্ত অর্পণ করিয়াছে, তখন ত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সে বিবাহের অন্য কেহ স্বাক্ষী না থাকিলেও অন্তর্যামী ঈশ্বর তাহার স্বাক্ষী।

প্রতাপ জানিত যে শৈবলিনী জ্ঞাতিকন্যা বলিয়া তাহার সহিত শৈবলিনীর [illegible] হইবে না, কিন্তু শৈবলিনী বালিকা অত বুঝিত না। পরে যখন বুঝিল যে প্রতাপ ভিন্ন এ জগতে তাহার অন্য সুখ নাই, তখন জানিল যে এ জীবনে প্রতাপ তাহার হইবে না!! দুই প্রণয়ী যুগল তখন আপনাপন অবস্থা বুঝিল, এ পাপ পৃথিবীর সমাজের অত্যাচার তাহাদের অসহ্য হইল, উভয়ে গোপনে গোপনে অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল, পরামর্শে স্থির হইল যে এ পাপ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া উভয়ে অন্য কোথায় গিয়া অনন্ত প্রেম অনন্ত ভালবাসা অনন্ত প্রণয় নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিবে।

পরামর্শে কি স্থির হইল কেহ জানিল না, দুই জনে একদিন গঙ্গাস্নানে গেল, প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিল, আয় শৈবলিনী আমরা সাঁতার দিই—এই খানে প্রতাপ যে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। এ দৃশ্য কিরূপ সুন্দর ও পবিত্র তাহা

একবার ভাবিয়া দেখুন ; প্রণয়ী যুগল মনোমত প্রণয় পাত্রে আপনাপন প্রণয় স্রোত মিশাইতে পারিল না বলিয়া মনোদুঃখে, ক্ষোভে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে।

অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এই খানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময় শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

এই খানে প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জনের আমরা প্রথম পরিচয় পাই, কবি কিরূপ রং ফলাইয়া প্রতাপের চরিত্র অঙ্কিত করিবেন, এই খানেই তাহা আমরা বুঝিয়া লইতে পারি। এত অল্পবয়সে ইহা অপেক্ষা আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই খানেই কবি শৈবলিনী অপেক্ষা প্রতাপের চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বাঙ্গালার কবি ও কাব্য।

[১৭ পৃষ্ঠার পর]

আবার ম্যাক্‌বেথ যেখানে কণ্টকময় দুস্তর তৃণদল পরিশোভিত ক্ষেত্র মধ্যে বিকটাকার ডাকিনীত্রয়কে সমবেত করিয়াছেন, যে স্থানে তাহাদের অধিনায়িকা হেকেটির সঙ্গে পৈশাচিক মহামন্ত্র সকল সমস্বরে এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অদ্ভুত ভাবে নৃত্য করিতেছে তাহার শেষে উন্মত্তপ্রায় ম্যাক্‌বেথ আসিয়া অতি কর্কশস্বরে—"রে ছদ্মচারিনি অন্ধকারময়ি নিশাচরি ডাকিনীগণ" বলিয়া

তাঁহাদের নৃত্যগীতের বিঘ্ন সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যেখানে সেই প্রজ্বলিত কটাহ হইতে পলে পলে মুহূর্ত্তে২ অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ মস্তক সকল উত্থিত হইয়াই আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে লীন হইয়া যাইতেছে; সেই খানে আমাদের হৃদয়ে কবিতার কোন্ কোমলতর রসের অবির্ভাব হয়? তখন বরং ভয়ানক বীভৎস ইত্যাদি কতকগুলি কঠোর রসই আমাদের হৃদয় মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া আমাদের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলে। আমরা বলি সমস্ত প্রকৃতিই যখন কবিদিগের প্রমোদ ক্ষেত্র, সকল প্রকার রসই যাঁহাদিগের অপরিহার্য্য তখন কোন-মহাকবিরা একটি নির্দ্দিষ্ট রসকে কবিতার অদ্বিতীয় জীবন বলিয়া জ্ঞান করিবেক? অনেকানেক মহাকবি দৈব শক্তিতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সর্গমর্ত্ত নরক ভ্রমণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই—বাল্মীকি ব্যাস, হোমার, দান্তে, মিল্টন সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, কারণ তাহারা জানিতেন একে এই ক্ষুদ্র পরিখীকৃত পৃথিবী তাহাতে রস বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কাব্যের পরিখা হ্রাস হইয়া যায়, কাব্যের আবশ্যকতা থাকে না, কবিদিগের অলৌকিক ক্ষমতার হীণজ্যোতিঃ হইয়া পড়ে, কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে কে আজ মহাকাব্য পড়িয়া আহ্লাদিত হইতে পারিত—তাহা হইলে কে আজ হোমর অথবা ব্যাস, দান্তে অথবা মিল্টনের বর্ণনায় মাতোয়ারা হইয়া পড়িত। তাহা হইলে বোধ হয় এত দিনে সকলে প্লেটোর ন্যায় অনেক প্রাচীন মহা কবিদিগকে বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কবিতার স্বর্গীয় জ্যোতিটুকু একেবারে হ্রাস করিয়া ফেলিত; অথবা কবিমাত্রকেই দেশ হইতে দূর করিয়া দিত।

মহাকবিরা প্রায়ই মহাকাব্য মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন না। কেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন কতকগুলি রসের দ্বারা কতকগুলি রসের সামর্থ বর্দ্ধিত হয় আর কতকগুলি রসের সমন্বয়ে কতকগুলি রসের সামর্থ লঘু করিয়া ফেলে; এই জন্য মহাকাব্যে প্রয়োজনমত সকল প্রকার রসের সন্নিবেশ থাকে; হাস্যরসটি সকল রসের বিঘ্নকারী বলিয়া—হাস্যরসকে মহা কবিমাত্রেই অল্প পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, পাঠকের হৃদয় রৌদ্ররসেই উত্তেজিত হউক,

ভয়ানকরসেই মন উদ্বেলিত হইয়া উঠুক, করুণ রসেই একেবারেই দ্রবীভূত হইয়া যাউক বা ভক্তিরসেই পুলকিত হইয়া যাউক, কিন্তু পাঠকের মন যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন প্রকৃত হাস্যরসের অবতারণাতে হৃদয় এতদূর শিথিল হইয়া পড়িবে যে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল রসের শক্তিকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিবে। প্রকৃত কথা, কি মহাকাব্য, কি মহানাটক কি খণ্ডকাব্য, কি গীতিকাব্য, কি নাটক যে কোন রচনাই হউক না কেন যে কবি পাঠকহৃদয়ের দেবপ্রকৃতি উদ্দীপ্ত করিতে চাহেন তাহারই রচনাতে হাস্যরসের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। যে সেক্সপিয়ার ফলষ্ট্যাফ ক্যালিব্যান, ও কমিডি ওফ এরর লিখিয়াছেন সেই সেক্সপীয়ার লিয়ারে বা ওথেলোতে, হেমলেটে বা ম্যাক্‌বেথে হাস্যরসের অবতারণা করিতে কি পর্য্যন্ত না সঙ্কুচিত হইয়াছেন,—সেই সেক্সপীয়ারের আবার কেটো বা ভিনিস্ প্রিজারর্ভতে হাস্য রসের নাম মাত্রও নাই। ডিমক্রিটিস্ জগতে যাহাই দেখিতেন তাহাতেই তিনি হাসিতেন আবার হিরাক্লিটস জগতে যাহা দেখিতেন তাহাতেই তাহার নয়ন হইতে অনবরত দরবিগলিত ধারা প্রবাহিত হইত; কিন্তু যথার্থ জগতের প্রকৃতি হিরাক্লিটস ও ডিমক্রিটিসের চক্ষে দেখিতে হইলে আমরা বুঝিতে পারিব সমস্ত প্রকৃতিতেই হাস্য ও করুণরস অবাধে চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে;—যেন প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের প্রতি সূত্রেই হাস্য ও করুণা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংমিলিত রহিয়াছে যে, তাহাতে বোধ হয় একটি রস যে, কবিতার সীমাগত আর একটি যে কবিতার সীমার বাহিরে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্বীকার করি, বীর বা করুণরসের ন্যায় হাস্যরস মানবশরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় ছুটিয়া বেড়ায় না; সত্যবটে দুঃখের ভাগেই এই জগতের তুলাদণ্ড নত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কাল্পনিক ভীষণ দুঃখের প্রতিমা দেখাইয়া মহা কবিরা জগতের প্রকৃত দুঃখকে সর্ব্বদা মানব হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া রাখেন। ইহাই কবিদিগের প্রকৃত গৌরবের কর্ম্ম।

বঙ্গ সাহিত্যকারের দ্বিতীয় দোষ—ছন্দময়ীরচনা না হইলে তাহা কাব্য নহে। সকলেই বোধ হয় বানভট্টপ্রণীত কাদম্বরী ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎকর্ষদাতা বঙ্কিম বাবু প্রণীত করুণরসপ্রধান "বিষবৃক্ষ"

নামক উপান্যাস পাঠ করিয়াছেন। কাদম্বরীতে যখন মহাশ্বেতা গম্ভীর নিশীথে অভিসারিকা বেশে পুণ্ডরীকের নিকট যাইতেছিলেন তখন বন্ধু বিয়োগদুঃখে কাতর কপিঞ্জলের সেই হৃদয়বিদারক করুণ বিলাপধ্বনি দেহের প্রতি ধমনীতে ধমনীতে প্রবিষ্ট হয় এবং পাঠকের মনকে একেবারে উদাস করিয়া দেয়; আবার বিষবৃক্ষ পড়িতে পড়িতে যখন আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; তরঙ্গের ন্যায় হৃদয় মধ্যে নানা প্রকার ভাবের উদ্রেক হয় এবং করুণরসে পাঠকের মনখানি তরল হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, মন দরাজ হইয়া যায়, যেন সেই পাঠক তাহার অস্তিত্বের বিষয় ও ভুলিয়া যান। (আমরা কেবল মাত্র বিষবৃক্ষের নামোল্লেখ করিলাম বটে কিন্তু বঙ্কিম বাবু প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থেই উপান্যাস অপেক্ষা কবিতায় পরিপূর্ণ।) বঙ্গ সাহিত্যকারের মতে উক্ত পুস্তকগুলি ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ নয় বলিয়া উহারা কাব্য নহে—যদি উহারা ছন্দোময়ী হইত তাহা হইলে তাঁহার মতে উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। আমরা বুঝিতে পারিলাম না কেন বঙ্কিম বাবু পদ্যরূপে আলুলায়িত রাখিয়া পয়ার বা ত্রিপদীতে গ্রথিত করিয়া সাহিত্য জগতে উপঢৌকন দেন নাই, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গসাহিত্য কারের মতে বঙ্কিম বাবু একদিন কাব্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন, তাঁহার প্রণীত পুস্তক সকল ছন্দোময়ী নহে সুতরাং বঙ্কিম বাবু কবির প্রতিপত্তি লাভ করিতে অক্ষম। বঙ্গসাহিত্যকার কবিতার যে দুটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন সে দুইটিই ভ্রমাত্মক, তাহার কারণ বোধ হয় গ্রন্থকার ইংরাজ আলঙ্কারিকদিগের আড়ম্বরে প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি যদি হিজলিটের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের উপর নির্ভর করিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বড় উপাদেয় বস্তু হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।*

---

* বঙ্গসাহিত্য প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তম না হইলেও আমরা তাঁহার প্রসংশা করি, কারণ রমেশ বাবু দূরদেশ ইংলণ্ড হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও যে বঙ্গভাষাকে ভুলিতে পারেন নাই, ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব; ঈশ্বরকরুন রমেশ বাবু দীর্ঘজীবি হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের মুখশ্রী উজ্জ্বল করুন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল অপেক্ষা সাহিত্যদর্পণকার কবিতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠককে পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার মতের তুলনায় সমালোচনার পূর্ব্বে আমরা আর একজন ইংরাজ আলঙ্কারিকের মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের গন্তব্য পথকে নিষ্কণ্টক করিতে ইচ্ছা করি। রবর্টসন বলেন "উচ্ছ্বসিত হৃদয় গত ভাবের ভাষার নামই কবিতা।" এক্ষণে বলা আবশ্যক, উক্ত আলঙ্কারিক যাহা বলিলেন তাহাতে পাঠক বা শ্রোতার মনে তাঁহার মনের অনুরূপ ভাব উদয় হইল কি না? তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয় মিশিল কি না সে কথা তিনি জানিবার জন্য বড় উৎসুক নন, ইহাই যে তাঁহার কেবল দোষ তাহা নহে, তদপেক্ষা আর এক মহৎ দোষ এই যে উক্ত আলঙ্কারিক কবিতার প্রভাব ও প্রকৃতি সম্যকরূপে হৃদয়গত করিতে পারেন নাই। আমরা কেন যে বিখ্যাত ইংরাজ আলঙ্কারিক রবর্টসনের বিরুদ্ধে একথা বলিলাম তাহার কারণ এই আমরা দেখিয়াছি অনেকে আপনার হৃদয়ের দুঃখ বর্ণনা করিতে করিতে এমন এক একটা কথা বলিয়া বসেন যে তাহা শুনিলেই আমাদের হৃদয়ে বিলাপকারীর অনুরূপ ভাব উদয় না হইয়া তাহার সেই দুঃখের তরঙ্গ প্লাবিত হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় না ঢালিয়া দিয়া করুণ রসের পরিবর্ত্তে, আমাদের হৃদয় হাস্য রসে প্লাবিত হইয়া যায়। মনে করুণ কোন অনাথিনী নয়নের নিধি একমাত্র পুত্রের মৃত দেহ লইয়া স্বয়ং শ্মশানে সৎকার করিবার জন্য আসিয়াছে; স্বীকার করি, সেই শোকাতুরা জননীর বিলাপধ্বনি শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, সেই চিত্র সচক্ষে দর্শন করিলে হয়ত আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। কিন্তু সেই চিত্র বর্ণনানুসারে আমরা ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে না হাসিয়া থাকিতে পারি না; যখন লেখক বা বক্তার হৃদয়ের অনুরূপ ভাব পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল না; সহস্রবার সর্ব্ববাদিসম্মত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভাব ভাষায় পদ্যে বা গদ্যে বর্ণনা করুন তাহা কবিতা নামের অযোগ্য। আমাদিগের কথার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; লজ্জাবশতঃ আমরা সেই স্থানটী সমুদয় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; ভয় হয়, পাছে সেই

পবিত্র কল্পনা, বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা পাঠক সমীপে অপদস্থ হই। সেই দুইটী এই

——————————প্রেম সরোবরে
নিবিত না তৃষ্ণা কি হে সুশীতল নীরে?
ত্যজি এ নির্ম্মল জল ত্যজি দুঃখিনীরে
কেন ঝাঁপ দিলে হায়! পাপের সাগরে?
রূপের ভাণ্ডারে নাথ! যৌবন রতন
ছিল না কি?

অবকাশ রঞ্জিনী।

আর একটি

ভালবাসা সুখ আশা তামাসার নয়
* * * সে প্রেম কোথায়?
ভালবেসে পরিশেষে কি বা সুখ হ'ল
তামাসা ঘুরিয়ে গেল—হৃদয় শ্মশান হ'ল
চক্রবাক্ চক্রবাকী—কাঁদে উভরায়
বাজে হায় হায় হায়।

শ্রীঅধর লাল সেন প্রণীত নলিনী।

পাঠক দেখুন, কবির হৃদয়ের ভাব কতদূর বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে; পবিত্র প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া কতদূর হাস্য রসের অবতারণা করিয়াছেন; রবার্টসনের মতে উক্ত দুইটি শ্লোক ও কবিতা বলিয়া পাঠক সমাজে পরিচিত হইবার যোগ্য! বঙ্গ ভাষার হৃদয়ে শত বজ্র পড়ুক, আমাদের নয়ন অন্ধ হইয়া যা'ক, এরূপ জঘন্য পদ্য আর যেন কল্পনার পবিত্র পৃষ্ঠাগুলি কলঙ্কিত না করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের কবিরা বস্তুর সৌন্দর্য্যের মাতৃভূমি যে কোথায় তাহা তাঁহাদের স্থূলবুদ্ধিক্রমে দেখিতে পান না; সেই জন্যই কবিতার নৈসর্গিক লোকললামতা ক্রমে ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে; সেই জন্যই আজি ভারত অজস্র জঘন্য কবিতাস্রোতে প্লাবিত। মিলটন প্যারাডাইজ লষ্ট কি জন্য লিখিয়াছিলেন, বাল্মীকি রামায়ণ কি জন্য লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে কুন্দ-

নন্দিনীকে কেন আনিয়াছেন, যদি কেহ একবার বুঝিবার জন্য ঐ সকল গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া ধীরমনে পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারেন তাঁহাদের হৃদয়ের আশা কতদূর গভীর, কত উচ্চ ও কত মহৎ।

আমরা আগামীবারে সাহিত্য দর্পণকারের সহিত মিলের মতের সমালোচনা করিয়া কবিতার প্রকৃতিও উদ্দেশ্য বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

আর্য্যচিকিৎসা।

(৮ পৃষ্ঠার পর)

[চিকিৎসার উদ্দেশ্য]

দেহে রোগ উৎপন্ন হইলে, সময়ে ২ রোগীকে যে প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই উত্তম রূপে অবগত আছেন। সেই যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বাস্তবিক চিকিৎসা দ্বারা রোগকালীন যাতনাদি অতি সত্বর সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার প্রথা না থাকিলে কেহই সহজে রোগযাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না!

অনেক সময় নৈসর্গিক নিয়মের গুণে কাহার ২ রোগ যন্ত্রণা বিনা চিকিৎসাতে ও ক্রমে ২ নিবারণ হইতে দেখা যায়। করুণাময় পরমেশ্বর জীবদেহ এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, রোগকালে ধীর ভাবে নিয়মিতাচারী থাকিলে রোগের প্রকোপ স্বতঃই হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু লোকে সচরাচর রুগ্নাবস্থায় অস্থির হইয়া উঠে। সুতরাং ইচ্ছামত কুপথ্য সেবন করিয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইতে পারে। রোগ কালে রীতিমত চিকিৎসা হইলে এরূপ কোন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে পায় না।

[রোগের ভোগ কাল কথন]

প্রত্যেক রোগের এক একটী ভোগকাল আছে। রোগের যত দিন ভোগ হইবে, চিকিৎসা দ্বারা কদাচিৎ তাহার লঙ্ঘন হয়। দেহের সহিত বার তিথি ও নক্ষত্রের এরূপ এক আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে, যে কোন বিশেষ বার, তিথি বা নক্ষত্রে দেহে রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহার ভোগ কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা দূরীকৃত হয় না। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে কৃত্তিকা নক্ষত্রে রোগ হইলে নবরাত্রি, রোহিণীতে হইলে ত্রিরাত্রি, মৃগশিরায় হইলে পঞ্চরাত্রি, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে হইলে সপ্তরাত্রি, অশ্লেষায় হইলে নবরাত্রি, চিত্রায় হইলে অর্দ্ধমাস, স্বাতীতে হইলে দুই মাস, বিশাখাতে হইলে ২০দিন, অনুরাধায় হইলে ১০ দিন, পূর্ব্বফল্গুণীতে হইলে ২ মাস, উত্তর ফাল্গুণীতে ১০ দিন, হস্তায় হইলে ৭ দিন, জ্যেষ্ঠায় হইলে ১৫ দিন, পূর্ব্বাষাঢ়ায় হইলে তিনপক্ষ, উত্তরাষাঢ়ায় হইলে ২৯ দিন, শ্রবণায় হইলে ২ মাস, ধনিষ্ঠায় হইলে ১৫ দিন, শতভিষায় হইলে ১০ দিন, মঘায় হইলে ২০ দিন, পূর্ব্বাভাদ্রপদে হইলে ২৯ দিন, উত্তরভাদ্রপদে হইলে তিন পক্ষ, রেবতীতে হইলে ১০ দিন, ও অশ্বিনীতে হইলে ২৪ ঘণ্টা তাহার ভোগ হইয়া থাকে। আর্দ্রা, মূলা ও ভরণী, এই কয়েকটী নক্ষত্রে হইলে দেহের নাশ হয়।

অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, ও পূর্ব্ব ভদ্রাপদ এই সকল নক্ষত্রে; শনি, রবি, ও মঙ্গলবারে; এবং চতুর্থী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও ষষ্ঠী এই সকল তিথি সংযোগে; এবং সোমবারে পঞ্চমী, বৃহস্পতিবারে দ্বিতীয়া, ও শুক্রবারে চতুর্থী, এই রূপ তিথিবার যোগে যদি রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও দেহের বিনাশ হয়।

সাধারণতঃ বার দোষে রোগ হইলে সপ্তাহ কাল, তিথিদোষে হইলে তিনপক্ষ, তিথি ও নক্ষত্র যোগে হইলে এক মাস তাহার ভোগ হয়। তিথি, নক্ষত্র ও বার যোগে হইলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। কিছুতেই তাহা রক্ষা পায় না। কিন্তু রোগোৎপত্তি কালে চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে থাকিলে তিথি, নক্ষত্র ও বার দোষ দ্বারা কোন প্রকার অশুভ সংঘটন হইতে পারে না। ইহা আমরা বহুতর স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

বায়ু, পিত্ত, কফ।

বায়ু, পিত্ত, কফ সমস্ত রোগের মূল এবং সুস্থতারও কারণ। অর্থাৎ ইহারা অবিকৃত ভাবে থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে নানা বিধ রোগ উৎপন্ন হয়, এবং অনেক সময় মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন হইতে পারে। সুশ্রুত বলেন, যেমন চন্দ্র স্বীয় সুশীতল কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে রসাভিষিক্ত করেন, সূর্য্য শোষণ শক্তি দ্বারা জগতের রস শুষ্ক করেন, এবং বায়ু এই উভয়গুণ সঞ্চালন করতঃ ভূমণ্ডলকে রক্ষা করেন, সেই রূপ কফ, পিত্ত, বায়ু জীবদেহকে যথাক্রমে শুষ্ক ও সঞ্চালন করত পালন করিতেছে। ইহারা যখন কুপিত হয়, তখন বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

বায়ুর আশ্রয়স্থান কটিদেশ ও মলাশয়। ইহা রজোগুণাত্মক, অতি সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতল, লঘু, সচল এবং খর। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রাণীগণের প্রাণরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং কফ ও পিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কারণ ইহার প্রকোপে কফ, পিত্ত নষ্ট হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। এবং যাহার শরীরে ইহা কোন প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, সে ব্যক্তি আজীবন নীরোগী হইয়া পরম সুখে নিরূপিত আয় ভোগ করিতে পারে।

কফ পিত্তের গতিশক্তি নাই। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া, ইহারা দেহের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকে;

অতিরিক্ত ব্যয়াম, অধ্যয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, পতন, ধারণ, রাত্রিজাগরণ, মনোহরণ, ভারবহন, অভিঘাত, উপবাস, বাত মল মূত্র শুক্র বমন উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগধারণ, স্বপ্নদোষ, অতিশয় শোক, ভয়, হর্ষ বা ক্ষোভ, এবং কটু কষায় তিক্ত রুক্ষ অথবা লঘু দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি কারণে বায়ু কুপিত হয়। শিশির ও বর্ষাকালে দিবসের শেষ ভাগে, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকান্তেও বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

বায়ু কুপিত হইলে হিক্কা, আধ্মান, চর্ম্মের বিদীর্ণভাব, কোষবেদনা, নিদ্রাহীনতা, কর্ণনাদ, আনাহ (মল মূত্র বিবদ্ধতা), ভ্রান্তি, ভ্রম, বিসূচিকা,

ভ্রমবোধ, রে মহষ, মস্তকাক্ষেপ, কম্পন, জৃম্ভণ, মুখশোষ, স্বরভঙ্গ, গুল্ম, মন্দাগ্নি, শরীরের রুক্ষতা, মনের কাঠিন্য, দৃষ্টি ভ্রম, বক্ষঃজ্বালা, মনোমোহ, পক্ষাঘাত, বিষণ্ণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়।

নাম, স্থান ও ক্রিয়া ভেদে এই এক বায়ু পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণ বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা দ্বারা দেহ রক্ষা বলবৃদ্ধি ও ভুক্ত দ্রব্য জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অপান বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব শোণিত যথাকালে অধোদেশে নীত হয়। সমান বায়ু নাভিস্থলে অবস্থিত থাকিয়া আমাশয়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে। ইহা জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, এবং রস রক্ত ও মলাদিকে পৃথক্ করিয়া দেয়। উদান বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে সঞ্চরণ করে। ইহা দ্বারা বাক্য ও গীতাদি নিঃসৃত হয়। ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত আছে। ইহা দ্বারা আহার জনিত রস শরীরে প্রবাহিত হয়। এবং ঘর্ম্ম নিবারণ ও রক্ত স্রাব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই পাঁচটী বায়ু ব্যতীত অনেকে আরো পাঁচটী বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই বায়ু পাঁচটীর নাম; নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ও ধনঞ্জয়। উদ্গারে নাগ বায়ু. চক্ষু উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে, (হাঁচিতে) কৃকর, জৃম্ভনে দেবদত্ত, এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয় বায়ু আধিপত্য করিয়া থাকে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও এই ধনঞ্জয় দেহ পরিত্যাগ করে না। দেহীগণের জীবনরূপী হইয়া এই বায়ু সমস্ত নাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতেছে।

প্রধান ২ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন, উল্লিখিত এই দশটী বায়ুর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রাণ বায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। এই প্রাণ বায়ু শরীরস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত। কুণ্ডলী শক্তি বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িৎময় পদার্থ ব্যতীত আর কিছু নহে। ঐ শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বাহ্যেন্দ্রিয়ের, কি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বায়ুর সাহায্য ব্যতীত দেহ যন্ত্র এক মূহুর্ত্ত ও সুস্থির থাকিতে পারে না।

বায়ুর গতি অতি বিচিত্র, কার্য্যও অতীব বিস্ময়কর। বায়ুর স্বভাব

সুচারুরূপে বুঝিতে পারে, এমন লোক ভূমণ্ডলে বিরল।

মনুষ্যদিগের মৃত্যুকালে যে নাভিশ্বাস হয়, তাহা এই বায়ুরই কার্য্য। প্রাণ বায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। অপান বায়ু যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত কেবল অধোভাগে গমনাগমন করে। এই দুই বায়ু পরস্পরকে আকর্ষণ করায়, জীবাত্মা দেহ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। রজ্জু বদ্ধ পক্ষী যেমন উড্ডীন হইলেও পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে, প্রাণ বায়ু সেই রূপ নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়াও, অপান কর্ত্তৃক আকর্ষিত হওতঃ দেহ মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া যখন নাভিগ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক গমন করে, তখনই নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়।

বায়ুর অপর কয়েকটী পর্য্যায় শব্দ আছে। যথা বাত, অনিল, পবন, মারুত, সমীরণ ইত্যাদি।

পিত্ত,—সত্ত্বগুণযুক্ত, তীক্ষ্ণগুণ, তিক্ত, কটু, নীল অথবা পীতবর্ণ বিশিষ্ট এবং তরল। পিত্তের স্থান যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্, এবং পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থল।

ক্রোধ, শোক, চিন্তা, উপবাস, অগ্নিদাহ, মৈথুন- কটু অম্ল, উষ্ণ তীক্ষ্ণ ও ভর্জ্জিভর্ত দ্রব্য ভোজন, সুরাপান, ও রৌদ্র সেবন এই সকল কারণে পিত্তের প্রকোপ হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অন্ন পরিপাক সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে এবং মধ্যাহ্নকালেও ইহা প্রকুপিত হইয়া থাকে। পিত্ত কুপিত হইলে, ভেদ, বমনেচ্ছা, তিক্ত ও অম্লরসোদ্গার, অল্প নিদ্রা; গাত্র, চক্ষু মল ও মূত্র পীতবর্ণ, জ্বালা, ঘর্ম্মাধিক্য, পিপাসা বাহুল্য, ধূমোদ্গার (চোঁয়াঢেকুর তোলা) কণ্ঠ ওষ্ঠ, মুখ নেত্র নাসিকা দগ্ধপ্রায়, অন্তর্দাহ, গাত্র ঘূর্ণায়মান, চক্ষুব্রণ, (চক্ষু উঠা), গুহ্যব্রণ (ভগন্দর রোগ বিশেষ), মূর্চ্ছা এবং মুখ তিক্ত রস যুক্ত হয়।

দর্শন শক্তি, পরিপাক শক্তি, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের কোমলতা, কান্তি, প্রসন্নতা ও অভ্যাস শক্তি, এই গুলি পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিত্তের পর্য্যায় শব্দ, উষ্মা, তেজঃ, অগ্নি ইত্যাদি।

কফ—তমোগুণাত্মক, গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। ইহা দ্বারা ভুক্তদ্রব্য ক্লেদযুক্ত হয়, দেহের সন্ধিস্থল সমূহ আর্দ্র থাকে, রসনায়

রসবোধ জন্মে, এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্যের আনুকূল্য হয়। কফের স্থান বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠদেশ, সন্ধিস্থান এবং আমাশয়।

দিবানিদ্রা, আলস্য, মধুর অম্ল শীতল গুরু ও পিচ্ছিল দ্রবদ্রব্য ভোজন ও অতিরিক্ত আহার ইত্যাদি কারণ বশতঃ; এবং শীত ও বসন্তকালে, দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, ও আহার করিবা মাত্র কফ প্রকুপিত হয়। কফ কুপিত হইলে নাড়ীর বেগ অল্প, লালাবমন, বক্ষভার, মুখ দন্তাদিতে মলবাহুল্য, সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, অরুচি, নিদ্রাবাহুল্য, শরীরে ভারবোধ, কাসি, চক্ষু মল মূত্র শ্বেতবর্ণ, গাত্রকুণ্ড এবং অনাহার সত্ত্বেও গুরুতর আহার করা গিয়াছে, এই রূপ বোধ হয়।

কফের পর্য্যায় শব্দ শ্লেষ্ম, বলাদ ও বলী ইত্যাদি।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই রূপ বায়, পিত্ত ও কফের গুণ, স্থান ও ক্রিয়াদির যথেষ্ট বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত অবস্থা ও পরস্পরের গূঢ় সম্বন্ধ অনেক সময় স্পষ্ট বুঝা যায় না। রোগ পরীক্ষা কালে চিকিৎসকের এতৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

ফটিক জল।

শূন্য'পরে শুষ্ককণ্ঠ ক্ষুদ্রতম পাখী
তৃষ্ণায় ফাটিছে ছাতি তার,
কাতরে ডাকিল অনিবার।
কে বাঁচাবে দিয়ে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু সলিলের কণা!
পোড়া মেঘ শুনেও শুনে না।
মধ্যাহ্ন কিরণ চারিদিকে

বাজে যেন বিষময় শলা ;
উপরে তপন খরধার
চাহিতে নয়নে করে জ্বালা।
বিষম বেঘোরে পাখী একলা পড়িয়া
কেঁদে বলে—"দে ফটিক জল"
নির্দ্দয় জলদ বড় খল !
দারুণ পিয়াসে কণ্ঠ শুকাইয়া যায়
ধড়ফড় করে তার প্রাণ
ভাবে বুঝি দেহ অবসান।
চাতক ভাবিয়া নাহি পায়
কিসে তার জুড়ায় পরাণ,
ছড়া'য়ে অলস পাখা দুটি
আরো শূন্যে করিল প্রয়াণ;
"দে ফটিক জল" বলে উঁচুপানে চেয়ে
ডাকে পাখি চীৎকার ছাড়িয়া।
দুষ্ট মেঘ উঠিল গর্জ্জিয়া !
তবু ও থামেনা পাখী যদি' ক্ষুদ্র প্রাণ
সেই বুলি—সেই সে কেবল
ঊর্দ্ধমুখে—"দে ফটিক জল।"

"হায় কেন হইনি চাতক"
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া,
"কেন মোর হয়নি ও বুলি
ডাকিতাম হৃদয় ভরিয়া।
পিপাসায় ফাটে কণ্ঠ চাতকের মত
দহে অঙ্গ খর রবি-করে
কাল মেঘ অমনি উপরে।
রোগ শোক জরা মাঝে একলা পড়িয়া

কোন খানে কেহ নাহি আর,
নিরদয় ভীষণ সংসার!
আন্ চান্ করে সদা প্রাণ
অমৃত আছে ও শুনি বটে,
কিন্তু এযে কিবা পোড়া মুখ
নাহি জানি কেন নাহি ফোটে।
কি ব'লে ডাকিতে হয় অমৃত-নিদানে
জনম অবধি শিখি নাই,
চাতক হইতে তাই চাই।
পেলেও শতেক বাধা ওরি মত যেন
নাহি ছাড়ে হৃদয়ের বল,
নাহি ছাড়ে "দে ফটিক জল।"
চাতকের যন্ত্রণাটি দিয়ে
গড়িয়াছ ছার প্রাণ যদি
চাতকের বুলিটিও কেন
তবে মোরে দাওনি, হে বিধি!
সখা হে, নিশ্বাস ছাড়ি তাই কবি কাঁদে
দাও প্রাণে বল,
দাও চাতকের বুলি "দে ফটিক জল।"

টাকা হয় কিসে।

বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিতে পাইবে, সকলেই টাকার ফিকিরে ফিরিতেছে,—আবাল বৃদ্ধ বনিতা কিসে টাকা হয় কেবল তাহারই ফন্দি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যেকেই আপন আপন লইয়া ব্যস্ত, কেহই ভাবিয়া দেখেন না যে, এত লোক—এই জন-

সমাজের মধ্যে তিনি একজন, সুতরাং তাঁহার ভাল মন্দের উপর এই জনসমাজের ভাল মন্দ নির্ভর করে। সুধু তাহাই নহে, জনসমাজের তিনি যখন একজন, তখন জনসমাজের সুখ দুঃখের জন্য তিনি কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী; সুতরাং জনসমাজের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মাত্র নিজের স্বার্থানুসন্ধায়ী হইলে তাঁহাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। কেবল নিজে টাকা২ করিলে হইবে না, তিনি জনসমাজের একজন বলিয়া জনসমাজের অর্থ বৃদ্ধি বিষয়ে—জাতীয় ধনাগমের উপায় নির্দ্ধারণে সামাজিক নিয়মে বাধ্য, সে নিয়ম ভঙ্গে দোষ স্পর্শে—পাপ হয়। অতএব এই টাকা হয় কিসে, জাতীয় অর্থ বৃদ্ধি হয় কি উপায়ে একথা সকল লোকেরই এক একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসন্তানেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন মহান্ ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, বৈষয়িক বিষয়ে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভিনয়ের অংশ টুকু ভিন্ন অধিক উর্দ্ধে তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে চায় না। কিন্তু, পৃথিবীতে থাকিতে হইলে, পার্থিব বিষয় ভাবিতে হইলে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ঐ সকল বিষয়ে এত উদাসীন হইলে চলিবে না। কৌপীনধারী হিন্দু সন্তান বেদীর উপর বসিয়া চক্ষু মুদিয়া পরমার্থ তত্ত্ব চিন্তা করিতেছেন, মধ্যে ২ সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সংসারে ঔদাসীন্য শিক্ষা দিতেছেন, লোকে বলিল তিনি জীবের পরিত্রাতা, কিন্তু যিনিই হউন, তিনি সমাজের ঘোরতর শত্রু।

মহারাণী এম্প্রেসের মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া যে রূপার চাক্তি টাকশাল হইতে বাহির হইয়া আইসে, তাহা যদি বিনিময়ের সাহায্য না করিত অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত ধন যাহা তাহা যদি না কেনা যাইত, তাহা হইলে টাকার কিছুই মূল্য থাকিত না। প্রকৃত ধন কি ?—যাহা পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত হইয়া লোকের উপকারে বা ভোগে আইসে। একটি জাতির প্রত্যেক লোক পরিশ্রম করিয়া তাহার সাধ্যায়ত্ত এমন একটি জিনিষ জনসাধারণকে দিবে যাহা তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিয়া যোগাইবে। জাতি সাধারণের যেন একটি ভাণ্ডার আছে; সকলেই নিজের ২ পরিশ্রমোৎপন্ন বস্তু তাহাতে দিতেছে এবং তাহা যে পরিমাণে লোক সাধারণের উপকারে আসিতেছে সেই পরিমাণে সেই ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিতেছে। মুচি

জুতা প্রস্তুত করিল, জুতার বদলে তাহার একখানি আবশ্যকীয় অস্ত্র পাইল। এইখানে দেনা পাওনার সুবিধার জন্য টাকার দরকার হয়, বিনিময় সাহায্য এইখানে প্রয়োজন। মুচি জুতা বেচিল, টাকা পাইল; তারপর টাকা দিয়া মনোমত অস্ত্র কিনিল। সুবিধা উভয়ের। তাই বলিতেছি, টাকার মূল্য বিনিময়ে—ধন বিনিময়ে টাকার প্রয়োজন। এই টাকা হয় কিসে, দেশের ধন বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ কি আমরা যতদূর বুঝিয়াছি সহজ কথায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে কর, যে দেশ এক কালে বৃহৎ বনে ঢাকা ছিল, বাঘ ভালুকের বাস ছিল; কিম্বা বালুকাময় মরুভূমি ছিল, সে স্থানে আজ সুখ স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্য্য ও আবশ্যকীয় বস্তু নিচয় পরিপূর্ণ মহানগর সকল জন্মিল কোথা হইতে? জাতীয় ধন ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ যে প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠতা নহে—উর্ব্বর ভূমি, অনুকূল জলবায়ু, খনিজপদার্থের বহুলতা প্রভৃতি কারণ সত্ত্বেও যে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। এমন শত শত দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে স্বভাবের এইরূপ স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সেই সকল দেশ পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে ইংলণ্ডের দুর্দ্দশা দেখিলে শৃগাল কুকুরেও কাঁদিত, আজি সেই ইংলণ্ড পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা সম্পন্ন কেন? কেহ কেহ বলেন যে, ইংলণ্ডের জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা ও ভূমির উর্ব্বরতা অনেকাংশে তাহার ধন বৃদ্ধির কারণ; আবার একথাও অনেকে বলেন যে, ইংলণ্ডের খনিজাত দ্রব্যের বহুলতাই তাহার জাতীয় ধনের প্রধান সহায়। এ সকল কথা যে কোনও কাজের নহে তাহা বোধ হয় দেখাইতে হইবে না। ইংলণ্ড যে এই দুই বিষয়েই অধিকাংশ জাতি অপেক্ষা হীনাবস্থ তাহা সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কিছুতে ইংলণ্ডকে বড় করিয়া থাকে তো তাহা ইংরাজদিগের স্বাভাবিক গুণ। কেহ না মনে করেন যে, ইংরাজ দিগের নৈতিকগুণ (Moral Character) বড় বেশী; আমরা এ কথা বলি না যে, ইংরাজ ধীর, ধার্ম্মিক, পরিশ্রমী এবং সঞ্চয়ী বলিয়া বিশেষ প্রতিপন্ন। সে বিষয়ে তো সম্পূর্ণ সন্দেহই রহিয়াছে। এ সকল গুণ যদি কেহ স্পর্দ্ধা করিতে পারে তো সে ভারতবর্ষীয় হিন্দুসন্তান। এ সকল গুণে দিয ধন

বৃদ্ধি হইত তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষ মহারাজাধিরাজ রাজ চক্রবর্ত্তী হইত আর ইংলণ্ড পথের কাঙাল হইয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজি দেখ, ভারতবর্ষের স্কন্ধে ভিক্ষাপাত্র, কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।

সকল বিষয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখা যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ইংরাজ যে গুণ প্রসাদে এই সম্পদে অধিকারী হইয়াছে, তাহার যদি সেই গুণ বরাবর বর্ত্তমান থাকে তবে ইংরাজ পৃথিবীর সকল জাতিকে চিরকাল অধঃস্তলে রাখিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের কৃষকেরা মার্কিনদের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতে পারে, ইংলণ্ডীয় বণিকেরা ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের বণিকদের মত উত্তম ও সস্তা জিনিষ প্রস্তুত করিতে না পারিতে পারে ; কিন্তু তবু ইংরাজ যাহা আছে তাহা থাকিলে ইংরাজের সহিত কেহ পারিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইব এই প্রতিজ্ঞা থাকায়, যাহা প্রকৃত ধন তাহা দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত থাকিবার ইচ্ছা থাকাতেই ইংরাজ সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। সমবস্থাপন্ন দুইটি জাতি গ্রহণ করিয়া দেখ, দুই জাতিরই ভূমি, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক অনুকূলতা সমান হউক—দেখিবে, যে জাতির ধনবৃদ্ধির ইচ্ছাপ্রবণতা সেই জাতিই অধিক অর্থ সঞ্চয়ে কৃতকার্য্য।

আর এক কথা। নাগরিক জীবন এত সুখ সাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ কেন ?—ধন পরিবেষ্টিত বলিয়া। মফঃস্বলের অসচ্ছন্দতা, অসুখ সমস্ত নগরে নাই। যে মুহূর্ত্ত মধ্যে কোন ভাল জিনিষ জন্মিল তখনি তাহা নগরে চালান আসিল। আসিল কি জন্য ? এই জন্য যে, নাগরিক লোক ভাল জিনিষের আদর জানে, সাচ্ছন্দ্য সুখ কিনিতে জানে। এইরূপে দেখা যায় যে, কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য নিচয় যেখানে জন্মায় সেখানকার লোকের সঙ্কুলান হইয়া যখন অন্য লোকের সংস্থান করিতে পারে, তখন যে পরিমাণে সেই সংস্থিত বস্তুর আদর হয় সেই পরিমাণে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়। লোকেরা যে পরিমাণে নাগরিক জীবনের সাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারে তাহার জন্য সেই পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার করে এবং সেই পরিশ্রম হইতেই ধনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। নগরে কিছু কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সেখানে এত

ধনী ও বড় লোক হয় কোথা হইতে? সেখানে সকলেই নাগরিক জীবনের জন্য. সভ্যতার জন্য, সুখ সাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি পাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে, আর সে জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া যেন জাতিসাধারণের ভাণ্ডার হইতে নিজের শ্রমজাত দ্রব্যের উপকারিতার উপযুক্ত সুখ সাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি লইতে হয়। এই জন্য সকলেই আপনাকে অন্যের অতি আবশ্যকীয় করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, এবং তাহার সে বিষয়ে কৃতকার্য্যতা আপনার পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাপ্তির পরিমাণের দ্বারা পরিমিত হয়। এই রূপ সমাজে জীবনের আদর্শ যত ভাল হইবে, ধনবৃদ্ধি ও তত অধিক হইবে, আর নূতন অভাব যত অধিক সৃষ্ট হইয়া পরিপূরিত হইবে ততই লোকের টাকা হইতে থাকিবে। এই রূপে চলিলে একটি সমাজের ধন বৃদ্ধির ইয়ত্তা থাকে না যে পর্য্যন্ত একের পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য অন্যে বসিয়া ধ্বংস না করে। আমাদিগের একান্নবর্ত্তী পরিবার এই জন্য সর্ব্বনাশের মূল, জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইবার একটি প্রধান অন্তরায়।

ক্রমশঃ।

পাগলের প্রলাপ।

পাগলের সংসার।

হরি হরি হরি! পাগলের আবার সংসার কি? আচ্ছা। জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি? লোকে সংসারী হয় কেন? যে মহাপুরুষ ঈশ্বরকে মনুষ্যাকৃতি সদৃশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষই আবার সেই ঈশ্বরকে একাকী রাখেন নাই, তিনিও অনেক স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারা পরিবৃত। হিন্দুধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দাও, সে ধর্ম্মমতে তিনশত তেত্রিশ কোটী দেবতা, তাঁহারা সকলেই সংসারী. অনেকেই আবার স্ত্রী, পুত্র,

কন্যা আছে,—সকলেরই মান অপমানের ভয় আছে, মনুষ্যের ন্যায় সংসারের সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা আছে, কিন্তু যে সকল ধর্ম্ম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অদ্বৈতবাদিত্ব ঘোষণা করিতেছে, সে ধর্ম্মও বলে যে, ঈশ্বর এক হইলে ও তিনি একাকী থাকেন না। প্রভো! তুমি একই হও আর তেত্রিশকোটী হও মনুষ্য জোর করিয়া তোমায় সংসারী করিতে চায়। সংসার মনুষ্যের এত প্রিয় যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকেও সংসারী না করিয়া মনুষ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সংসার মনুষ্যের এত প্রিয় কেন প্রভো! তাহা আমার পাগল মনকে বুঝাইয়া দাও। নিরন্তর সংসারের বিষের জ্বালায় দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা নির্জ্জন বনে গিয়া বাস করা কি সুখকর নয়? আমিও অনেক দিন সংসারে ছিলাম। সংসারে থাকিয়া যাহা জানিয়াছি আজ মন খুলিয়া সকলকে বলিব, আমার এই পাগলের সংসারের বিষয় কেহ শুনিবে কি?

বাঙ্গালি যে সংসার প্রলোভনে পড়িয়া সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত, জিজ্ঞাসা করি সেই সংসার সুখের না দুঃখের? এ মোহময় সংসারের মায়া কে বুঝিবে? এক দিকে দেখ পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, পুত্র কন্যার ভক্তি, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা,—সকলই প্রণারাম প্রীতিপ্রদ, নয়নানন্দদায়ক। এ পাগল মনও একদিন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন সংসারে থাকিয়াই সে মোহ টুটিল কেন? কেন? বোম্ ভোলানাথ! এ আবার কি দৃশ্য! পিতা মাতা চিরস্থায়ী নয় কেন? তাঁহাদের মৃত্যু শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে হয় কেন? পত্নীর প্রণয়ে নৈরাশ্য কেন? পুত্র কন্যা অবাধ্য কেন? আত্মীয় স্বজন বিপক্ষতাচারণ করেন কেন? জনক, জননী, পুত্র কন্যা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সকলেই কিছু না কিছুর প্রত্যাশী কেন? দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের সকলের আশা পূরণ করিতে না পারিলে সে স্নেহ, প্রণয়, ভালবাসা, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা কিছুই থাকে না কেন? ফল কথা সংসারে এত অর্থের প্রয়োজন কেন? আবার সে অর্থ উপার্জ্জনের পথ সুগম নয় কেন? এ পাগলের চক্ষে এ সংসার দুঃখময়। কেহ কেহ বলেন, এ সংসারসাগরে সুখ দুঃখ উভয় স্রোতই বহিতেছে; কেহ সুখের স্রোতে পড়িয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে

চলিয়াছে, কেহ বা দুঃখের স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। গঙ্গা যমুনার মিলনের ন্যায় এ সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয় মিশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সংসারী হইয়া কখন ও দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশ মাত্র ও উপভোগ করি নাই।

অর্থাভাবে সংসার জ্বালায় হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইয়া একবার ধনীর সংসার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বোম্ ভোলানাথ! এ আবার কি? যে অর্থের অভাবে এত কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই অর্থ এখানে এত অনর্থের মূল কেন? সেই অর্থ লইয়া এত কলহ এত বিবাদ কেন? ইহার জন্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠকে সহজে প্রতারণা করিতে না পারিলে স্নেহ ভালবাসা ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণসম কনিষ্ঠভ্রাতার জীবন নষ্ট করিতে ও প্রস্তুত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মাত্র গৃহিনীর অনুরোধে—পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত বিবাদ করিতে ও কুণ্ঠিত নয়। দীনবন্ধো! নির্ধনীর সন্তান হইয়া ইহা অপেক্ষা যে হাড়ে হাড়ে দগ্ধানি ভাল। দূর হউক, পরের বিষয় লইয়া বকিলে কি হইবে? পাগলের সংসারের বিষয় বলিতে বসিয়াছি, যাহা জানি বলিব।

প্রভো! কোন ধাতুতে এই বাঙ্গালির স্ত্রীলোক গড়িয়াছিলে? যদি ওরূপ ধাতুতে গঠিলে তবে সংসারের মধ্যে আনিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিলে কেন? সৃষ্টিকৌশল দেখাইবার জন্যে যদি সৃজন করিয়া থাকেন তবে বন্য হিংস্র জন্তুদিগের মধ্যে রাখিলে ও সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিত। অপদার্থ, ঘৃন্য, নির্জীব বাঙ্গালার পুরুষগণকে যন্ত্রণা দিবার জন্যে যদি ইহাদের সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভো! আমার একটি নিবেদন আছে, বাঙ্গালি জীবন দিবারাত্র যে সহস্র সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাতে কি তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই? তোমার সে অনন্ত জ্ঞানের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? অনুমানে বোধ হয়—যে জাতি দুইজন একত্রে কলহ না করিয়া থাকিতে পারে না কেন তাহাদিগকে স্বজাতিপ্রিয় হিংস্রজন্তুদিগের মধ্যে রাখিয়া সে স্বজাতিপ্রিয়তার শ্রাদ্ধ করিবেন? হরি হরি এ কি? হিংস্র জন্তু অপেক্ষা ও যাহারা অধম তাহাদের না হইলে আবার সংসার চলেনা! প্রভো! আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দাও, আমি একবার দিব্য চক্ষে দেখি এ তোমার কোন্ রহস্য।

আর এক রহস্য আছে, ইহাদের মধ্যে আবার দুই একটি দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাই কেন? এ সকল রহস্য আমার পাগল মনকে কে বুঝাইয়া দিবে?

এ সংসার সাগরে প্রতি দিন যে কত তরঙ্গ উঠে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? আজ কিনা কন্যাদায়, কাল কিনা পিতৃমাতৃদায়; যদি অনেক কষ্টে কোন রকমে আপনার দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে, তবে অন্যের দায় আসিয়া তোমার ঘাড়ে পড়িতে লাগিল, সে দায়েও তুমি সাহায্য না করিলে তোমার মান থাকিবে না। সুতরাং চতুর মাজি না হইলে এ সকল তরঙ্গের চোটে তোমার সম্ভ্রম তরী রক্ষা হওয়া দায়। এই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া সংসারে আমার বৈরাগ্য—হৃদয়কে শ্মশান করিয়া আমি সেই জন্যে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়াছি, আজ সেই জন্যেই আমি পাগল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভয়ানক চিতা জ্বলিতেছে, সেই চিতায় স্নেহ, ভালবাসা, প্রণয় একে ২ ভস্ম হইতেছে। আমার সংসার ব্রত উদ্যাপন হইয়া গিয়াছে, তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল ভাই।

এ হৃদয় দেখাইবার নয়। মনে বড় আক্ষেপ রহিল, তাহা না হইলে শত সহস্র বজ্রাঘাতের চিহ্ন আমার হৃদয়ে দেখিতে পাইতে। দ্বেষ, হিংসা প্রতিযোগিতা, বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ঙ্কর অত্যাচার যদি কেহ দেখিতে চাও, আমার এ পাগলের সংসারে প্রবেশ করিলে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

যখন ভাবিয়া দেখি এ সংসারে আসিয়া কি করিলাম, তখন গায়ের রক্ত শুখাইয়া যায়, প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, চক্ষু দিয়া কি জানি কেন অবিরত অশ্রু নির্গত হয়, এক ভয়ঙ্কর দিনের কথা মনে জাগিয়া উঠে। প্রভো! কি জন্যে এ সংসারে সং সাজিতে পাঠাইয়াছ তাহা তুমিই জান, কিন্তু আর কেন? এ বুড়ো বয়সে যে আর নাচিয়া বেড়াইতে পারি না। তোমার চরণ প্রান্তে কি অধমের স্থান হইবে না? তোমারা সকলে একবার হরি হরি বল, আমি পাগল লীলা শেষ করিয়া চলিয়া যাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দক্ষ যজ্ঞম্। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীতম্। বাঙ্গালা পাঠক মাত্রেই তর্করত্ন মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নাম পরিশ্রুত আছেন, বাঙ্গালা ভাষার সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যতদিন বাঙ্গালায় নাটক থাকিবে ততদিন তাঁহার নামের কিছুই লোপ হইবে না। কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালার প্রথম নাটক, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন তাহার প্রণেতা।' তার পর, বাঙ্গালায় আরো অনেক নাটকাদি লিখিয়াছেন. সে সমস্ত কথা আমরা বলিতে চাহিনা। সংস্কৃত ভাষার উপরও যে তাঁহার এতাদৃশী ক্ষমতা তাহা দেখিয়াই আমরা মোহিত হইয়াছি। হইতে পারে সে রচনায় অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু আর্য্যসন্তান আর্য্যভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন ইহার অপেক্ষায় আনন্দ কি আছে? কাব্যখানির ইহা পূর্ব্বার্দ্ধ; পূর্ব্বার্দ্ধ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গটি আমরা দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি; পাঠ করিতে করিতে অনেক সময়ে আমাদিগের ভ্রম হইয়াছে যেন আমরা কোনও প্রাচীন কবির কাব্য পড়িতেছি। ইহার বর্ষা বর্ণনও মন্দ হয় নাই। অচিরাৎ উত্তরার্দ্ধ প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

Bengal Miscellany; মাসিক পত্র। আমরা ইহার পাঁচ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি; প্রবন্ধগুলি ইংরাজি ও বাঙ্গালায় লিখিত। ইংরাজি অপেক্ষা আমরা বাঙ্গালার পক্ষপাতী,—মাতৃভাষার পক্ষপাতী নয় কে? সেই জন্যই বোধ হয় ইহা আমাদিগের তত মনোজ্ঞ হইল না। প্রবন্ধগুলির আবশ্যকতা বিবেচনায় ভাষান্তরে লিখিত হইলে বুঝি ভাল হইত। "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন" বা "উন্মত্ত হৃদয়" ইংরাজিতে লিখিয়া যদি তাহার স্থানে 'Lingua Franca of India,' বা 'Indians what do you want?" প্রভৃতি বাঙ্গালায় লিখিত হইত তাহা হইলে বোধ হয় লেখকের উদারতার ও প্রবন্ধের আবশ্যকতার আমরা অনেক পরিচয় পাইতাম। অলঙ্কার অপেক্ষা লেখার সারবত্তা অধিক প্রার্থনীয়; প্রবন্ধগুলি যাহাতে আরো

সারগর্ভ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয় ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

যামিনী প্রভাত। এখানি প্রায় দুই বৎসরের গ্রন্থ, ইহা সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। অথবা বলিবার যাহা ছিল, প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থারম্ভে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তাহা এই—"এইগ্রন্থে মহাবীর মহারাষ্ট্র-অধিপতি শিবজীর জীবনের দুই দিবসের ঘটনা মাত্র লিখিত হইল। ঘটনা সত্য নহে,"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রকাশকের—"উপসংহারে বক্তব্য যে, এই ক্ষুদ্র কাব্য একটি সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের রচিত; মন্দ হইলেও অন্ততঃ বালক বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।" আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম, লেখক এক্ষণে উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন অতএব আজ কাল ক্ষমা করা না করা পাঠকগণের হস্তে। আমাদিগের মতে স্থানে স্থানে ইহার কবিতার স্ফূর্ত্তি আছে, নিতান্ত মন্দ নহে।

মাতৃ স্নেহ। কোন এক বঙ্গ মহিলা বিরচিত। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—মানিলাম, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবে ইহা শাস্ত্রের কথা; কিন্তু স্ত্রীলোক যে দুই একখানি নাটক নবেল পড়িয়াই যাহা হয় দুই এক কলম লিখিবেন ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তবে, উপস্থিত পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ভাল। একটু ভাল করিয়া লিখিতে শিখিয়া এমন ভাল বিষয়ে হাত দিলে বোধ হয় আরো ভাল হইত।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় প্রণীত। সচরাচর এ দেশে যে সমস্ত রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা নিবারণের জন্য অতি সুন্দর মুষ্টিযোগ সকল ব্যবস্থিত হইয়াছে। পুস্তকখানি গৃহী মাত্রেরই রাখা কর্ত্তব্য। ভরসা করি দ্বিতীয় সংস্করণে শরৎ বাবু ইহার কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিবেন। যে সমস্ত ইংরাজি ঔষধ সহজলভ্য অথচ মুষ্টিযোগের ন্যায় কার্য্য করে তাহার ব্যবস্থা দিতে হানি কি?

বঙ্গদর্শন ও কলের কাপড়।

বহুদিন হইতে কলের কাপড় সম্বন্ধে কিছু লিখিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল। মাত্র সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে পত্রিকা পূর্ণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে এ সকল বিষয় লেখা ভাল, লেখা আবশ্যক। আমাদিগের দেশের কথা আমরা বলিব না, অপরে বলিবে; আমাদের জীবনোপায় সম্বন্ধে আমরা কোনও চেষ্টা করিব না, একজন বিদেশীয় আসিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ দিবে; আমাদিগের এই অন্নভাব, অর্থকৃচ্ছ্রতা ও হীনাবস্থার যাহা একটি মূল কারণ তাহার বাহ্য শোভায় এমনি প্রতারিত অথবা শত দৃষ্টান্তের পর তাহার মর্ম্মের কথা জানিয়া ও এমনি উদাসীন যে, সে সম্বন্ধে একটি ও কথা বলিব না—এক কলম ও লিখিব না, বার্ডউড সাহেব তাহা লিখিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিবেন। ইহা কি ভাল? বিদেশীয় হইয়া যে কেহ তোমার জন্য কিছু বলেন তিনি মহাত্মা। কিন্তু তোমার এ নিশ্চেষ্টতা কি ভাল দেখায়—শোভা পায়—কখনও উচিত হয়? ঠিক্ এই জন্যই হউক অথবা অন্য কোন ও কারণে হউক এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু লিখিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল।

লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লেখা হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে বিজ্ঞ বঙ্গদর্শন এ প্রস্তাবটি লিখিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। যাহা লিখিতে আগ্রহ, তাহা লেখা দেখিলে পড়িতে ও আগ্রহ জন্মে; আমরা আগ্রহের সহিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি। এক্ষণে বোধ হয় আমরা না লিখিয়া ভাল করিয়াছিলাম, আমরা না লিখিয়া যে পত্রশ্রেষ্ঠ বঙ্গদর্শন ইহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় আরো ভাল হইয়াছে। তবে আবার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কি জন্য? এই জন্য যে, তাঁহাতে দুই একটি কথা যোগ করিব বলিয়া; বঙ্গদর্শন যে দুই একটি কথা বলেন নাই তাহা বলিব বলিয়া।

বঙ্গদেশ যে বস্ত্রবয়নে বহুকাল হইতে পৃথিবী মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ভাবে আধিপত্য করিয়াছে তাহা বোধ হয় আর কাহাকে ও বলিয়া দিতে হইবে

না। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালার সে অপূর্ব্ব বস্ত্রাদির কথা কে না জানে? বঙ্গদর্শন বলিয়াছেন—"বস্ত্রের বিষয়ে বাঙ্গালা এক সময়ে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিল। ঢাকায় যেরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র বয়ন হইত তদ্রূপ আর কোন দেশে হইত না। পূর্ব্বকালে যখন রোমানেরা অতি সুবেশী হইয়া উঠেন, তখন ঢাকা হইতে তাঁহারা কার্পাস কাপড় লইয়া যাইতেন। * * * এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র অদ্যাপি আর কোন দেশে হয় নাই।"—যথার্থ কথা; কে ইহার প্রতিবাদ করিবে? সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ কর, বড় বড় সভ্য রাজ্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, বাঙ্গালার সহিত কাহার প্রতিযোগিতা সম্ভব? মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু অবশ্য-প্রয়োজনীয়, যাহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না—সেই গ্রসাচ্ছাদনের জন্য বাঙ্গালার কখনও কোন বিষয়ে পরপ্রত্যাশী হইবার আবশ্যকতা ছিলনা,—আবশ্যকতা নাই। কৃষিকর্ম্মে বঙ্গদেশ জগতে অতুলনীয়, বস্ত্রবয়নে ও বাঙ্গালা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন অন্য দেশ হইতে বাঙ্গালায় চাউল আমদানির প্রয়োজন নাই, তেমনি বস্ত্রের জন্য বাঙ্গালাকে অন্য কাহার ও মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্যকতা নাই।

আবশ্যকতা যদি নাই, তবে আবশ্যকতা হইল কেন? অতীতে যাহা ছিল না বর্ত্তমানে তাহা হইল কি জন্য? এ যুগান্তর বিপর্য্যয়ের কারণ কি? কারণ—বাঙ্গালী এক্ষণে সে বাঙ্গালী নাই। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, ইংরাজি লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, ইংরাজের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর নয়; বাঙ্গালী এক্ষণে ইংরাজের। এই জন্যই বাঙ্গালায় এই বিপর্য্যয়; এই কারণেই এই দুর্দ্দশা। দেশের যাঁহারা সর্ব্বস্ব—জাতীয় ধনবৃদ্ধি ও জাতীয় শিল্পোন্নতির যাঁহারা প্রধান কারণ, তাঁহাদিগের হৃদয়ে আর সে ভাব নাই, দেশজাত শিল্পকার্য্য ব্যবহার তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমাজের অপরার্দ্ধ—যাঁহারা জাতীয় উন্নতির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা ও এক্ষণে পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়াছেন। বাবু "অর্দ্ধ-উলঙ্গবেশ" কাপড়পরা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কোটপেণ্টালুন এক্ষণে শ্রী-অঙ্গে শোভা পাইতেছে। গৃহিণীগণ ধানভানা, সুতাকাটা ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইজি চেয়ারে,

বসিয়া ধীরে ধীরে ফাঁসের পর ফাঁস তুলিয়া কার্পেট বুনিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং দেশের দিকে কে দেখে? দেশে কাপড় জন্মিল কি না তাহাতে কাহার ক্ষতি? এখন ও বাঙ্গালায় কাপড় তৈযার হইতেছে, এখন ও বাঙ্গালায় তাঁতি আছে। কিন্তু সে কাপড়ের খরিদ্দার কোথায়? কত দিন অনাহারের পর বহুকষ্টে একখানি কাপড় বুনিয়া তাঁতি হাটে গেল। হতভাগ্য জানিত না যে, ম্যানচেষ্টার তাহারই পার্শ্বে বসিয়া তাহার সহিত বৈরতা সাধিবে। কতক্ষণ পরে দুই একজন ক্রেতা আসিল। অমনি পার্শ্ব হইতে ম্যানচেষ্টার হাঁকিল—"বড় সস্তা! আয খরিদ্দার, সস্তাদরে এমন মাল আর পাবি না।" খরিদ্দার মহল তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঝুঁকিল। তাঁতি দেখিল মুহুর্ত্তমধ্যে ম্যানচেষ্টার এক বস্তা কাপড় বিক্রয় করিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার একখানিও সে পর্য্যন্ত বিকাইল না। সন্ধ্যা আসিল, হাট ভাঙ্গিল। হতভাগ্য তাঁতি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ম্লানমুখে গৃহে ফিরিল। তাঁতির যদি কাপড় বিক্রয় না হইল, তবে সে খাইবে কি? তাহার এক পাল পরিবার সে কি করিয়া পুষিবে? সুতরাং অন্নাভাবে তন্তুবায়-শ্রেণী মরিতে লাগিল।

বঙ্গদর্শন বলেন—"আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, বঙ্গালায় তাঁতিরা বহুসংখ্যক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালার যেখানেই জ্বর পীড়া মরক আরম্ভ হউক, সর্ব্বাগ্রে সেখানকার তাঁতি পীড়িত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁতি মরে। দুর্ভিক্ষ হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁতিকে উপবাস করিতে হয়। এই জন্য তাহাদের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা কমিয়াছে।—" সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু এখনও লোপ হয় নাই। এখনও বাঙ্গালায় অনেক তাঁতি আছে। যে সকল তাঁতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহবা একেবারে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিযাছে, কেহবা তাঁত ছাড়িয়া কলে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহবা যো যা করিয়া এখনও দুই এক খানি কাপড় বুনিতেছে। যাহাই হউক, তাঁতিদের অবস্থা অতি শোচনীয়। এ অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপায় ও অতি অল্প।

বার্ডউড সাহেব একটি উপায় ঠিক্ করিয়াছেন, বঙ্গদর্শন ও সেই উপায়ের পোষকতা করিয়া অনেক লিখিয়াছেন। সে উপায় এই—"স্ব

সকল বস্ত্র অলঙ্কার এদেশজাত নহে, তাহা যেন এদেশবাসীরা একবারে ব্যবহার না করেন।"—উপায়টি বলিতে ভাল, লিখিতে আরও ভাল, কিন্তু কার্য্যে কতদূর ভাল জানি না। এ উপায় নির্দ্দেশে আমাদের আশা মিটিল না, অথবা এ উপায় তত কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইল না। ইহাতে কোন কাজ হইবে না; কোন কাজ হইতে পারে না। বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ যে বড় ফলদায়ক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদর্শন বলিয়াছেন —"দেশী কাপড় মহার্ঘ এই জন্য সামান্য লোকেরা তাহা ব্যবহার না করিয়া ম্যানচেষ্টারের উদর পূরণ করে; কিন্তু যাঁহারা লালবাগানের ধুতি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন দেশী কাপড় সস্তা, দেশী কাপড় টেকসহি, অনেক দিন যায়। আমরা জানি পাবনা জেলার দোগাছিয়া গ্রাম হইতে একজন ষোল টাকা মূল্যে একখানি ধুতি ক্রয় করিয়া আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নিত্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বিলাতি ধুতি অপেক্ষা দেশী ধুতি সস্তা। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখিলে বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ পালন করা কঠিন হইবে না।"

কঠিন যে হইবে না কেমন করিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। হউক, লালবাগানের কাপড় সস্তা, কিন্তু কলের কাপড়ের কাছে নয়। দেড় টাকার দেশী ধুতি দেড় টাকার কলের কাপড়ের অপেক্ষা অনেক দিন টিকিবে বটে, কিন্তু তত পরিষ্কার হইবে না। বাঙ্গালী এক্ষণে সভ্য হইয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, মোটা কাপড় তার পছন্দ হইবে কেন? যে আট টাকার সরকার তাহাকে ও ফুলকোঁচা দিয়া কাপড় পরিতে হইবে। ভাল দেশী ধুতির দাম অনেক, সে সঙ্গতি তাহার নাই। কলের ধুতি সস্তা। যে রকম দেশী ধুতির দাম ৬ টাকা সে রকম কলের ধুতি জোর ২।৵৹ আনা। যদি টেকসহির কথা ধর, রেলি ৪৯ তাহাতে মন্দ নয়। রেলি ৪৯ সস্তা, পরিষ্কার, পরিলে সভ্যতা বজায় থাকে; অথচ রেলি ৪৯ টেকসহি। ফরাসডাঙ্গার কাঁচি ধুতির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে, কিন্তু তার দাম দ্বিগুণ। সুতরাং কলের ধুতির প্রয়োজন। আর এক কথা, একজন দোগাছিয়ার একখানি ধুতি ষোল টাকা দিয়া কিনিয়া আট

বৎসর নিত্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলে খুব কম পড়িল, বৎসরে কাপড় খরচ মোট ২ টাকা মাত্র। জানিনা সকলের ভাগ্যে এত টেকসহি হইবে কিনা, কিন্তু এককালীন ষোল টাকা দিবে কে? বড় মানুষদিগের কথা ছাড়িয়া দাও। মধ্যবিৎ গৃহস্থদিগের খরচ অনেক, একবারে এত সংস্থান করিবে কোথা হইতে? তাহা ছাড়া প্রতিবৎসর পূজায় ও পার্ব্বণে বাঙ্গালীর অনেক খরচ। বঙ্গদর্শনের মতে হিসাব করিয়া এক পরিবারের কাপড় কিনিলে অনেককে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে। ফল কথা, বাঙ্গালী দিন আনে দিন খায়; বাঙ্গালী এককালে এত টাকা দিতে পারে না, কখনও পারিবেনা। সুতরাং ওরূপ হিসাব করিয়া চলা কঠিন। পাশ্চাত্য সভ্যতা যত দিন বাঙ্গালাকে জর্জ্জরিত করিবে, তত দিন টেকসহি হউক আর নাই হউক বাঙ্গালী দেশী ধুতি রাখিয়া কলের ধুতি কিনিবে।

বাঙ্গালী যে কলের ধুতি কিনিবে, তাহার আর এক কারণ আছে। মূল অন্বেষণ করিলে তাহা ও সভ্যতা। বাঙ্গালী এখন পিরাণ আঁটে, চাপকান পরে, কোট গায় দেয়। লংক্লথ, নয়ানসুখ, আরো অনেক জিনিস তাহার আবশ্যক। কলে তাহা তৈয়ার হয়, কিন্তু তাঁতি তাহা বুনিতে জানে না। কাজেই কলের কাপড় আবশ্যক, কাজেই বার্ডউডের পরামর্শ পালন করা কঠিন।

বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করা কঠিন হইত না, যদি বাঙ্গালায় কল থাকিত। ম্যাঞ্চেষ্টার যেমন একখানি কাপড় দোকানের বাহির করিত, যদি তেমনি একখানি কাপড় পার্শ্বের দোকান হইত বাঙ্গালা দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে খরিদ্দার দেশীয় দ্রব্য ছাড়িয়া বিদেশীয় দ্রব্য কিনিত না। কিন্তু বাঙ্গালা তেমন করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। বাঙ্গালায় কল নাই। বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ অনুযায়িক চলিতে হইলে কলের আবশ্যক। আমরা কলের পক্ষপাতী। বঙ্গদর্শন বলেন—"স্বীকার করি, কল শুভপ্রদ। কিন্তু সে শুভ অনেক সময়ে আমাদের নিজের, বঙ্গ সমাজের নহে।" আমরা এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না। কল বাঙ্গালার শুভপ্রদ। তাই বলিয়া ম্যাঞ্চে-

ষ্টারের কলের কথা বলিতেছি না, অথবা কোন সাহেবপরিচালিত কলের কথা উল্লেখ করিতেছি না। কল যদি বাঙ্গালীর হয়, তবে কল বাঙ্গালার শুভপ্রদ। বম্বেবাসীরা একদিন পথে পথে গাইয়াছিল, "আমাদের দেশে পাট তুলা জন্মে, তাহা বিলাতে যায়; বিলাত হইতে আমাদিগের কাপড় তৈয়ার হইয়া আইসে।" বম্বেবাসীরা এ কথা বলিয়াছিল, আর কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দুঃখ, বিলাত হইতে তৈয়ার হয় বলিয়া। কিন্তু কলে তৈয়ার হয় বলিয়া নহে। তাহারা জানিত, কল নহিলে মাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করা যাইবে না। কলের উপকারিতা তাহারা বুঝিয়াছিল। এখন তাহাদিগের পক্ষে বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ পালন করা কঠিন নহে।

কিন্তু, বাঙ্গালীদিগের পক্ষে ইহা কঠিন। কেন কঠিন, তাহাও বলিয়াছি। মাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার যে আশা ছিল, তাহা আর নাই। মাঞ্চেষ্টারের উপর মাসুল বাড়িবে না। তাহা গবর্ণমেণ্টের হাতে। গবর্ণমেণ্ট স্বজাতিপ্রিয় ও স্বদেশবৎসল ইংরাজ। সেই জন্যই বঙ্গদর্শন বলিয়াছেন—"আমরা মাঞ্চেষ্টারের দ্রব্য কিনিব না, ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা যদি করি এবং তাহা রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের আর গবর্ণমেন্টের নিকট এ বিষয়ের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইবে না, মর্ম্মব্যথা পাইতে হইবে না; আপনার ইচ্ছার অধীন থাকিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞার অধীন থাকিয়া, স্বাধীনতার সুখ লাভ করিতে পারি।" বাস্তবিক, এ কথা গুলি অতি মহান্ ও উদার ভাবে পূর্ণ। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার উপায় কি?

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝা উচিত প্রতিজ্ঞাটি কি? যে সকল বস্ত্র এদেশজাত নহে, তাহা যেন আমরা ব্যবহার না করি। এ দেশজাত বস্ত্র বলিলে যে, মাত্র তাঁতিরা যাহা তাঁতে বয়ন করিবে তাহাই বুঝাইবে; তাহা নহে। এ দেশীয় যদি কেহ কলে বয়ন করিতে পারেন তাহা ও এদেশজাত বস্ত্র। কল যদি দেশের হয়, দেশীয় যদি কেহ চালাইতে পারেন, তাহা হইলে তদুৎপন্ন দ্রব্য এদেশজাত। যদি "এদেশজাত" শব্দের এ অর্থে কোন ভুল না থাকে তাহা হইলে এক উপায় আছে। বম্বেবাসীরা সেই উপায় অবলম্বন করি-

য়াছে। কল ভিন্ন অন্য উপায় আর দেখা যায় না, অন্য উপায় নাই। আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা ভিন্ন উক্ত প্রতিজ্ঞা পালন করা যায় না। কেন যায় না তাহা ও বলিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় কলের নিতান্ত প্রয়োজন।

কল যেন আবশ্যক, কিন্তু কল চলিবে কি প্রকারে? কল চালাইবে কে? ইহার উত্তর আছে। কিন্তু কল হইবে কোথা হইতে? কল আমাদের নয়, কল বিলাতের। এদেশের লোক কল তৈয়ার করিতে জানে না, বিলাতের লোকে তাহা জানে। কিন্তু সে জন্য কিছুই ভাবিবার আবশ্যক নাই। কল এদেশে হয় না বটে, কিন্তু অন্য দেশ হইতে কিনিয়া আনা যায়। কল বিলাতে তৈয়ার হয় বটে, কিন্তু তাহা বিক্রয় হয়। অতএব প্রথমে একটি কল ক্রয় করা আবশ্যক। তুমি আমি কল কিনিতে পারি না, সাধারণ লোকে তাহা পারিবে না। কল কিনিতে অধিক টাকার দরকার। কল কিনিতে পারেন, দেশের যাঁহারা বড় মানুষ—যাঁহারা জমিদার।

ইহাতে ক্ষতি বা লোকসানের আশঙ্কা নাই। সকলেই জানেন, মাঞ্চেষ্টার ধনী; তথাকার বণিক্‌সম্প্রদায়ের ধন অতুল। অথচ মাঞ্চেষ্টারকে দূর দেশ হইতে পাট, তুলা আমদানি করিতে হয়; একেবারে প্রজাদিগের কাছে সে সকল দ্রব্য কিনিতে পারে না; মহাজন, দালাল, হাউসওয়ালা ও আর ও অনেককে অনেক দিতে হয়। তার উপর জাহাজভাড়া আছে। জমিদার সে সকল একেবারে প্রজাদের নিকট ক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং মাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের অপেক্ষা দেশীয় জমিদারদিগের অধিক লাভ সম্ভব, অধিক লাভ নিশ্চিত। জমিদারগণ যদি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান আয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন, লাভ বিস্তর। এক বিঘা জমিতে দশ মোন পর্য্যন্ত পাট জন্মে, দশ মোন পাটের দাম ৪০ চল্লিশ টাকা। জমিদার তাহার খাজানা পান বড় জোর ২ টাকা, অথচ সে জমিতে অন্য অনেক ফসল হয়। যদি খাজানা প্রজাদিগের নিকট নাও লয়েন, যদি সেই প্রজাদের নিকট হইতে টাকা দিয়া মাল কিনিয়া কলে ব্যবহার করেন, লাভ আটগুণের কম হইবে না। তাহাই বলিতেছিলাম, ইহাতে লাভ ভিন্ন লোকসানের আশঙ্কা নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে, কল চালাইবে কে ? বাঙ্গালায় তেমন লোক কোথায় ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ প্রশ্নের উত্তর আছে। এজন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আবশ্যক। জমিদারগণ যেমন কল কিনিবেন, সেই সঙ্গে কয়েক জন এদেশীয়কে কলের কাজ শিখিবার জন্য খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইবেন। এ পর্যান্ত বিলাত হইতে কোন বাঙ্গালী ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ফেরে নাই। ব্যর্থচেষ্ট হইয়া কোন বাঙ্গালী ফিরিবে না। দুই বৎসর পরে কল চালাইবার লোকের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। কিন্তু ইহাতে পয়সার প্রয়োজন। সে পয়সা প্রথমতঃ অনেকটা অনিশ্চিতের উপর ঢালিতে হয়। সুতরাং ভয় হয়, কি জানি, যদি জমিদারগণ অসম্মত হন। অসম্মত হইবার কোন কারণ নাই। তাহা হইলেও আর এক উপায় আছে। কলের সঙ্গে সঙ্গে বিলাত হইতে দুই এক জন সাহেব মিস্ত্রি আমদানি করিলে সুবিধা আছে। তাহাদিগের বেতন নির্দ্ধারিত থাকিবে, নির্দ্ধারিত বেতনে তাহারা কল চালাইবে। তাহাদিগের সহকারিতার জন্য জন কয়েক বাঙ্গালী ও তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে থাকিবে। এইরূপ এক সঙ্গে দুই বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিলে বঙ্গালীদিগের ব্যুৎপত্তি জন্মান সম্ভব, জন্মান নিশ্চিত। নিশ্চিত এই জন্য বলিতেছি, কেননা, দেখিলে না শিখিতে পারে এমন কোন কাজ বাঙ্গালীর নিকট নাই। দুই বৎসরের পর সে বিনা সাহায্যে স্বহস্তে কল চালাইতে পারিবে। এ কথা নিশ্চয়। সুতরাং দুই বৎসর পরে জমিদারগণ সে সাহেবদিগকে অক্লেশে ছাড়াইয়া দিতে পারিবেন। অতএব কল চালাইবার জন্য ভাবিতে হইবে না, ভাবা অনুচিত।

দেখিতে দেখিতে আমাদিগের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অতএব ইহার উপসংহার করিব। উপসংহার কালে আমাদিগের জমিদার মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একবার একটু এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখেন। একা এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে যদি কাহারও সাহস না হয়, পাঁচ জনে মিলিয়া একটা কোম্পানি খুলুন। বিলাতি বণিক্‌দিগের সেয়ার (Share) কিনিতে অনেকেরই আগ্রহ, অনেকেই কেন না ইহাতে যোগ দিবেন ? কথায় বলে, একের বোঝা পাঁচের নড়ি।

একের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য, পাঁচজনে করিলে তাহা সহজেই সুসিদ্ধ হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় একজনের অপেক্ষা পাঁচজনে মিলিয়া কোম্পানি খোলা ভাল।

বলা বাহুল্য, ইহার ফল বিস্তর। জমিদার বা বড়মানুষদিগের আয় যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে। যিনি আজ গ্রেহাম বা রেলির বাটীতে মুৎসুদ্দি হইবার জন্য লক্ষ মুদ্রা লইয়া লালায়িত, তিনি নিজেই একজন গ্রেহাম বা রেলী হইতে পারিবেন। জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইবে। আমাদিগকে আর লজ্জা নিবারণের জন্য পরের মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। হতভাগ্য তাঁতিরা উচ্ছিন্ন দশা হইতে কতক পরিমাণে বাঁচিতে পারিবে। ২০ টাকার জন্য বেচারী কেরাণী মহলকে অত দুপুর রৌদ্রে আফিষে আফিষে টো টো করিয়া বেড়াইতে হইবে না। আমরা বাডউড্ সাহেবের পরামর্শে চলিতে পারিব। গবর্ণমেণ্ট কতকটা বুঝিবেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিলক্ষণ জব্দ হইবে! বঙ্গদর্শনের মতে—আমরা ও স্বাধীনতার সুখ লাভ করিতে পারিব। যে হেতু -"স্বাধীনতা আর কিছুই নহে; কে রাজা তাহা লইয়া স্বাধীনতা নহে। আমি যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন না হই তবেই আমি এ দিকে স্বাধীন।"

টাকা হয় কিসে?

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

মানুষের এমন একদিন ছিল যখন সে আপনি বৈ আর কাহাকেও চিনিত না, আপনার খাওয়া পরা ভিন্ন অন্য কিছু জানিত না; যখন পশুজীবনে আর তাহার জীবনে পৃথক ছিল না। সেই জীবন হইতে মানুষ আবার যখন সভ্যতার প্রথম সোপানে পদার্পণ করে তখন সে নিজের পরিবার, নিজের আত্মীয় স্বজনের সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই শেখে নাই,

তাহাদের ভরণপোষণরক্ষণই তাহার ধ্যান জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম ছিল, তখন তাহারা বৃক্ষকোটরে বাস ত্যাগ করিয়া সবে মাত্র গৃহনির্ম্মাণে চেষ্টা করিতেছে, শীকারলব্ধ আমমাংস ও অযত্নসুলভ ফলমূলাদির সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে। সেই দিনকার সেই সভ্য-জীবনের প্রথম রেখাপাতের সহিত আজিকার উনবিংশশতাব্দীর এই উন্নতিপরায়ণ সভ্য-জীবনের তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে উন্নতি কোথায়—আমরা সভ্য কিসে? তখন মানুষ আপনার জীবন লইয়া শম্বুকের মত আপনাতে আপনি নিমজ্জিত থাকিত; আর এখন মানুষ পরমুখপ্রেক্ষী; পর না হইলে মানুষের একদিন চলে না। তখন মানুষ নিজের ধনে ধনী ছিল, আপনাকে অন্য হইতে দূরে রাখিত; আর এখন জাতীয়তা হইয়াছে, নিজের ধন মুহূর্ত্ত মধ্যে জাতীয় ধনে পরিণত হইতেছে। জাতি সাধারণের ভাণ্ডারে যে যত পরিশ্রম করিয়া যত ভাল জিনিস দিতেছে, জাতি সাধারণের যেন অনুমতি ক্রমে সে সেই ভাণ্ডার হইতে তত অধিক লইতেছে। আগে একটি ভাল জিনিষ নির্ম্মিত হইলে যার জিনিষ তার বা তার পরিবারবর্গেরই থাকিত; আর এখন সেই জিনিষ সকলের ভোগে আসিতেছে। যে পরিমাণে সেই জিনিষ সকলের ভোগে বা উপকারে আসিতেছে, যে সেই জিনিষ প্রস্তুত করিতেছে সে সেই পরিমাণে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ জাতিসাধারণের নিকট পাইতেছে। ইহাকেই বলে—Distribution of wealth। অর্থ-বাণিজ্যের এই মূল নিয়ম, ধনোন্নতির এই সুবর্ণসেতু। আজ যদি কেহ এমন হতভাগ্য থাকে, কিম্বা কেহ এমন আলস্যপরায়ণ হয় যে, সে সেই জাতিসাধারণের ভাণ্ডারে কিছুই প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে সে সমাজস্থ কোনও দ্রব্যের অধিকারী নহে—সে কিছুই পাইবার যোগ্য নয়। সে সমাজের শত্রু, লোকের গলগ্রহ। তাহার মরণে তাহার নিজের মঙ্গল—দেশের মঙ্গল—যার গলগ্রহ তার ও মঙ্গল। এই জন্য বলিতেছিলাম, একান্নবর্ত্তী পরিবার বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের মূলে আঘাত করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সময় কাল গিয়াছে, এখন আমাদের দেশ হইতে যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

কিন্তু সকল সমাজ কিছু এক ধাতুতে গঠিত নহে। হিন্দুসমাজ সেই

মান্ধাতার আমলে যেমন ছিল এখনও অবিকল নদীস্রোতের ন্যায় তেমনি বহিয়া যাইতেছে। পরমার্থ জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হওয়ায় ক্রমে সামাজিক সুখ একেবারে তিরোহিত হয়—ক্রমে সমাজের সকল দিক জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—তাই সমাজ তখন যেখানে ছিল এখনও প্রায় সেইখানেই রহিয়াছে। এখন ও সমাজ নড়িতে চড়িতে চায় না, সেই ধর্ম্মজ্ঞানে বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে, জগতের পানে চাহিয়া দেখিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু উন্নতিপরায়ণ যে কোন জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, সকলেই ব্যস্ত, সকলেই সভ্য জীবনের অভাব পূরণে যত্নবান, সকলেই কিসে সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে সেই চেষ্টায় বিব্রত। হয়, কেহ দেশে নূতন অভাব দেখাইয়া দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দেশের উপকার বা আয়ের বৃদ্ধি করিতেছে, অথবা জাতীয় ধনের সম্বর্দ্ধন করিতেছে; আর না হয়, কেহ বিদেশের অভাব মোচন করিয়া স্বদেশের ধনাগমের প্রকৃষ্ট পথ খুলিয়া দিতেছে। মার্কিন বড় হইতেছে প্রথমটি অবলম্বন করিয়া, আর মাঞ্চেষ্টার, লিভরপুল ও সেফিল্ড বড় হইয়াছে ভারতে কাপড়, নূন আর ছুরি কাঁচি কলবল পাঠাইয়া। সুতরাং যে জাতির ভাল অবস্থায় থাকিবার ইচ্ছা যত প্রবল, সুখ সাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি পরিবেষ্টিত হইতে চেষ্টা ও তত অধিক, উন্নতিও তাহাদের সেই পরিমাণ, ধনবৃদ্ধিও তদ্রূপ। ইংলণ্ড আজ পৃথিবী মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা ধনবান কেন? ইংলণ্ড প্রকৃতির বরপুত্র বলিয়া তাহা নহে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক ভাল খাইব, ভাল পরিব, সকল প্রকার সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ করিব বলিয়া যে কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত। ইহাদের যত্ন, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তাই আজ মহামনা কার্লাইল হইতে মেসন্ন কোম্পানি পর্য্যন্ত লোকের সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। তাই আজ ইংরাজ টাকার রাজা, ধনীর অগ্রগণ্য, সুখের অধীশ্বর।

আমদানি রপ্তানির তালিকা দেখিয়া দুইটি জাতির ধনাধিক্যের তারতম্য স্থির করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির ধন নির্ণয় করিতে হইলে তাহার পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য নিচয়ের যত পরিমাণ তাহার ভোগে আছে তাহা স্থির করাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয়। এই হিসাব

যদি ধর, বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ডের বিদেশবাণিজ্য তাহার ধন সংখ্যা কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ ইংলণ্ড সেই সমস্ত বিদেশ বাণিজ্য হারায়, তাহাতে তাহার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই, এবং অনেককে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইবে তাহার ভুল নাই, অথচ ইহাতেই যে ইংলণ্ড দহ পড়িয়া যাইবে এ কথা মনে করা যাইতে পারে না। ইংরাজের চরিত্র এমন সুন্দররূপে গঠিত, তাহাদের জীবনের আদর্শ এত উচ্চ যে, তাহাদের দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করা এক প্রকার অসম্ভব। তাহাদের এই অসহিষ্ণুতা হইতেই তাহারা দুঃখ ছাড়িয়া উঠিবে। যেখানে ধনাকাঙ্ক্ষা এত উগ্র সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের বুদ্ধিকৌশল সেই ধন পাইবার জন্য সচেষ্ট। সেই জন্য তাহারা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা পুনরায় লোকের নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহার পূরণ দ্বারা অর্থাগমের পথ খুলিয়া দিবে। কিছু দিনের মধ্যেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।

কোন একটি বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করিবার নানা উপায় আছে। একটি বাক্যের বিপরীত বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা ন্যায় শাস্ত্রের একটি নিয়ম। আমরা সেই নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা গুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিব। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সকল বিষয়ে বিপরীত, ভারতবাসী ও ইংরাজ ঠিক বিপরীত ধাতুতে গঠিত। ইংরাজ রাজা, ভারতবাসী প্রজা; ইংলণ্ড উন্নতিশীল ভারত স্থিতিশীল। ইংলণ্ড জগতে সম্পন্ন দেশ, ভারতবর্ষ ভয়ানক দরিদ্র, ইংলণ্ড টাকার অধীশ্বর, ভারতবর্ষ কড়ার কাঙ্গাল। ইহার কারণ কি? কারণ, ইংরাজের যেমন ধনলিপ্সা বলবতী, ভারতবাসীর তেমনি ধনে তাচ্ছিল্য। কারণ, ইংলণ্ড বড় হইতে চায়—বড় হইতে জানে, ভারত বড় হইতে চায় না—পদতলে পড়িয়া থাকিতে তাহার আপত্তি নাই। সুখ সচ্ছন্দতায় থাকা কাহাকে বলে ভারতবাসী তাহা জানে না, আবার জানিতে ও চায় না। ভারতবাসীর মধ্যে যে কেহ যত কেন অর্থ উপার্জ্জন করুক না, সে সেই পুরাকালের অসভ্যদিগের মত সে অর্থ তাহার নিজের রাখিতে চায়, তাহা জাতীয় ধনে পরিণত করিতে চায় না। যৎসামান্য বসনভূষণেই তাহার পরিতৃপ্তি। নিজের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করা নিজ

কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিব না—এ সকল ইচ্ছা তাহার জন্মিবে না। সে বুঝিতে পারিবে না—বুঝিতেও চাহিবে না যে, নিজে ভাল থাকা, নিজের পরিবার মধ্যে সুখে থাকা কেমন পদার্থ। তাই ভারতবাসী এত দুঃখী, তাই ভারতে টাকা এত কম।

আমরা উপরে যতগুলি কথা বলিলাম তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'টাকা হয় কিসে' ইহার একমাত্র উত্তর জাতীয় ইচ্ছা। যে জাতির কোন জাতীয় ইচ্ছা নাই—চেষ্টা নাই, সে জাতি কখন উন্নতি করে নাই, কোন কালে করিবেও না। কার্থেজ বড় হইয়াছিল, ইংরাজ বড় হইয়াছে টাকা টাকা করিয়া। টাকাই তাহাদের জাতীয় লক্ষ্য। কিন্তু, টাকা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য নহে। বলিতে কি আমাদের জাতীয় লক্ষ্যই নাই—জাতীয় জীবনই নাই। আমরা বাঙ্গালী, লিখিতেছি বঙ্গ ভাষায়, আপাততঃ বাঙ্গালার কথাই বলি—তাহাই আমাদিগের শোভা পাইবে। দেখ, আমাদের দেশে যাঁহাদের টাকা আছে—যাঁহারা অর্থবান্ তাঁহারা সব নিশ্চেষ্ট। জলে জল বাঁধে—টাকায় টাকা আনা যায় একথা সকলেই জানেন। যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই দেশীয় ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা নড়িতে চড়িতে চাহেন না। নড়িতে চড়িতে চাহিবেনই বা কেন? ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সুখে থাক, যাঁহারা জমিদার তাঁহাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া যাঁহারা সাধারণ বড় লোক তাঁহাদিগের জন্য কোম্পানি কাগজের সুদ আছে। ঘরে বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া গুড়্‌গুড়ি ফুঁকিতে ফুকিতে যদি ক্যাসবাক্স বোঝাই করা যায়, তবে আবার নড়িতে চড়িতে চাহিবেন কেন? বৃটীষগবর্ণমেণ্টের অনন্ত কৌশল! অতি সুন্দর উপায়ে এত গুলা লোকের হাত পা কাটিয়া দিয়াছেন; তাহারা জানেন, আর ইহাদের দেশীয় ধনবৃদ্ধি করিয়া জাতীয় চেষ্টা উদ্ভূত করিতে হইবে না। এই জন্যই বাঙ্গালার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এই রূপে ধনের সমসঞ্চরণ (Equal distiibution) না হওয়ায় সমাজের মধ্যবিত্ত লোক নাই। মাত্র দুই ভাগ। এক—অতুল ধনের অধীশ্বর, অপর—পথের ভিখারী। প্রথমটির ক্ষমতা ও চেষ্টা উপরি উক্ত হইয়াছে। এখন যাহারা অন্নাভাবে অস্থির

তাহাদের কথা—কিন্তু তাহাদের কথাই বা আর কি বলিব ? বঙ্গের হিন্দু-সন্তান সমাজের উৎপীড়নে বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া পঁচিশ পায় না হইতেই পুত্রকলত্রের পিতা হইয়া পেটের দায়ে, টাকার খাতিরে ইংরাজ-চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া কলম পিসিয়া যৎকথঞ্চিৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। মুন্সেফ, ডেপুটী হইতে ১৫ টাকার কেরাণী অবধি সব একই দশা।

ইহার উপর আবার বাঙ্গালাব তিন সরিক। হিন্দু, মুসলমান ও ফিরিঙ্গী। এ তিন জনের প্রবণতা তিন দিকে। রাজা বিদেশী, প্রজায় প্রজায় বিবাদ বাঁধে তাহার সুন্দর পথ নির্ম্মাণে ব্যস্ত। টাকা খোঁজে সকলেই, দেশ ও সকলের বাঙ্গালা ; কিন্তু কৈ টাকার জন্য জাতীয় চেষ্টা কৈ ? জাতীয় চেষ্টা না থাকিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না ; সুতরাং বাঙ্গালায় টাকা হইবে কেমন করিয়া ? এক বাঙ্গালায় যদি টাকা না হইতে পারে, সমগ্র ভারতবর্ষে টাকা হইবার উপায় নাই। উপায় নাই, কেন না, ভারতে জাতীয়-জীবন নাই। এক বাঙ্গালায় এই তিনজাতি তিন প্রকার, সমগ্র ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা প্রকার। এক জাতির কথা অন্যজাতি বুঝে না, এক জাতির আচার ব্যবহারের সহিত অন্য জাতির আচার ব্যবহার মিলে না। সুতবাং জাতীয়তা কোথায় ? জাতীয় চেষ্টা নাই জাতীয় ধনাগমের পথ কে খুলিয়া দিবে ? যাঁহারা সত্ত্বয়-সমুত্থানের পক্ষপাতী তাঁহাবা বুঝিতে পারিবেন, কেন তাঁহাদের সাধু চেষ্টা বিফল হয়, কেন তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে—সকল অভাব নিরাকরণে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে, কেন তাঁহাদের দশা এত শোচনীয়, কেন ভারত এত দরিদ্র।

এ শোচনীয় অবস্থাপর্য্যায় পরিবর্ত্তিত হয় কি উপায়ে ? ভারত ধনী হয় কেমন করিয়া ? টাকা হয় কিসে ? একথার একই উত্তর—জাতীয় জীবন—জাতীয় ইচ্ছা—জাতীয় চেষ্টা। হায় ! কোন্ মহাপুরুষ এই অধঃপতনের স্রোতঃ ফিরাইয়া দিয়া জাতীয় জীবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্কুক্ষিত করিয়া জাতীয় চেষ্টার প্রণোদনা করিবেন। সে দিন কবে হইবে, যবে ভারতবাসী জাতীয়তা শিখিবে, নিজ নিজ বিভিন্ন মত সমূহ এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় নিয়ুজ্জিত করিবে, ভারতে আবার টাকা হইবে।

বাঙ্গালার কবি ও কাব্য।

(৫৬ পৃষ্ঠার পর)

মিল বলেন "We should say that eloquence is heard, poetry is overheard. Eloquence supposes an audience, the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconsciousness of a listener."

Mill's Discussions and dissertations Vol. I.

সত্য বটে "উদ্দীপনাবাক্য আমরা প্রকাশ্যভাবে শুনিয়া থাকি, আর কবিতা আমরা লুকাইয়া শুনি; সত্য বটে উদ্দীপনাবাক্য বলিলেই যেন আমাদের মনে শ্রোতৃমণ্ডলী ও বক্তার কথা মনে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু কবিতার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না কবি যে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকেন একথা আমরা কিরূপে স্বীকার করি? মহাকাব্য সকল দেখিলে কে আজ মিলের কবিতার লক্ষণের সার্থকতার প্রতি বিশ্বাস করিবে? প্রথমতঃ বাল্মীকি তাঁহার অনুপমেয় রামায়ণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"পাঠক, এক্ষণে সেই সমাস-সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগ-সম্পন্ন দোষ-বিরহিত প্রসাদগুণোপেত বাক্যসম্বলিত ঋষিপ্রণীত রামচরিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর"—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুবাদিত রামায়ণ।

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

তংসন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃশ্যামিকাপিবা॥

গ্রীশদেশের বিখ্যাত কবি হোমর গ্রীকদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ইলিয়ড রচনা করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রাম, পথে পথে, গৃহে, গৃহে গান করিয়া বেড়াইতেন। মিল্টন তাঁহার রচিত প্যারাডাইজলষ্ট কাব্যের প্রথম সর্গেই ঈশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, আবার সেই

গ্রন্থের সপ্তম সর্গে কবি ইউরেনীয়াকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন “দেবি! আমাকে কাব্যের বিচারক্ষম শ্রোতৃমণ্ডলীর সংগ্রহ করিয়া দেও—তাহাদের সংখ্যা অল্প হয় হউক, তাহাতে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই।”

এ সকল প্রমাণ সত্বেও আমরা কেমন করিয়া মিলের সহিত ঐক্য হইয়া বলিব যে, বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না কবি তাহাতে বীতচেতন থাকেন। মিল স্বীয় মতের পোষকতা করিবার জন্য আরও বলিয়াছেন—

All poetry is of the nature of soliloquy. But what we have said to ourselves we tell to others afterwards; what we have said or done in solitude we may voluntarily reproduce when we know that other eyes are upon us. Bnt no trace of consciousness that other eyes are upon us must be visible in the work itself, when he turns round and addresses himself to another person, when the act of utterance is not itself the end but the means to an end, —Viz: by the feelings he himself expresses to work upon the feelings, or upon the belief or the will of anothers, when the expression of his emotion or of his thoughts tinged by his emotions is tinged also by that purpose, by that desire of making an impression on another mind then it ceases to be poetry and becomes eloquence.”

মিলের উপরি উদ্ধৃত মতটি আমরা এই বলিয়া খণ্ডন করিতে চাই, সিজার (অগষ্টস) যখন রোমের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন সমগ্র রোম সাধারণতন্ত্র। জুলিয়স সিজারের হত্যাকাণ্ডই তাহাদের সেই সাধারণতন্ত্রপ্রিয়তার জলন্ত প্রমাণ। সুতরাং অগষ্টস সিজার রাজা হইতে পারিলেও তাঁহার মনে স্বদেশবাসীদিগের নিদারুণ বৈরিতার কথা সতত জাগ্রত ছিল, তিনি সেই আশঙ্কা দূরী করণার্থে কবি বর্জ্জিলকে এক খানি কাব্য লিখিতে আদেশ করেন। কবি ইনিয়াড লেখেন, কবি সেই কাব্যে ইহাই প্রকাশ করেন যে, সিজার দেবী ভিনস-প্রসূত ইনিয়সের বংশোদ্ভব, সুতরাং রাজসিংহাসনে তাঁহার যত অধিকার সমস্ত রোম রাজ্যে তত অধিকার আর কাহারও নাই, আরও তাহার ন্যায় ধীরদাত্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়া যে আমাদের আরাধ্য দেবতা জুপিটারের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এ কথা জানিয়াও কি আমরা বলিতে

পারি যে উক্ত কাব্য উদ্দেশ্যবিরহিত লোক-রঞ্জন-করণোপায়-আত্মগত উক্তি মাত্র। যদি কেহ এমন বলেন যে, কবির নিগূঢ় উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন; তাহা আমাদিগের জানিবার অধিকার কি? যদি সেই কবিতার অন্তরের প্রকাশ্য বা গূঢ় স্থানে অন্য সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধ না হয় তাহা হইলে সে কবিতাকে আমরা কবির আত্মগত উক্তি ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? মিল স্বয়ংই বলিয়াছেন—"কবি এক সময়ে যাহা আপনি ভাবেন, অন্য সময়ে তিনি তাহা পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন, সুতরাং বর্জ্জিলের এক সময়ের আত্মগত ভাব বা উক্তি অন্য সময়ে ইনিয়ড রূপে প্রকাশ হইয়াছে। বর্জ্জিলের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক্ তিনি তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়া, আপনার কল্পনার তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন; হৃদয়ের সেই গভীরতর ভাবোচ্ছাসে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন; তখন আর তাঁহার সে অন্তঃকরণ পার্থিব নহে, তখন আর রোমের কথা তাঁহার মনে ছিল না; সিজারের অনুরোধ তাঁহার মন হইতে একবারে মুছিয়া গিয়াছিল। আবার ঐ পুস্তকের অষ্টম সর্গে ইনিয়স প্রেতলোকে অধিষ্ঠিত হইলেন, সেখানে তিনি তাঁহার পিতা এঙ্কাইসিসের সাক্ষাৎ লাভ করেন, পুত্রবৎসল এঙ্কাইসিস ইনিয়সকে সঙ্গে লইয়া তথাকার নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন ও রোমের ভবিষ্য-পট কিঞ্চিৎ তাহার সমীপে ব্যক্ত করিলেন। কালে যাহারা রোমের রাজা হইবেন একে একে তাঁহাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন; তিনি কেবল জুলিয়স ও অগষ্টসের অসামান্য কীর্ত্তি রাশির পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি আর এক যুবা পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ঐ যে তোমার সম্মুখে যুবা পুরুষটিকে দেখিতেছ, উনিই ট্রোজন বংশের কুলতিলক ও সমগ্র রোমের পতাকাস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; উনি ধার্ম্মিক, অমিততেজা, সহিষ্ণু, সত্যনিষ্ঠ; সময়ে অরাতিদিগের দ্বিতীয় কৃতান্তস্বরূপ হইয়া স্বীয় বাহুবল প্রকাশ করিবেন; বর্জ্জিল ইহাঁর গুণ কীর্ত্তন করিলেন কেন? কারণ ইনি অগষ্টস সিজারের দেবতা স্বরূপ সহোদরা অক্টেভিয়ার পুত্র মার্সিলস। বর্জ্জিল ভ্রমবশতও ব্রটস বা পম্পের নাম করেন নাই কেন? কারণ তাঁহারা সিজারের বিপক্ষ ছিলেন। যে কবিতার প্রত্যেক

বিশদ কল্পনাময়ী বর্ণনাতে, মানবচিত্তরঞ্জন রূপ উদ্দেশ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সেই কাব্য খানিকে কি আমরা উদ্দেশ্যবিরহিত কবির আত্মগত উক্তি মাত্র বলিয়া—আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি?

কেহ কেহ বলেন—কবির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, যখন তিনি কোন কবিতা রচনা করিতেছেন, যখন তিনি আপনার কল্পনা সমুদ্রের তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত, যখন তিনি স্বয়ং আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার বহির্জগতের কথা মনে থাকে না। আমরা বলি, বহির্জগৎ হইতে ওরূপ আত্মবিস্মৃতি কবিতার মর্ম্মগত একটি বিশেষ লক্ষণ জন্মাইতে পারে না। কারণ, ভাবোদ্দীপনা যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য তাঁহারা সহজেই অন্যকে মাতোয়ারা করিতে গিয়া স্বয়ং মাতিয়া উঠেন। আপনার হৃদয় তাল দ্রবীভূত না হইলে পরের হৃদয় দ্রবীভূত হয় না; সে রূপ প্রকার যিনি না করিতে পারেন তাঁহার কার্য্য সফল হয় না। উদ্দীপনা লইয়া আমরা আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ তাহা আমাদের প্রয়োজন নাই। কবিতার লক্ষণ কি তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং আমরা মিলকে পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যদর্পণকারের মতের তুলনা করিব।

সাহিত্য দর্পণকার বলেন—"রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য" এই একটি কথা "রস" শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি কবিতার প্রকৃত মর্ম্ম বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কবিতার লক্ষণটি নিতান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত হওয়াতে সাহিত্য-জগতে বড় ঘোরতর ভ্রান্তি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেই ভ্রান্তি এই—কেহ কেহ বলেন "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য," তাঁহাদের মতে রোরুদ্যমানা পুত্রশোকাতুরা জননীর বিলাপবাক্য গুলিও কবিতা, কেন না তাহাতে ও "রস" আছে—তাহাতে ও নিতান্ত পাষাণপ্রাণ ও দ্রবীভূত হইয়া যায়; সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেন সেই বিলাপ গুলি লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে কাব্য হইবে আর লেখকের কল্পনার ও কবিত্বের চরমোৎকর্ষ প্রকাশ করা হইবে। শুদ্ধ মাতার বিলাপ কেন জগতে যাহাতে আমাদের হৃদয় প্রতিশব্দিত হয়, শিরা স্পন্দিত হয়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ উন্মুক্ত হয় তাহা লিপি বদ্ধ হইলেই কবিতা।

হইবে ও সেই কবিতাতেও পাঠকের প্রাণেও সেই রূপ সমভাব উদ্রেক করিবে। আমাদের দেশীয় একজন নাটককার রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্যের মৃত্যুতে কমলাকে এই বলিয়া কাঁদাইয়াছেন—"রোহিতরে ওরে আমার প্রাণের রোহিত রে! ওরে বাবা! ওরে বাবা! কি হলো রে ওরে কেন তুই কথা ক'সনে? ওরে রোহিত রে।" স্বীকার করি, যদি আমরা সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সেই ভীষণ শ্মশান—প্রান্তরে উপস্থিত থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় কমলার বিলাপে আমাদের হৃদয় বায়ুবিতাড়িত মেঘ খণ্ডের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। অধিক কি সেই শোকাবহ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াও যদি কেবল মাত্র তাহার রোদন শুনিতাম তাহা হইলেও আমরা হৃদয়ে শুষ্ক পত্রের ন্যায় কতদূর বিতাড়িত হইতাম বলিতে পারি না; কিন্তু গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হওয়াতে আমাদের হৃদয়ে কোন রসের উদ্রেক হয় না। অনেকে একথা বলিতে পারেন, প্রকৃত মাতার প্রকৃত রোদন শুনিয়াই বা কেন আমরা আকুল হই আর তাহা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিলেই বা কেন তাহা দর্শন করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারি না। তাহার কারণ নাটক বা কাব্য কল্পনাসাগরের তরঙ্গ মাত্র, যাহা কল্পনাশূন্য হইলে তাহাতে নাটকের নাটকত্ব বা কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না।

কল্পনাপ্রভাবে কালিদাস পুরাযুগের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে কলিযুগে উজ্জয়িনী নগরের এক প্রান্তে বসিয়া বিশদ রূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন; মালতী নদীতীরস্থ সেই প্রশান্ত আশ্রমপ্রদেশে তাহাদের সেই মধুর প্রেমালাপ শুনিতে পাইয়াছিলেন, মহর্ষি কণ্বের "হে সন্নিহিত তরুগণ" বলিয়া সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে তাহাদের পবিত্র পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিয়া আপনাকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এখনও সেই শকুন্তলা পাঠে পাঠকের হৃদয় কালিদাসের ন্যায় কল্পনাস্রোতে উচ্ছসিত হইতে থাকে; তাঁহারাও ক্ষণকালের জন্য সেই হেমকূট পর্ব্বতে উঠিয়া দুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার উদ্ধত সন্তানটিকে দেখিতে পান। এমন কি শেষে জগতের কোন কথাই পাঠকের মনে থাকে না—কেবল সেই হেমকূট; স্বচক্ষে সেই সিংহ শাবকটি যেন দেখিতে-

ছেন; তখন পাঠক যেন শুনিতে পান, দুষ্মন্ত বলিতেছেন "আহা! যাহার এই পুত্র সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে।' কিন্তু পাঠক যদি ওইরূপ বিলাপ না শুনিয়া আধুনিক কোন কবির মতন দুষ্মন্তের মুখ হইতে শুনিতে পান—

"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে,
নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায় রে—,
বদনে বালেন্দু হাসে তারকা নয়নে ভাসে,
অবিরাম দরশন চাইবারে পায় রে।
* * *
* * যবে আধ আধ বোলে
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে।"

—তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাঠকের কল্পনা মোহভঙ্গ হইয়া যায়—মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই হেমকূট, সেই সিংহশাবক, সেই কণ্বমুনির আশ্রম, সেই মুনিকন্যাগণ কোথায় বিলীন হইয়া যায়। তখন পাঠক কি তাহার পরিবর্ত্তে কতগুলি জীর্ণ মলিনবস্ত্র, কতকগুলি ছিন্ন কন্থা ও বালকদিগের ভুলাইবার সামগ্রী দেখিতে পান না?

ক্রমশঃ।

প্রতাপ।

৫০ পৃষ্ঠার পর।

৫০ পৃষ্ঠার পর।

প্রকৃত প্রণয় মুহূর্ত্ত মধ্যে হয় না, এবং সকল অবস্থায় হইতেও পারে না। কোন কোন গ্রন্থকারের কল্পনায় আমরা দেখি, নায়ক নায়িকার দর্শন মাত্রেই অমনি গাঢ় প্রণয় জন্মিল, উভয়ে উভয়ের বিরহে একেবারে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা মনুষ্যহৃদয় যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ

হয়, দর্শনমাত্রেই একেবারে গাঢ় প্রণয় হইতে পারে না। দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে দেখিবামাত্রেই বা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবামাত্রেই সেই মুহূর্ত্তেই ভালবাসা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রণয় গাঢ় হয় নাই। তাহার পর উভয়ে উভয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ধ্যান করিয়া সে ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হইল। সেই রূপ প্রথমে যখন মিরান্দা ফারডিনাণ্ডকে দেখিয়াছিল, তখন দেখিবা মাত্রেই প্রকৃত প্রণয় হয় নাই। আমরা প্রণয় ও ভালবাসা উভয়কে পৃথক রাখিয়াছি, এক্ষণে উভয়ের কি প্রভেদ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে দেখিল, প্রথমে তাহাদের দর্শনেচ্ছা বলবতী হইল, এবং পরে একজন অপর জনকে না দেখিলে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল; তখন উভয়েব মধ্যে এক প্রকার ভালবাসা জন্মাইল। তাহার পর উভয়ের সুখ দুঃখে সহানুভূতি জন্মিল, অথবা প্রথমে দয়া, পরে সহানুভূতি এবং তাহার পর ভালবাসা জন্মাইতে পারে। কিন্তু সেই ভালবাসা যখন সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিল তখন একজন অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইল।—আত্মবিসর্জ্জনই প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর শৈশবকাল হইতে ভালবাসা হইয়াছিল, তাহারা যখন দেখিল যে, সে ভালবাসার ফল শুভ হইল না,—তাহাতে বাধা পড়িল, তখন উভয়ে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গেল। কিন্তু মরিতে গিয়া প্রতাপ ডুবিল আর শৈবলিনী ডুবিল না কেন? কেন তাহার মরিতে ভয় করিল? কেন সে সাঁতার দিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল? ইহার উত্তর—যে প্রণয় যে ভালবাসা আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেয় শৈবলিনীর তাহা হয় নাই, তাই শৈবলিনী ডুবিল না, তাই তাহার ভয় করিল, এবং সেই জন্যেই শৈবলিনী পোড়ার মুখী আবার সাঁতার দিয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেই আত্মবিসর্জ্জন-শিক্ষাদায়িনী ভালবাসা প্রতাপের হইয়াছিল, তাই প্রতাপ প্রণয়ের অনুরোধে হাসিতে হাসিতে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য ডুবিল। এই রূপ প্রণয়ই পবিত্র ও জগতে দুর্লভ।

তাহার পর চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। একটি বর্দ্ধিত লতাকে আজন্মসংলগ্ন সহকার তরু হইতে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর একটি গাছে জড়াইয়া দিলে যেরূপ হয়, শৈবলিনীর অবস্থাও এখন

সেই রূপ হইল। এই স্থলে আবার প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জনের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। প্রতাপ শৈবলিনীর সুখের জন্য বেদগ্রাম ত্যাগ করিল। একস্থলে প্রতাপ শৈবলিনীকে বলিয়াছিল—"ইদানীং আমি তোমাকে সাপিনী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

কোন কোন সমালোচকের মতে প্রতাপের সহিত সুন্দরীর বিবাহ দিয়া বঙ্কিম বাবু ভাল করেন নাই। যখন প্রতাপের হৃদয়ে শৈবলিনীর প্রতিমূর্ত্তি একেবারে খোদিত হইয়া গিয়াছে এবং যখন তাহা তাহার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার আর উপায় নাই, তখন আবার সুন্দরী কেন? আমরা বলি যে, প্রতাপের চরিত্র উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করিবার জন্য তাহার সহিত সুন্দরীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। প্রতাপ যখন দেখিল যে, শৈবলিনী আর তাহার হইবে না, শৈবলিনীর বিষয় চিন্তা করাও এখন পাপ, সুতরাং শৈবলিনীকে এখন ভুলিতে হইবে। শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্যই প্রতাপ সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিল। এখানেও আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল শৈবলিনীর সুখের জন্য এবং নিজের চিত্ত সংযম করিবার জন্য প্রতাপ আপনার হৃদয় বলি দিল। এই থানে আমরা আর একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা একবার কি দুইবার সুন্দরীর নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছি, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহার কারণ—যদি আমরা সুন্দরীর সহিত পরিচিত হই তাহা হইলে তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মাইতে পারে এবং প্রতাপ সুন্দরীর ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান না করায় তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা জন্মাইতে পারে। গ্রন্থকারের এই কৌশলের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ।

আর্য্যচিকিৎসা।

৬১ পৃষ্ঠার পর।

দোষের প্রসর ও কার্য্য।

বায়ু, পিত্ত ও কফ, ইহাদের প্রত্যেকের অপর নাম দোষ। দোষ সকল কুপিত হইলে স্বস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। সুরা প্রস্তুতকালে পিষ্টতণ্ডুলাদিযুক্ত সমস্ত মসলার জল পচিয়া যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া মৃদুভাবে পাত্রের চতুর্দ্দিকে বহমান হয়, কুপিত দোষ সমূহ সেইরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহের নানা স্থানে প্রসারিত হইয়া পড়ে।

এই রূপ প্রসারিত প্রবৃদ্ধ দোষ কর্তৃক দোষমার্গানুযায়ী সমস্ত প্রকার ব্যাধির সূত্রপাত হয়।

দোষ সকলের প্রসব অনেক প্রকার। অর্থাৎ তাহারা কখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, কখন বায়ু ও পিত্ত; পিত্ত ও কফ; বায়ু ও কফ; এই দুই দুই দোষ মিলিত হইয়া; কখন দোষত্রয়ের প্রত্যেকে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, কখন দোষত্রয় একত্র হইয়া, কখন বা দোষত্রয়ই রক্তের সহিত মিলিয়া দেহে প্রসারিত হয়।

দোষ সকল কুপিত হইবা মাত্র অপহৃত হইলে, আর তাহারা প্রসারিত হইতে পায় না। সুতরাং কোন রোগও জন্মে না। আমাদের সুশ্রুতাচার্য্য বলেন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন পাত্রস্থিত জল শোষণ করে, দোষ সকল দীর্ঘকাল কুপিতাবস্থায় থাকিলে সেই প্রকার শরীরস্থ তাবৎ ধাতুকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। অতএব দোষের সঞ্চয় মাত্র তাহা শান্ত করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দোষ সঞ্চিত হইলে দেহ ভার ও পীতবর্ণ, উদর স্তব্ধীভূত, ক্ষুধাহানি, ও দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস হয়।

দোষ সকল প্রকৃতিস্থ থাকিলে মানবগণের শক্তি, সৌন্দর্য্য, সুখ, স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

রক্ত।

"দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ॥"

দেহের মূল রক্ত। রক্তের উপর জীবের জীবন নির্ভর করে। রক্ত ব্যতীত

দেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। সমস্ত ধাতুর ক্ষয় বৃদ্ধি রক্তজন্য। অতএব এই রক্তকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করা উচিত।

রক্তের স্থান হৃদয় ও প্লীহা। রক্ত ঐ দুই স্থান হইতে দেহের সমস্ত শোণিত ক্রিয়ার সহায়তা করে।

দিবানিদ্রা, অভিঘাত, অগ্নিমান্দ্য, নিরন্তর দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, পরিশ্রম, অযোগ্য পান ভোজন, অক্ষুধা সত্বে আহার ও অগ্নিসন্তাপ ইত্যাদি কারণে রক্ত কুপিত হয়। রক্ত কুপিত হইলে উহা উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান হইয়া উঠে; এবং ব্রণ, কুষ্ঠ, চক্রাকার কণ্ডু, নীলিকা, তিল মুখদৌর্গন্ধ, বীসর্প, ক্ষুধা নাশ, শক্তিহীনতা, অরুচি, শিরঃপীড়া, ক্লান্তি, ক্রোধাধিক্য, স্বরভঙ্গ, নিদ্রাবাহুল্য, চুলকনা, ছুলী, খোস, প্লীহা, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অঙ্গমর্দ্দ, প্রদর ও রক্তপিত্ত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ সমুৎপন্ন হয়।

রক্তের সহিত পিত্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীরস্থ আহারজনিত অবিকৃত রস, পিত্ত কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে কথিত হয়। যে যে কারণে পিত্ত কুপিত হয় রক্ত ও প্রায় সেই সেই কারণে কুপিত হইয়া থাকে।

অকুপিত রক্ত ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় লোহিতবর্ণ, তরল এবং বিবর্ণরহিত। বায়ুকুপিত রক্ত, ফেণাযুক্ত, তরল, শীঘ্রগামী, অরুণ, কৃষ্ণ অথবা বিবিধবর্ণবিশিষ্ট। পিত্তকুপিত রক্ত নীল, পীত, হরিত অথবা পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, অপক্কমাংস-গন্ধযুক্ত, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর এবং ঘনত্ববিহীন। কফকুপিত রক্ত গেরীমাটীর জলের মত বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ শীতল, পিচ্ছিল, প্রবাহশীল ও বহুক্ষণস্রাবী এবং দেখিতে মাংসপেশীর ন্যায়। স্বয়ং দূষিত রক্ত পিত্তকুপিত রক্তের ন্যায় ও অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। ত্রিদোষ কুপিত রক্ত উপরি উক্ত সমস্ত প্রকার লক্ষণ যুক্ত, বিশেষতঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্ত কুপিত হইলে যাহাতে উহা সত্বর সম্যকরূপে বিস্রাবিত হয় তৎপক্ষে বিশেষ মনযোগ প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক। বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা কুপিত রক্ত উত্তমরূপে স্রাবিত হইলে দেহের লঘুতা, মনের প্রসন্নতা ও রোগের উপশম হয়।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালার কবি ও কাব্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাবের বিপর্য্যয় অনুসারে আমাদের হৃদ হাস্য বা করুণ বীর বা ভয়ানক রসে অপ্লুত হইয়া যায়। এখন দেখ যাইতেছে যে, প্রকৃত জগতে যে কথা গুলিতে হৃদয় গলিয়া গেল, মনে কোন প্রকার রসের অবির্ভাব হইল কাব্যজগতে সেই কথা গুলিতে মনে ঠিক্ সেই রকম রসের উদয় হইতে পারে না। বরং ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হয়, পাঠকহৃদয়ে ঠিক তাহার বিপরীত ফল দর্শে। কাব জগতে কবির মস্তিষ্কের পরিচালনাশক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই কাব্য জগতে প্রকৃতি ও কল্পনাকে এই রূপে মিশ্রিত করিতে হইবে যে, সেই মিশ্রণের প্রভাবে পাঠকের হৃদয় কবির হৃদয়তন্ত্রের সহিত এক হইয়া তালে তালে বাজিতে থাকিবে, এবং তাহা হইলেই "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এই কথায় সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। কবি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাস্যের শোকে কমলাকে "ওরে বাবারে! আমার প্রাণের রোহিতরে!" ইত্যাদি বলিয়া কাঁদাইয়াছেন বটে কিন্তু আর্থারের শোকে মহাকবি সেক্সপীয়র কন্স-টান্সকে ওরূপ কাঁদান নাই। কন্সটান্স যখন মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া হৃদয়ের এক একটি জ্বলন্ত মর্ম্মভেদি বাক্য জগতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কোন্ পাঠকের হৃদয় শোকে দ্রবীভূত না হইয়া যায়? কন্সটান্স বলিলেন—

No, I defy all counsell, all redress,
But that which ends all counsell, all redress
Death, death! O amiable lovely death!
* * * Misery's love,
O come to me * * * *
O that tongue were in the thunder's mouth

কল্পনা।

Then with a passion would I shake the world,
And rouse from sleep that fell anatomy,
Which can not hear lady's feeble voice!
O Lord! my boy, my Arthur, my fair son,
My Life, my joy, my food, my all the world,
My widow-comfort, my sorrow's cure.

—ইহাকেই বলে কবি-কল্পনা। কল্পনা ব্যতিরিক্ত কবিত্ব কোথায়? এমন কি, সম্মুখস্থ শিরীষপুষ্পটিকে কল্পনার চক্ষে না দেখিলে, কল্পনাপ্রভাবে বর্ণনা না করিলে, কবির সেই কমনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিরীষ পুষ্প বর্ণনার সহিত এক জন উদ্ভিদ্‌বেত্তার সেই পুষ্পের বর্ণনায় কোন প্রকার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু এইরূপ প্রভাব ও কল্পনার মিশ্র উপাদানে কবিতা রচনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই দুই উপাদানের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিলে কখনই সামঞ্জসীভূত ভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না। এবং ঐ উভয়বিধ উপাদান সম্যকরূপে মিশ্রিত না হইলে তাহাদের উভয়ের সমবায়ে যে কি এক ভয়ানক—কি এক অদ্ভুত বস্তু সৃষ্টি হয় তাহার একটি উদাহরণ আমরা পাঠক সমীপে প্রকাশ করিতেছি। যখন বৈষ্ণবচূড়ামণি চৈতন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গুপ্ত ভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী তাঁহার জন্য বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন; এবং সেই উপলক্ষে একজন "অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন" কবি লিখিয়াছেন—

"ডাকেন জননী, নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই,
ডাকিছেন যত,
শোকসিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে কোথারে নিমাই
গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে,
ভাবেন জননী
আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে!"

প্রতিধ্বনির এরূপ বাক্‌চতুরতা দেখিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইবে? কে না "নিমাইয়ের" মাতার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, প্রতিধ্বনিকে প্রশংসা করিবে? এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে কার না হৃদয়ে বট্‌লরের হুডিব্রাসের কথা সহজেই মনে পড়িবে—

Quoth he, oh whither wicked Bruin
Art thou fled to my—Echo "Ruin"
Think'st thou 't will not be in the dish
Thou turn'dst thy back? (Quoth Echo) pish,
To turn from those thou wouldst overcome
Thus cowardly? (Quoth Echo) Mum!

অনেকে এই কথা বলিতে পারেন, তবে বটলরের সঙ্গে আমাদের বিখ্যাতনামা কবির সঙ্গে প্রভেদ কি? এতদুভয়ের প্রভেদ অতি সামান্য অতি অল্প। বটলর পাঠককে হাসাইব মনে করিয়া হাসাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের কবি পাঠক হৃদয়ে শোকের দীপ্তমান চিত্র অঙ্কিত করিব মনে করিয়া পাঠকের হৃদয়ে ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাব উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন; আমরা তাঁহার নায়িকা চৈতন্যজননীর দুঃখে কাঁদিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলি। এক্ষণে সাহিত্যদর্পণকারের মতে ইহাদের মধ্যে যে কে সুকবি তাহা বোধ হয় আর পাঠকসমীপে ব্যক্ত করিতে হইবে না। কল্পনাময় ভাবের কথা দূরে থাক্ কল্পনার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ একটি মাত্র কথাতে কবিতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইতে পারে। "নির্ব্বাসিত সীতার" সীতা বনে বসিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"বিনা দোষে বৰ্জ্জিলেন বিপিন মাঝার,
কোথা নাথ! কোথা প্রেম, সব ফক্কিকার!"

আর একটি।—

সুখের শৈশবকাল, কৈশোর প্রমোদ,
প্রেমের সঞ্চার সুখ, পতির মিলন,
সেই নির্ঝরিণীতীর, সেই সম্ভাষণ,
পৰ্ব্বত শিখর দেশ, পাষাণে আমোদ

পরিণয়, ভালবাসা দম্পতি-প্রণয়,
পতির বিচ্ছেদ জ্বালা ছুরিকার প্রায়—
একে একে সব মনে হইল উদয়,
ঝরিল একটি অশ্রু না জানি কোথায়।"

দুইটি কবিতায় দুই কথায় বাক্‌দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে। প্রথমটিতে "ফকিকার" ও দ্বিতীয়টিতে "ছুরিকার প্রায়"। এরূপ প্রকার সমালোচনা করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য পরিত্যাগ করিলাম। তবে কবিতার লক্ষণ পাঠকসমীপে বিশদ রূপে বুঝাইবার জন্য আমরা সময়ে২ ঐরূপ অনেক কবিতার আকৃতি ও মর্ম্ম পাঠকসমীপে উপঢৌকন দিয়াছি। আবার দেখুন "বিষবৃক্ষের" সূর্য্যমুখী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া নগেন্দ্র নাথ যখন শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিষণ্ণভাবে উপবেশন করিলেন; শ্রীশচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্যমুখী কোথায়?" নগেন্দ্রনাথ স্বর্গ নরক বিশ্বাস না করিয়াও আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "স্বর্গে!" এই একটি কথাতে নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীরতা, পবিত্রতা, মহান ভাব এককালে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যদর্পণ-কারের মতে কোন কবিতা রচনা করিতে হইলে প্রত্যেক ভাব ও কথাটির উপর পর্য্যন্ত ও বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা আগামীবারে বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের পূর্ব্বেই বলা উচিত আমরা কোন নিয়মের বা পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকদিগের একচোকো সমালোচনার বশবর্ত্তী হইয়া সমালোচনা করিব না। এ কথা বলিবার কারণ আর কিছুই নয় কেবল বঙ্গভাষার আধুনিক কাব্যের সংখ্যা— উত্তম বা অধম যাহাহউক না—এত অধিক হইয়াছে যে এক জনের সমস্ত জীবন বা স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াও বোধ হয় তাহা পাঠ করা বা ক্রয় করা অসম্ভব। আমাদের দেশ ইংলণ্ড নহে যে গ্রন্থকারেরা এই রূপ প্রকার সমালোচনার জন্য সমালোচকদিগকে স্বরচিত পুস্তক দিয়া সাহায্য করিবেন।

আমরা আগামীবারে মাইকেল মধুসূদনের পুস্তক গুলির একে একে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ক্রমশঃ

আর্য্য চিকিৎসা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(চিকিৎসকের অঙ্গ।)

চিকিৎসার অঙ্গ চারিটী।—চিকিৎসক, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ দ্রব্য। এই কয়েকটীর কোন একটীর অভাবে চিকিৎসা কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। নিম্নে প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত দোষ গুণ লিখিত হইতেছে।

(১) চিকিৎসক।

যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে চিকিৎসক বলে। চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায় ভিষক্, বৈদ্য ইত্যাদি।

চিকিৎসক তিন প্রকার।—ছদ্মচর, সিদ্ধসাধিত ও বৈদ্যগুণ যুক্ত।

যাহারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যল্প ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চিকিৎসকের ন্যায় নানা প্রকার ঔষধাধার সংগ্রহ করিয়া বৈদ্যোপাধি গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ছদ্মচর বলে। ছদ্মচরেরা দ্রব্যের গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশয়, মর্ম্ম, শিরা, অস্থি, সন্ধি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্য সমূহের বিভাগ, অদৃশ শল্যের উদ্ধার প্রণালী, সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগ সমস্তের উৎপত্তির কারণ, পূর্ব্বরূপ ও লক্ষণ এবং দেহের মধ্যগত অন্যান্য সূক্ষ্ম২ বিষয় সকল অনেক সময় চিন্তা দ্বারা উত্তমরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এবং অনেক স্থলে আদৌ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক করিয়া কোন রূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে সক্ষম হয় না।

এই রূপ চিকিৎসকের সংখ্যা আজ কাল অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। প্রকৃত চিকিৎসক প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না।

যাহারা আত্মমুখে মিথ্যা আপনাদিগের বিদ্যা ও সুচিকিৎসকতার পরিচয় প্রদান করিয়া রোগাক্রান্ত আতুরদিগকে নানা প্রকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে; এবং আপনাদের মূর্খতা ও অদূরদর্শিতা ঢাকিবার জন্য সভয়ে সর্ব্বদা পরের দোষকীর্ত্তন ও ছলানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়;

প্রণিধান পূর্ব্বক কখন কোন চিকিৎসার কথা শুনে না; চিকিৎসা দেখে না; ঔষধাদির গুণ ও মাত্রা জানে না; চিকিৎসার অবসর বুঝে না; এবং সামান্য পীড়ায় মহৎ কর্ম্ম, ও গুরুতর পীড়ায় সামান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিত বলে।

সিদ্ধসাধিত চিকিৎসকগণ বায়ুপায়ী সর্পের ন্যায় অতি ভয়ানক প্রকৃতির জীব। ইহারা সাক্ষাৎ যমদূতস্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করে। ভ্রমান্ধ হইয়া যে সকল রোগী ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হয়। দুরন্ত দস্যুর হস্তে, ঘোরতর মরুভূমিতে, কিম্বা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুসমাকুল ভীষণ অরণ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াও বরং সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর; কিন্তু ঈদৃশ অনধীতশাস্ত্র হস্তিমূর্খ, ধনপিশাচ, অর্থগৃধ্নু, অনভ্যস্তকর্ম্মা, ধর্ম্মবর্জ্জিত, আত্মাভিমানী দুরাত্মা যমতুল্য মূঢ় চিকিৎসকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। ইহারা অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও রোগীর কিছুমাত্র উপকার হয় না।

যাঁহারা গুরুর নিকট হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেক চিকিৎসা করিয়াছেন, অন্যকৃত চিকিৎসা অনেক দেখিয়াছেন; অপিচ—শুদ্ধবংশজাত, নির্ম্মলচরিত্র, জিতহস্ত, শুচি, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বোপকরণসামগ্রীসম্পন্ন, দেশকাল বিচারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, সত্যপরায়ণ, সন্দেহশূন্য, সকল প্রাণীর প্রতি পরম কৃপালু, বিনয়গুণবিশিষ্ট ও বীরভাবাপন্ন; এবং যাঁহারা প্রাণান্তেও কখন আতুরকে কষ্ট দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অর্থ দোহন করেন না; রোগীকে পুত্রবৎ বিবেচনা করিয়া তাহার রোগ প্রতিকারার্থে সতত অকপট হৃদয়ে যত্নশীল থাকেন, আতুর কুলের কোন গোপনীয় কথা কখন অন্যত্র প্রচার করেন না, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্যাসী, আশ্রিত, সাধু ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে স্বীয় ব্যয়সাধ্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করেন, তাঁহাদিগকে বৈদ্যগুণযুক্ত বলে।

ঐরূপ চিকিৎসকগণকে নিত্য নমস্কার। তাঁহারা ইহলোকে মিত্র, যশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া পরলোকে পুণ্যাত্মারূপে সুকৃতিদিগের উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

২। রোগী।

যাহার রোগ হইয়াছে, তাহাকে রোগী বলে। রোগী দুই প্রকার।—সুচিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য।

যে সকল রোগী ধৈর্য্যশীল, রোগের অবস্থা সুচারুরূপে বলিতে পারে, বৈদ্যের মতানুগামী, ধনবান্, আস্তিক, বন্ধুবলসম্পন্ন, সাধ্যরোগাক্রান্ত ও আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাসযুক্ত তাহারা সুচিকিৎস্য। স্বধর্ম্মত্যাগী, ক্রোধশীল, রোগগোপনকারী, অতি ব্যগ্র, পতিত, রাজদ্বেষী, ভীত, অহিতাচারী, শোকাভিভূত, ঘৃণারহিত, পাপাশক্ত, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, বৈদ্যনিন্দুক, অত্যন্ত কৃপণ, চিকিৎসার উপযুক্ত উপকরণ সামগ্রী বিহীন ও অসাধ্য রোগাক্রান্ত যে সকল রোগী, তাহারা অচিকিৎস্য।

অচিকিৎস্য রোগীর চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। তাহাদিগের চিকিৎসা করিলে, প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না। কেবল অযশঃ ও বহুবিধ দোষই প্রাপ্ত হইতে হয়।

৩। পরিচারক।

যে ব্যক্তি রোগীর সেবা সুশ্রূষায় রত থাকে, তাহাকে রোগীর পরিচারক বলে। যে সকল ব্যক্তি সকল কর্ম্মে পটু, বৈদ্যের আজ্ঞাপ্রতিপালক, রোগীর পরিচারণায় সতত অবহিত, বুদ্ধিমান, বলবান ও নির্ম্মলচরিত্র সেই সকল ব্যক্তি রোগীর পরিচারক হইবার যোগ্য। অন্য লক্ষণ যুক্ত পরিচারকের সাহায্য লইলে রোগীর বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

৪। ঔষধ দ্রব্য।

দ্রব্য ত্রিবিধ।—জঙ্গম, উদ্ভিদ ও ভৌম।

যে সকল দ্রব্য জঙ্গম পশ্বাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে জঙ্গম; যে সকল দ্রব্য মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহদিগকে উদ্ভিদ; ও যে সকল দ্রব্য ভূমি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগকে ভৌম বলে। সচরাচর রোগ নিবারণ জন্য জঙ্গম হইতে মধু, দুগ্ধ, পিত্ত, বসা (চরবি), রক্ত মাংস, মজ্জা, অস্থি, চর্ম্ম, বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, শিরা, শৃঙ্গ, নখ, খুর, কেশ ও লোম, এই কয়েকটী দ্রব্য; ভৌম হইতে স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, রঙ্গ,

খর্পর, মুক্তা, শিলাজতু, হরিতাল, রৌপ্য, মনঃশিলা, হীরকাদি, গৈরিক, রসাঞ্জন, ও লবণ ইত্যাদি ; এবং উদ্ভিদ হইতে মূল, ছাল, কাষ্ঠ, রস, আটা ডাঁটা, কিশলয়, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, কণ্টক, পল্লব ও নামনা ইত্যাদি দ্রব্য গৃহীত হইয়া থাকে।

এইরূপ দ্রব্য সমুদয়কে ঔষধ দ্রব্য বলে।

ঔষধ দ্রব্য সকল শুদ্ধ শরীরে, প্রশস্ত দিবসে ও ঋতু বিবেচনা করিয়া খনন, উৎপাটন ও গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়। এবং অনেক সময় তাহাদের গুণে ও লুক্কায়িত শক্তি দ্বারা নানা প্রকার অদ্ভুদ ও অসম্ভাবনীয় ক্রিয়াদি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উদ্ভিদের মূল, বর্ষা ও বসন্তে পত্র, শরৎ কালে বল্কল, কন্দ ও ক্ষীর এবং হেমন্তে সার গ্রহণীয়। পুষ্প ও ফল যে যে ঋতুতে জন্মে, সেই সেই ঋতুতে সংগ্রহ করিতে হয়।

পশ্বাদির নখ ও লোমাদি গ্রহণ করিতে হইলে, যখন তাহাদের ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে জীর্ণ হয়, ও কোন রোগ না থাকে, সেই সময় গ্রহণ করা বিধি।

জলজীর্ণ, অগ্নিদগ্ধ, কীটভক্ষ্য, ও অকালজাত দ্রব্য ; এবং বল্মীক, কূপ, পথ, তরুতল, দেবালয় ও শ্মশান ইত্যাদি স্থানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই সমুদয় দ্রব্য ঔষধার্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবিধেয়। সে সকল দ্রব্য রীতিপূর্ব্বক সংগৃহীত হইলেও ফলদায়ক হয় না।

দূত ও ধন।

চিকিৎসা কার্য্যে দূত এবং ধন, এই উভয়ের অনেক সময় বিশেষ আবশ্যক হয়। এজন্য অনেকে এই দুইটীকেও চিকিৎসার অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি চিকিৎসককে আনয়ন করিবার জন্য গমন করে তাহার নাম দূত। এবং যে পদার্থকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া অন্য সকল প্রকার পদার্থের বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে ধন বলে।

রোগী, বৈদ্য, পরিচারক ও দূত সকলেরই ধন আবশ্যক। ধন ব্যতীত কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা হয় না।

প্রজ্ঞাবর্ম্মণ।

পূর্ব্বকালে রোম গ্রীশ, ব্যক্ত্রিয়া, চীন, তাতার, জাপান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহ হইতে প্রাজ্ঞপ্রবর ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিতেন। তন্মধ্যে চীন এবং গ্রীশ দেশীয় পর্য্যটকগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতীয় আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার অবলোকন, সমাজের গতি নিরীক্ষণ এবং ভারতীয় শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মহাশয়গণ স্বদেশে প্রতি-প্রয়াণ করিয়া ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে এক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বিরচণ করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থকে ভারতীয় অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের মূল-গ্রন্থি বা অস্থি বলিলেও বলা যায়। ভারতের ইতিহাস এক্ষণে পূর্ব্ব-স্মৃতির ধ্বান্তময়ী কন্দর-চুল্লী মধ্যে নিহিত, সুতরাং এক্ষণে ভারতের ইতি-হাসের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিতে গেলে গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক। গ্রীশ এবং চীন দেশীয় প্রাচীনতম পর্য্যটকবৃন্দের সারগর্ভ এবং নিরপেক্ষ গ্রন্থরাজি এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, সুতরাং এই সকল পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লইয়া যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই প্রত্নতত্ত্বের পথ প্রশস্ত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিবে। আমরা অদ্য একজন মাত্র চৈণিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত দিলাম; বারান্তরে অন্যান্য পর্য্যটকের বিবরণ বিবৃত হইবে।

আমরা অদ্য যাঁহার বিষয় আলোচনা করিতেছি, ইহাঁর নাম হুই-লণ, ইনি একজন ব্যবহারজীবি। সিঙ্কো অর্থাৎ কোরিয়া ইহার জন্মস্থান। ভারতবর্ষে ইনি প্রজ্ঞাবর্ম্মণ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। হুই-লণ বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী ছিলেন; তিনি প্রথমে পুক্ষীণ, লোয়াং, শিংকী প্রভৃতি স্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অমরাবৎ নগরে (বর্ত্তমান মোরাদাবাদ) উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে দশবৎসর কাল বাস করিয়া তিনি উত্তর ভারতান্তর্গত ট-হো-লো-সো মন্দিরে গমন করেন। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী চৈণিক পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ

মহাত্মা ট-হো-লো-সো বৌদ্ধদিগের হিতার্থ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চৈণিক বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বাস করিলে বিনা ব্যয়ে আহার ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে ঐ মন্দিরকে কেহ কেহ "গান্ধার যন্দ" কহিয়া থাকেন; প্রজ্ঞাবর্ম্মণ এই মন্দিরে থাকিয়া উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই মন্দিরে সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাস করিতেন, সুতরাং ইহাকে কেহ কেহ বিদ্যামন্দির (Temple of Learniug) বলিয়া উল্লেখ করিত। কপিশা, চালুক, গণচরিত নামে আর কয়েকটি মন্দির ইহার নিকটে ছিল, অদ্য পর্য্যন্ত তাহাদের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়*।

কথিত অছে প্রজ্ঞাবর্ম্মণ দুইবার ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু কোন্ সময়ে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন, তাহা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে টট্‌শীন্ প্রণীত কিউ-ফা-কো-সান্-চুয়ং নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠে অতিকষ্টে অনুমান করা যায় যে, প্রজ্ঞাবর্ম্মণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়াছিলেন; এ কথা সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি। যাহা হউক, প্রজ্ঞাবর্ম্মণ ৩ বৎসর কালমধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) নগরে গমন করেন। তৎকালে তমলুক সহর সংস্কৃত শিক্ষা এবং অন্তর্বাণিজ্য জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। প্রজ্ঞাবর্ম্মণ ৫ মাস কাল তমলুকে বাস করিয়া সিংহল গমন করেন, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার এবং "সিংহল ভ্রমণ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তথা হইতে ভারতে পুনরাগমন করিয়া ইন্দ্রস্বাহা পুরীর বিখ্যাত নরপতি দেবেন্দ্র সেনের সহিত বন্ধুতা স্থাপন এবং অবশেষে রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎকালে ইন্দ্রস্বাহা পুরীর বিভব সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবর্ম্মণ লিখিয়াছেন "এই রাজা যুবা পুরুষ, বয়স ২৭ বৎসর মাত্র। বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায়; মুখমণ্ডল সুগোল এবং কমনীয়। এই নগরীতে সহস্র সহস্র বিদ্যামন্দির এবং সহস্র সহস্র ধর্ম্মমন্দির আছে; রাজা সত্যবাদী, শিক্ষিত, বলবান

* Vide Indian Antiquary. P. 110 of April, 1881.

এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী। প্রজারা ধনী এবং সুখী ; দস্যুরা দেশত্যাগ করিয়াছে, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমি নিজে রাজাকে দীক্ষিত ও উপদিষ্ট করিলাম।" দুঃখের বিষয় এই যে, এই পুরী কোথায় তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাবর্ম্মণ সস্ত্রীক এদেশে আসিয়াছিলেন, ইন্দ্রস্বাহা পুরীতে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুহাসিনী।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকে প্রেমিকে।

"তুই ভাব মনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে।"

ব্রজাঙ্গনা

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিয়াছিল। ছাদের উপর বসিয়া দুইটি বালিকা সেই অসংখ্য তারকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া ছিল। বুঝি, সে উজ্জ্বল-মধুর সৌন্দর্য্যবিস্ফারিত চাহনির নিকট অনেক তারা হারি মানিতেছিল ; বুঝি, সেই জন্যই থাকিয়া থাকিয়া এক একটি তারা নীল সমুদ্রে ডুবিতেছিল—ভাসিতেছিল—আবার ডুবিতেছিল। সন্ধ্যা যাইয়া রাত্রি আসিল। প্রথম প্রহরের ঘণ্টা বাজিল। তখন ও বালিকারা সেই ভাবে বসিয়া। কেন তাহারা তেমন করিয়া বসিয়াছিল তাহা তাহারা জানে না। হৃদয় প্রবল চিন্তা-স্রোতে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, শূন্য-মনে উদাস প্রাণে একদৃষ্টে তারা দেখিতেছিল।

অনেক ক্ষণ পরে সুহাসিনী বলিল—"দিদি, মানুষ মরিলে নাকি তারা হয়?"

প্রশ্ন শুনিয়া গিরিবালা বিস্মিত হইল। বলিল—"কেন, দিদি?"

সু। আমি শুনিয়াছি, কেহ কেহ মরিয়া তারা হয়।

গি। সত্য বটে ; কিন্তু সে কি আর যে—সে সকল মানুষে হয়।

সু। দিদি, আমি যদি মরি?

গিরিবালা অধিকতর আশ্চর্য্য হইল, একবার সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বালিকার সরল মূর্ত্তি ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হইল না। বলিল —"ছিঃ অমন কথা মুখে আনিতে আছে কি!"

অতি কাতর স্বরে সুহাসিনী বলিল—"কেন, দিদি, মরাইতো এখন আমার পক্ষে মঙ্গল। তবে, শুনিয়াছি, মরিয়া যাহারা নক্ষত্র হয় তাহারা যাহাকে ভালবাসে——" বালিকা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না; অশ্রুবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আবার আশ্চর্য্য হইয়া গিরিবালা সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সেই আয়ত ইন্দীবরতুল্য চক্ষুর্দ্বয় হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতেছে; বালিকা কাঁদিতেছে। গিরিবালাও বালিকা, কিন্তু বালিকা হইলেও, শৈশব হইতে দুঃখের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে বলিয়া সে লোকের দুঃখ বুঝিত। গিরিবালা সুহাসিনীর দুঃখ বুঝিল। বুঝিল, তাহার কোমল হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু গিরিবালা যখন বুঝিল যে, সে আঘাত সেই দিয়াছে তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। আপনার অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিল। "হায়। আমি অভাগী কেন মরিলাম না?" —কয়েকটি অনুচ্চ কথার সহিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সে নৈশবায়ুতে মিশাইল; গিরিবালা কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সুহাসিনীকে দুইটী বাহু দিয়া জড়াইয়া বলিল—"দিদি আমার, চুপ কর, তোমার কিসের দুঃখ, তুমি কাঁদিবে কেন?"

সুহাসিনী কথা কহিল না, সেই ভাবে কাঁদিতে লাগিল। গিরিবালা মনে মনে ভাবিল—"হায়! কেন মরণ হইল না? শৈশবে একবার জলে ডুবিয়াছিলাম, মরণ হয় নাই, সে দিন ও মরিতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু মরণ হইল কৈ? বিশ্বেশ্বর! এ অখণ্ড পরমায়ু কিসের জন্য? কিসের জন্য পাপিনীকে চরণে স্থান দিলে না, দয়াময়? আহা, তখন যদি মরিতাম। সে কত সুখের মরণ—মনে করিলেও বুকখানা যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে প্রাণের ভিতরে যেন কত সুখের তরঙ্গ ছুটিয়া বেড়ায়—মাথার উপর সেই জ্যোৎস্না-ধৌত নীল আকাশ, দক্ষিণে বিশ্বেশ্বরের উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি, বামে

দেব সরোবরের সেই চন্দ্ররশ্মির সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে করিতে মধুর লহরী লীলা, সম্মুখে হৃদয়-দেবতা ইহলোকের সর্ব্বস্ব স্বামী দণ্ডায়মান—আহা, সে কত সুখের মরণ! সেই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সেই চরণ ধ্যান করিতে করিতে মরার চেয়ে আর সুখ আছে কি? আমি অভাগী কেন মরিলাম না? কেন বাঁচিলাম? আবার কেন লোকালয়ে এ পোড়ামুখ দেখাইলাম? এ সোণার কমল কেন আমার উষ্ণ নিশ্বাসে সন্তাপিত করিলাম? বালিকার কোমল হৃদয়ে কেন ব্যথা দিলাম? কেন মরিলাম না?" মাথা ঘুরিতে লাগিল, গিরিবালা আর ভাবিতে পরিল না। অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল।

এক্ষণে পূর্ব্বের কথা কিছু বলা আবশ্যক। বিনোদের নিকট হইতে পলাইয়া সে রাত্রে সুহাসিনী যখন সেই উদ্যান বাটীকার ভিতরে প্রবেশ করে, মালতী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ঘাটের উপর কে একজন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে কথা শুনিয়া বালিকার স্বাভাবিক কোমল হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুহাসিনীর সে ভয় অন্তর্হিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে মালতীকে সঙ্গে লইয়া বালিকা সেই সরোবরে চলিল। দেখিল, বুঝি, স্বয়ং সতী কৈলাস ছাড়িয়া পতির জন্য সেইখানে আসিয়াছেন, রূপে সরোবর উজলিতেছে, একটি ছিন্ন কুসুম ধুলার উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, অজ্ঞানাবস্থায় একটি বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। অতি যতনে সুহাসিনী সে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। তার পর দাস দাসী ডাকিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া বাটী লইয়া চলিল। গিরিবালা আজ প্রায় এক মাস হইল, সুহাসিনীর বাটীতে রহিয়াছেন। সুহাসিনী গিরিবালাকে সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিত, গিরিবালাও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত। এত যে কষ্ট সুহাসিনীর ভালবাসায় তাহাও অনেক সময়ে মনে থাকিত না। কিন্তু তথাপি গিরিবালার প্রকৃত সুখ ছিল না। গিরিবালা প্রত্যহই ভাবিত। এখন তাহার প্রধান চিন্তা—কেমন করিয়া মরিতে পাইবে, এবং মরিবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া একবার স্বামীর মুখ দেখিয়া মরিতে পাইবে; কিন্তু সুহাসিনী ভিন্ন তাঁহার সুখ হইবে না, হইতে পারে না। অতএব সুহাসিনী যাহাতে তাহার স্বামীর হয় তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করিত। ইচ্ছা

করিত, কিন্তু পাছে সুহাসিনী কিছু মনে করে এ জন্য কিছু ফুটিতে পারিত না। সুহাসিনী কতদিন তাহাকে তাহার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিত; গিরিবালা কাঁদিত, কিছু বলিত না। আজ বড় পীড়াপীড়ি করিলে গিরিবালা আপনার দুঃখের কাহিনী সকল বলিয়াছিল। সেই সময় একবার ভাবিয়াছিল—"একবার বলিয়া দেখি না কেন? এতদিন ধরিয়া যে আশা পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনা হইতেই তাহার সুবিধা হইয়াছে, এই বেলা একবার বলিয়া দেখি না কেন? কিন্তু সুহাসিনী তাঁহাকে কত ঘৃণা করে—সুহাসিনী কি তাঁহাকে ভাল বাসিবে? তবে কেন বালিকার মনে কষ্ট দিব? যে আমাকে প্রাণে বাঁচাইল কেমন করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত দিব? কিন্তু তাহা হইলে হইল কৈ? সুখ—আমার আবার সুখ কি? তিনি সুখে থাকিলেই আমার সুখ। স্ত্রী হইয়া যদি স্বামীব সুখ সাধিতে না পারিলাম তবে তাঁহার আমি কিসের স্ত্রী? একবার তাঁহার সুখের চেষ্টা করিয়া দেখি, একবার সুহাসিনীকে বলি। কিন্তু-সুহাসিনী চারুকে ভাল বাসে, সে মনে কত ব্যথা পাইবে। আমায় যে-এত স্নেহ করে তার মর্ম্মে ব্যথা দেওয়া কি ধর্ম্মের কাজ? ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিনা—স্বামীর সুখ সাধন ভিন্ন আমি অন্য ধর্ম্ম জানিনা, অন্য ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের বুঝি নাই। তবে একবার বলিয়া দেখি না কেন? কিন্তু—না—" অনেক ইতস্ততঃ করিয়া গিরিবালা আজ সুহাসিনীকে সেই কথা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—"দিদি, তুমি যদি তাঁহাকে ভালবাস।"

অনেক কষ্টে মন বাঁধিয়া গিরিবালা বলিয়াছিল বটে; কিন্তু যখন দেখিল যে, সে কথায় সুহাসিনীর হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে; অথচ বালিকা কিছুই বলিতেছেনা কেবল কাঁদিতেছে আর মরিতে চাহিতেছে; তখন আর স্থির থাকিতে পারিলনা, তাহার মনের দৃঢ়তা দূর হইল; গিরিবালা কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি পোড়ারমুখী কেন মরিতে সে কথা মুখে আনিয়াছিলাম?"

সুহাসিনী বলিল—"দিদি, কাঁদিওনা; তুমি যাহাতে কষ্ট পাও প্রাণ ধরিয়া তাহা দেখিতে পারিব না। আমার জন্য তোমার জীবনের সকল সুখ যাইবে, আমার জন্য তুমি পথে পথে

বেড়াইবে ইহা আমি কেমন করিয়া দেখিব? তাই বলিতেছিলাম, আমি যদি মরি—"

গিরিবালা সুহাসিনীর গালে হাত দিয়া কথা চাপিবার চেষ্টা করিল। বলিল—"আমি না বুঝিয়া তোমার মনে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। বালাই, আমার জন্য তুমি মরিবে কেন? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই; কিন্তু তোমার সুখের পথে কন্টক হইব কিজন্য? দিদি ছাড়িয়া দাও, বনে বনে ভ্রমণ করাই আমার অদৃষ্টের লিখন, আমার এখানে থাকা সাজিবে কেন?" বাস্পাবরুদ্ধকণ্ঠে আর কথা সরিল না; গিরিবালা কাঁদিল।

অতিমাত্র কাতরতার সহিত সুহাসিনী বলিল—"দিদি, আমার সহোদরা নাই। তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইওনা। তোমায় যে আমি ভাল বাসি।" বালিকা গিরিবালার গলা জড়াইয়া ধরিল। স্বাভাবিক কোমল হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। সুহাসিনীর বক্ষে মাথা রাখিয়া গিরিবালা কেবল কাঁদিতে লাগিল।

তখন সুহাসিনী একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"বিশ্বেশ্বর! শুনিয়াছি তুমি নাকি দয়াময়; কিন্তু এ কেমন বিচার, ঠাকুর! পুণ্যের কি পুরস্কার নাই? পতিব্রতা ধর্ম্ম কি পুণ্যব্রত নয়? আমি অসৎ অনক্ষর জ্ঞানহীন তোমার অনন্ত মহিমা কি বুঝিব? কিন্তু একজন জনমদুখিনী বালিকার প্রতি এত শাস্তি কেন? প্রভো! করুণা কর, বিনোদ বাবুর মতি গতি ফিরাইয়া দাও। তুমিও তো, দেব সতীপতি; তোমার সম্মুখে সতীর এত কষ্ট কেন, দয়াময়!" সুহাসিনীর কথা কাতরতাপূর্ণ, আধিব্যক্তিব্যঞ্জক তাহার প্রত্যেক শব্দ সহানুভূতিমাখান।

গিরিবালা মাথা তুলিল না, সেই ভাবে কাঁদিতে লাগিল। সুহাসিনী আবার বলিল—"দিদি, কাঁদিও না; সত্যবটে, আমরা স্ত্রীজাতি রোদন ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় নাই। কিন্তু রোদনে কি ফল হইবে বল? এবার একবার বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে আমি তাঁহাকে কাঁদিয়া সমস্ত জানাইব, মিনতি করিব, পায়ে ধরিব; তবুও কি দয়া হইবে না? পুরুষজাতি কি এতই নিষ্ঠুর!"

কথাগুলি গিরিবালার কানে গিয়া পশিল, বড় রৌদ্রে কে যেন এক

বিন্দু বারি সিঞ্চন করিল। অবাক হইয়া গিরিবালা আর একবার সুহাসিনীর প্রতি চাহিল। সে বালিকামূর্ত্তি আর নাই, সে মূর্ত্তি অতি স্থির গম্ভীর; নয়নে কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জ্বলিতেছে। গিরিবালা বিস্মিত হইল। ভাবিল, বিনোদ ভিন্ন তাহার যেমন স্পৃহনীয় আর নাই, চারুর চিন্তা ভিন্ন সুহাসিনীর ও সেইরূপ এ পৃথিবীতে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলম্বন।

" যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে,
আশায় নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে।
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলো হ'তে পারে কাল।"

নবীন তপস্বিনী।

বহুমূর্ত্তিমতি অনন্তলীলাময়ি প্রকৃতি! মা, তোমার কেমন রূপ! জড় অজড় সকল পদার্থেই তোমার অবস্থিতি, এ পৃথিবীর সর্ব্বভূতে তোমার চির বিরাজ; কিন্তু কখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তোমার রূপ কেমন। বাহিরের জড় পদার্থ লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কত নূতন মূর্ত্তি ধরিতেছ, কত খেলা খেলিতেছ; কখন কাহাকে ভাঙ্গিতেছ, কখন কাহাকে গড়িতেছ; কখন কাহাকে সৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্টি-কৌশল দেখাইতেছ, আবার কখনবা পরক্ষণেই তাহার লয় সাধিয়া নিজের প্রভুত্ব ঘোষণা করিতেছ। জড়পদার্থ ছাড়িয়া জীব-হৃদয়ে যখন উপগত হও, তখন ও তোমার সেই বহুরূপ, সেই নিত্য-নূতন মূর্ত্তি, সেই একই লীলা। কখন ও কাহাকে কতকি দিয়া সাজাইতেছ, কখনবা কাহার ও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতেছ; কখন কাহাকে হিমালয় হইতে উচ্চ স্থানে তুলিতেছ, আবার কখনবা পরক্ষণে অতল সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিতেছ। লীলাময়ি! এ অনন্ত লীলা কে বুঝিবে, মা?

আজ এক সপ্তাহ হইল, অতি আশ্চার্য্যরূপে গিরিবালার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গিরিবালা এখন খায়, শোয়, কথা কয়, একটু বা হাসে। গিরিবালা ভাবে, কিন্তু আর তত কাঁদেনা। পূর্ব্বে তাহার উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য ছিলনা, এখন গিরিবালা উঠিয়া বসিতে পারে। গিরিবালা একটি অবলম্বন পাইয়াছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুহাসিনী তাহার জন্য বিনোদকে বলিবে, বিনোদ সুহাসিনীর কথা অবশ্যই রাখিবে; সুতরাং অভাগিনী আবার সে চরণ দুখানি সেবা করিতে পারিবে। এ সকল কথা যখন সে ভাবিত, মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ দেখিত, আনন্দে যেন বুকের ভিতর প্রাণটা নাচিয়া উঠিত। ক্ষীণ দেহে তত আনন্দ সহ্য হইত না, মাঝে মাঝে গিরিবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইত।

একদিন বৈকালে—কে জানে সুহাসিনী কোথায় গিয়াছিল—গিরিবালা একাকিনী বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে; হঠাৎ শশব্যস্তে সুহাসিনী কোথা হইতে আসিয়া বলিল—"দিদি, একবার এস।"

গিরিবালা জিজ্ঞাসিল—"কোথায় ?"

সুহাসিনী বলিল—"সেই বকুল তলায়। দেখিয়া যাও।"

সুহাসিনীর ব্যস্ততা দেখিয়া গিরিবালা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তার পর সে বকুলতলায় আসিয়া গিরিবালা যাহা দেখিল তাহাতে তাহার দৃষ্টি লোপ হইল; সাগর উছলিয়া উঠিল; অশ্রুজলে চক্ষু পুরিয়া গেল। গিরিবালা দাঁড়াইতে পারিল না, মাথা ধরিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

সুহাসিনী বলিল—"দিদি, একটু শান্ত হও, তুমি অন্তরে থাক, আমি উঁহার নিকটে যাইতেছি।"

গিরিবালা অন্তরে রহিল। সুহাসিনী বিনোদের নিকটে চলিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপবনে।

একান্ত হইয়া কবি অসহায়
নিকুঞ্জের আড়ালে বসিল গিয়া কবি হায় হায়।
চৌদিকে অটবী,
কুসুম সুরভি,
প্রাণ কিন্তু চাহে যারে সে নাহি তথায়।"

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য।

এ সংসারে আসিয়া আপনা ভুলিয়া যে কখন ভাল বাসে নাই, তাহার বৃথায় জন্ম! তাহাকে বিশ্বাস করিও না; সে মনুষ্যের মধ্যে অধম! জানিও, তাহার হৃদয়ে জোয়ার ভাটা নাই, অমানিশার ঘোর অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্লচন্দ্রালোক তাহার হৃদয়গগনে কখন প্রতিভাসিত হয় নাই; পৃথিবীর সুখ কখন সে ভোগ করে নাই। ভালবাসা জীবহৃদয়ে অপার্থিব সামগ্রী।

চারুচন্দ্র ভালবাসিয়াছিলেন—যাহাকে এখন পরস্ত্রী বলিয়া মনে স্থান দিতে কতবার ইতস্ততঃ করিতেছেন তাহাকে এক সময় ভাল বাসিয়াছিলেন; চারুচন্দ্র সুহাসিনীকে এখনও ভালবাসেন। চারুর জীবন এখন মরুভূমির ন্যায়—চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে,—আলয় নাই, আশ্রয় নাই, সহায় নাই, সঙ্গী নাই কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, কেহ তাকাইয়া দেখে না; যেন মহাঝড়ে পাল উড়িয়াছে, মাস্তুল ভাঙ্গিয়াছে, হাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মহাসাগরে এক খানি ভগ্নতরির ন্যায় এ ভীষণ সংসারে একাকী উদাসভাবে বিচরণ করিতেছেন। মানুষের আশা থাকে, চারু তাহাও হারাইয়াছেন। এ অন্ধকারময় জীবনে আর কি প্রয়োজন? চারু অনেক ভাবিল, ঢাকা নগরী হইতে এনাএতউল্লার নিকট বিদায় গ্রহণের পর অনেক চিন্তা করিল। জীবনে যখন আশা নাই, তখন ইহা রাখিয়া কি হইবে? চারু স্থির করিলেন, এ জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। কিন্তু কেমন মন! ভালবাসার কি এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! মুহূর্ত্তের জন্য

হৃদয়ের সুমস্ত ভাব গুলি এক এক করিয়া জাগিয়া উঠিল ; মুহূর্ত্তের জন্য সুহাসিনীর সেই প্রেমসুন্দর মুখমণ্ডল, প্রেমসুন্দর কথা, প্রেমসুন্দর কার্য্য সকল মনে পড়িল। স্মৃতির অনন্ত লীলা! একে একে কতদিনের কত নিদ্রিত ঘটনা জাগাইয়া দিতে লাগিল ; কত দিনের কত কথা মনে পড়িল। সুহাসিনীর সহিত সেই কত প্রাবৃটের বীতমেঘ প্রভাত, শরতের স্নিগ্ধ চন্দ্র-করলেখা, হেমন্তের কুজ্ঝটীরহিত বিমল উষা, শীতের নবীন প্রাতঃসূর্য্য, বসন্তের প্রদোষানিল, গ্রীষ্মের সুখস্পর্শ প্রভাত সমীর—সে ইতিহাসের কে বর্ণনা করিবে? একে একে কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। কতদিন স্নানাহার ভুলিয়া দুইজন দুইজনকে দেখিতে দেখিতে কাটিয়াছে, কতরাত্রি তাহাদিগের গল্প শেষ হইতে না হইতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে, কত সন্ধ্যার বায়ু তাহাদিগের দুইজনের অবচিত ফুলরাশির উপর বহিয়া বহিয়া তাহাদিগের চারিদিকে সৌগন্ধ ছড়াইয়াছে—একে একে সে সকল মনে পড়িতে লাগিল। বিষাদের নিশ্বাসে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, চারু কাঁদিল। আপনি মনে মনে শতবার প্রশ্ন করিল—“সেই সুহাসিনী পরস্ত্রী ইহা কি সম্ভব?” মনে মনে সে প্রশ্নের শতবার উত্তর দিল—“অসম্ভব কেন ভাবিতেছি? বিনোদের সহিত সুহাসিনীর তো সম্বন্ধ অনেক দিন হইতে হইয়াছিল, সেই জন্যই তো আমি তখন দিনাজপুর ত্যাগ করিয়াছিলাম, সতীশচন্দ্র সত্যনিষ্ঠ, কেন তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন?” সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি অবার চিন্তা আনিয়া দিল। সেই যে সেদিন শৈলবালা বলিল, বিনোদের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা কি সত্য? চারুর মাথা ঘুরিতে লাগিল, ঘর্ম্ম বাহির হইল ; আর ভাবিতে পারিল না, আবার সুহাসিনীর সেই প্রেমময় মুখখানি মনে পড়িল। চারু ভাবিল, “শৈলবালা! শৈলবালা তো মায়াবিনী! এত করিয়াও তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কেন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব? আর—যদি সুহাসিনীর বিবাহ না হইয়া থাকে, যদি সুহাসিনী সত্য সত্যই চারুকে ভাল বাসে?” এ কথা চিন্তা করিতে ও চারুর হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। চারু আবার ভাবিল, “সুহাস এক্ষণে পরস্ত্রী, সে সুখে আছে, আমি তাহার সুখের পথে কন্টক নিক্ষেপ করিবার কে?” চারু অনেক ইতস্ততঃ করিল, মন ধৈর্য্য মানিল না,

এক বার সুহাসিনীকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। চারু সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দিনাজপুরাভিমুখে ধাবিত হইল।

বেলা শেষ হইয়াছে। অপরাহ্নসূর্য্যের স্বর্ণকিরণমণ্ডিত বকুল পত্র মর্ম্মরিত করিয়া ধীর বায়ু বিষাদের গীত গাহিতেছে, কয়দিন অবিশ্রান্ত পথভ্রমণের পর ক্ষতবিক্ষত চরণে চারুচন্দ্র সেই দিনাজপুরের উপবনখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কে জানে কেন একেবারে সুহাসিনীর সহিত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না, চারু সেই বড় ভালবাসার বকুলতলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। মনের ভিতর কত চিন্তার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল—কে তাহার গণনা করিবে? একে বহুদিনের অনাহার ও অনিদ্রা তাহার উপর পথভ্রমণজনিত বহুক্লেশ, অবসাদে সমস্ত অঙ্গ ঢলিয়া পড়িল; বস্ত্র পাতিয়া চারু সেইখানে শয়ন করিল। আবার কি চিন্তা আসিল. চারু উঠিয়া বসিল; ইতস্ততঃ কাহাকে খুঁজিল। দূরে পত্রের মর্ম্মরশব্দ হইল,—চারু সেই দিকে ফিরিল—কাহারো সাক্ষাৎ মিলিল না। বক্ষবেপন দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। সুহাসিনীর সহিত আর কি সাক্ষাৎ হইবে না? সেই বকুল বৃক্ষ—সেই উপবন, সুহাসিনী আরকি এখানে ফুল তুলিতে আসে না? সন্ধ্যা হইয়া আসিল—নগরের কত নারী করতোয়া হইতে জল লইয়া গৃহে ফিরিল; সুহাসিনীর কি এখনও আসিবার সময় হয় নাই? তখন সন্ধ্যা না হইতেই দুইজনে সেখানে বসিয়া কত গল্প করিত, কত ফুল তুলিত; এখন বুঝি সুহাসিনী আর আসে না। সুহাসিনী এখন কুলবধূ! আর ভাবিতে পারিল না, চিন্তায় চারু অস্থির হইয়া পড়িল। মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। অবসন্নতা আসিয়া সমস্ত অঙ্গ অধিকার করিল। চারু বৃক্ষে পৃষ্ঠ রাখিয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে স্বপ্ন দেখিল যেন সুহাসিনী আবার সেইখানে আসিয়াছে, বকুল ফুলে মালা গাঁথিয়া তাঁহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বালিকার মালা পরাইতে বড় ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু পাছে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে সাহস করিয়া পরাইতে পারিতেছে না। তাহার অনুরাগের মৃদুল নিশ্বাসে হস্তস্থিত মালা ধীরে ২ দুলিতেছে। চক্ষে যেন দুই এক ফোটা জল বহিতেছে। চারু আর স্বপ্ন দেখিতে পারিল না, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। অবোধ! জান না যে স্বপ্ন

নিদ্রার কুহক! চারু চারিদিকে চাহিল, কিছুই দেখিতে পাইল না, আতিপাতি করিয়া সকল স্থান খুঁজিল, কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না। সেই করতোয়ার জল অবিরাম ছুটিতেছে, সেই পুষ্পরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে, সেই বকুলবৃক্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; কিন্তু প্রাণ যাহাকে চায় সে কোথায়? অধীর হইয়া চারু একটা নিকুঞ্জের আড়ালে গিয়া বসিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনোবিকারে।

"আত্মীয়ের প্রতি যদি অন্তরাত্মা যায় চটে।
উঃ কি বিষম জ্বালা মর্ম্ম ফুঁড়ে জ্বলে ওটে॥"

সদ্ভাবশতক।

সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া স্তরে স্তরে নামিতে লাগিল। অস্পষ্ট অন্ধকারে উপবনখণ্ড ছাইয়া পড়িল। তখন ও চারুচন্দ্র সেইভাবে সেই কুঞ্জান্তরালে বসিয়া। দুই তিন ঘণ্টা হইয়া গেল তাহার চৈতন্য নাই, সেই এক ভাবে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছে। সহসা পশ্চাতে কিসের শব্দ হইল, উৎকর্ণ হইয়া চারু শুনিল, কাহার কণ্ঠস্বর। সে স্বর অপরিচিত নহে। স্মৃতির অনন্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিল; চকিত নেত্রে চারু পশ্চাতে চাহিল। যদি অকস্মাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হইত চারু তত ব্যথিত হইতনা, যত ব্যথা এ দৃশ্য দেখিয়া সে পাইয়াছিল। হরি হরি হরি! এ যে সেই সুহাসিনী! সুহাসিনী বিনোদের পদতলে! মর্ম্মের নিভৃত স্থলেকে যেন অঙ্কুশ ফুটাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, সুহাসিনী সে সময় গিরিবালার জন্য বিনোদের পায়ে জড়াইয়া মিনতি করিতেছিল। অভাগিনী জানিত না, এ পাপ পৃথিবীতে পুণ্যের পুরস্কার নাই, দয়াধর্ম্মের সময় কাল নাই। বালিকার কপাল পুড়িল। চারুচন্দ্র তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িল। হৃদয়ের অর্দ্ধ সের রক্ত যেন কে শুষিয়া লইল, দেহের প্রতি ক্ষুদ্র শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, ধমনীতে ধমনীতে তপ্ত রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল; চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িতপ্রবাহ

বাহির হইতে লাগিল, চারুচন্দ্র আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল; অনেকক্ষণ স্থির হইয়া স্তম্ভের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অবসর পাইয়া পোড়া স্মৃতি অতীত ঘটনার এক একটী চিত্র চিত্তফলকে অঙ্কিত করিতে লাগিল। চারু আকুল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাপর নিজের সকল অবস্থা মনে পড়িতে লাগিল। সেই দুঃখের শৈশব, সেই অনাথ পিতৃহীন বালক পিতার সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র ভগিনীর হাত ধরিয়া পথের কাঙ্গাল হইল—তাহার পর কোথায় সে প্রাণের সহোদরা—কোথায় নিজের আশ্রয়! দিনাজপুরে সতীশ চন্দ্র কত যত্নে তাঁহাকে পালন করিলেন; সেখানে সুহাসিনী তাঁহাকে কত ভালবাসিত, সে ভালবাসার প্রতিদানে চারু তাহাকে কেমন করিয়া হৃদয় বিলাইয়া দিল। অহো! এখন সে স্বপ্নের কথা—নিশ্বাসের সহিত চারু একবিন্দু অশ্রু মোচন করিল। আবার সেই ঢাকার কথা মনে পড়িল। ভূপেন্দ্র! পাপ ভূপেন্দ্র কোথা হইতে আসিল? শৈলবালা কেন এ প্রহেলিকা খেলিল? জগদীশ! বড় দুঃখের সময় হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে সুবাদারের আশ্রয় লইলাম; কিন্তু কে জানিত এ মানবজীবন এত অসার, এমন মরীচিকার ন্যায়। প্রভো! এ ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত কষ্ট সহিবে? চারু আবার কাঁদিল। একবার শূন্য নেত্রে চারিদিকে চাহিল। করতোয়া ছোট ছোট লহরী তুলিয়া অবিরল উছলিয়া উছলিয়া চলিয়াছে, যেন সে সঙ্গে তাহাকে কত ভর্ৎসনা করিতেছে চারিদিকে ফুলকুল সুন্দরীরা তাহাকে দেখিয়া যেন হাসিয়া২ এ উহার গায় ঢলিয়া পড়িতেছে; আঁধার কুঞ্জের পত্র কাঁপাইয়া বায়ু যেন তাহাকে কত উপহাস করিতেছে; বকুল বৃক্ষ যেন তাহাকে ভ্রূকুটি করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে জলন্ত দৃশ্য দেখাইতেছে। চারু আর দেখিতে পারিল না। হৃদয়ের বেগ উছলিয়া উঠিল। তবে আর কেন? এ ছার দেহভার আর কিসের জন্য? চারু স্থির করিল, এ দেহ বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু চারু বালক নহে; যদি মরিতে হয় বীরের মরণ মরিবে। এ তুচ্ছ দেহের একবিন্দু শোণিত যদি মাতৃভূমির জন্য ব্যয়িত হয়, পরকালে স্বর্গ হইবে। আর ভূপেন্দ্র! তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চারু সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। কিন্তু চারু কেমন করিয়া যুদ্ধ করিবে, চারু যে বিদ্রোহী বলিয়া নির্ব্বাসিত! সে চিন্তা

সর্ব্বাপেক্ষা চারুকে জর্জ্জরিত করিল। একটি উষ্ণ নিশ্বাস সে সন্ধ্যারবায়ুতে মিশাইয়া গেল। ভগবন্! সহায় হও। চারু প্রতিজ্ঞা করিল কোন ও ছদ্ম বেশে একেবারে হুগলী গিয়া এ উপস্থিত যুদ্ধে যোগ দিবে।

প্রবীণার নালিশ।

সম্পাদক মহাশয়,

আজ আপনার নিকট এক নালিশ রুজু করতে এলেম, যেন প্রবীণা বলে আমার নালিশ অগ্রাহ্য না হয়; কারণ এখন দেখ্‌তে পাই বাঙ্গালার এই মেয়েমুখো পুরুষগুলো ছিঁচকাঁদুনে কচি মেয়েদেরই আদর করে থাকে, আর আমরা হতভাগিনী কেবল বয়সের দোষে তাঁহাদের ঘৃণার পাত্রী হই। আজ কাল যৌবনগর্ব্বিতা ষোল্‌বছুরীর সিংহনাদ বাবুদের কানে মধু ঢালিয়া দেয়। অনেকের ধ্রুব বিশ্বাস যে তাহারা হাসিলে মুক্তা পড়ে, কাঁদিলে মাণিক পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল এই বোকা পুরুষগুলো এদের অহঙ্কার এতদূর বাড়াইয়াছে, তা নইলে যৌবন কিছু চিরকাল থাকেনা, জোয়ারের জলের মতন কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়। জোয়ারের জল বরং ভাঁটার পর জোয়ার হইলে ফেরে, কিন্তু যৌবনের জোয়ারে একবার ভাঁটা পড়িলে সে ভাঁটা আর ফেরেনা, কেবল উজান বহে। তবে এদের এত অহঙ্কার কেন?

সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি রূপের না গুণের পক্ষপাতী? যদি রূপের পক্ষপাতী হন্, তবে আমার এ নালিস কেবল অরণ্যে রোদন হলো। আর যদি গুণের পক্ষপাতী হন্ তবে আমার ও ধ্রুব বিশ্বাস যে আপনার হৃদয়ের এক কোনে প্রবীনার প্রতি ভালবাসা লুকানো আছে, সেই আশাতেই আজ এ নালিশ আপনার কাছে রুজু কল্লেম।

আমার প্রথম নালিশ আমার স্বামীর বিপক্ষে। বড় আপ্‌শোষ্ রহিল, যে এখানে তাহার নাম প্রকাশ করে পোড়ার মুখ পুড়িয়ে দিতে পার্‌লাম না;

কারণ স্বামীর নাম করতে আমাদের নিষেধ,—আবার লজ্জাও করে, বিশ্বাস করুন আর না করুন, লজ্জা এখনও আমাদের আছে। আমার নালিশ এই—তাঁহার এখন আর প্রবীনাকে মনে ধরে না, এখন কথায় কথায় আমায় বুড়ো মাগি বলা হয়, আবার বল্‌তে লজ্জাকরে প্রায় রাত্তির দুটা না বাজ্‌লে ঘরে আসা হয় না, কোন দিন বাহিরেই রাত কাটে। এরূপ অত্যাচার কি মেয়ে মানুষের প্রাণে সহ্য হয়? কেন, আমি কিসে কমি? ১০। ১৫ বৎসর বয়স যে বেশী হয়েছে, তাতে ত এ হৃদয়ের ভালবাসা বেড়েছে বই আর কমে নাই। আচ্ছা এ রোগের কি কোন অষুধ নেই? আমার কোন সই বলে যে, এ রোগের অষুধ—"নার্‌কেল মুড়ী"—বড় ইচ্ছাকরে একবার ঐ অষুধ দি, কিন্তু আবার মিন্সেকে দেখ্‌লে হাত ওঠে না। আর এক কথা, মিন্সের আমার ডবল বয়স, আমি বুড়ো মাগি হলেম আর তিনি যে কচি খোকা সেই কচিখোকাই রইলেন। আ মরি!

আমার দ্বিতীয় নালিশ নবীনাদের বিপক্ষে। ঘরের লোকের কথা বরং সহ্য হয়, কিন্তু পরের কথা কোন ক্রমেই আর বরদাস্ত হয় না। কর্ত্তাটিকে (বাঁদরটিকে বলিলেও বলা যায়, কিন্তু সে আমি বল্‌বো আর কেহ বল্‌লে সহ্য হবে না) বশে রাখ্‌বার জন্যে যদি চুল বাঁধি কিম্বা আল্‌তা পরি, তবে অমনি নবীনা মহলে হাসির ধ্বনি পড়িয়া গেল। তাহারা বলে—"ওমা! বুড়ো মাগির আবার চুল বাঁধা কেন—আল্‌তা পরা কেন? পুরাণ মন্দিরে চুণকাম কেন?" তাদের লাঞ্ছনায় ঘরে টেকা ভার হয়ে ওঠে। এ কতদূর অবিচার তা একবার আপ্‌নারা ভেবে দেখুন্। আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় রূপ নাই বলে আমরা বেশ ভূষাও কর্‌তে পার্ব্বো না, আর তারা রূপের সাগরে যৌবন তরি ভাসিয়ে দিয়ে, তাতে বেশ ভূষার পাল তুলে অনায়াসে জয় লাভ কর্‌বে। সকলেই যে যাহার জিনিস আপনার দখলে রাখ্‌তে চেষ্টা করে, কিন্তু এ পোড়া কপালীদের তাহারো যো নাই।

এ ছাড়া আমাদের কতক গুলি গহনা পরাতে নবীনাদের বিশেষ আপত্তি আছে। তাহার লিষ্টি এই:——

১। মল—বিশেষত চারি গাছা। সম্পাদক মহাশয়, আপনার গৃহিণীকে

দিবা (যদি নবীনা হয়) স্পষ্ট করে বলুন দেখি, আপ্‌নি মলের বাদ্যি ভাল বাসেন কি না? অকস্মাৎ মলের শব্দ শুনিলে আপনার মন চঞ্চল হয় কি না? মলধারিণী নবীনা কি প্রবীণা, সুন্দরী কি কুৎসিতা এ সকল মনে না ভেবে আপ্‌নার চক্ষু সে দিকে যায় কি না? ফল কথা, আপ্‌নি মলের পক্ষপাতী কি না? আচ্ছা, আপ্‌নি যদি কল্কেতার বড় রাস্তার মাঝখানে কোনদিকে না চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর যদি একজন ষোলবছুরী মল পায়ে না দিয়ে এক ফুট্‌পাথ দিয়ে যায়, আর আমি চার গাছা মল পায়ে দিয়ে আর এক ফুট্‌পাথ দিয়ে যাই, তবে আপনার চক্ষু কোন দিকে ছুটে যায়? রাগ কর্‌বেন না, আপনার মনে কোন কু অভিলাষ না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আপনি যে মলের শব্দে ফিরে দেখেন, তা আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি। দেখুন দেখি, এমন গহনাতেও আমাদের বঞ্চিত কর্‌তে চায়। কোন্ শাস্ত্রে বলে যে, প্রবীনারা চার গাছা (কারণ দুগাছা মল পরা আর না পরা সমান) মল পায়ে দিতে পার্বে না? ইংরেজের মুল্লুকে বাস করে এমন অত্যাচার কেন সহ্য করবো?

N. B. গুজরি পঞ্চমের কথা কিছু বলিলাম না, কারণ আমি তা পর্ত্তে রাজী নই; তার যা কাজ তা মলের দ্বারাই হয়। সে পরা আর পায়ে বেড়ী দেওয়া সমান।

নং ২। নোলোক। আবার মুখের প্রধান শোভা যে নোলোক অদৃষ্টের দোষে তাহাও আমরা পর্ত্তে পারবো না। ছুঁড়িগুলোর অস্পর্দ্ধা দেখে বাঁচি না, তাদের নয়নবাণ রয়েছে, তা'তে সন্তুষ্ট না হয়ে আবার তার উপর নোলক পরে। একেতো তা'দের সেই নয়নবাণেই পুরুষপাখি গুলো ছটফট করে মরে, তার উপর নোলক-বড়সির দরকার কি? বলতে কি, ছুড়িগুলোর নোলোক পরা দেখলে আমার হাড় জ্বালা করে। ভাল, তারাই না হয় পরুক, কিন্তু, আমাদের পর্ত্তে দেখলে চোক টাটায় কেন? সম্পাদক মহাশয়, নোলক পরলেই কেমন ষোলবছুরী ষোলবছুরী বোধ হয়—না? দেখুন দেখি, যদি একটা ক্ষুদ্র নোলোকের সাহায্যে ১০।১৫ বৎসর বয়স ভাঁড়াতে পারি, তা তাদের সহ্য হয় না কেন? তারা মনে করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের সাধ আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে! মুখে আগুন!

নং ৩। চন্দ্রহার। চন্দ্রহার পরলে যে বাহার হয়, তা' বোধ হয় কেহই অস্বীকার করবেন না। শুনেছি অনেক কবি নাকি এর কত সুখ্যাতি করেছেন। আবাগীদের জ্বালায় এ সাধেও আমাদের বঞ্চিত থাকতে হ'য়েছে!

এই রকম আরও অনেক গহনা আছে, কিন্তু পাছে আমার এই সকল আব্দারে আপনি চটে গিয়ে আমার নালিস ডিসমিস করে ফেলেন, সেই ভয়ে আর জানালাম না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলেম। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না—বাঙ্গালীর মেয়ের যৌবন এত শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর যায় কেন? আমার সই বলে, এ কেবল পুরুষদের দোষে। কিন্তু সে সকল আর বলতে চাইনে, বড় লজ্জা করে—ছিঃ!

অধিনীর আর একটি নালিশ আছে, শুনবেন কি? একদিন এই ছুড়িদের জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন হয়ে আর কিছুই ভাল না লাগায় একখান বৈ পড়তে বস্‌লাম। আগে আমার বিশ্বাস ছিল, স্ত্রীলোক লিখিতে পড়তে শিখলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, আমি সেই জন্য যখন বাপের বাড়িতে ছিলাম, তখন লেখাপড়া শিখি নাই; কিন্তু কর্ত্তাটি (কর্ত্তাটি যে চিরকাল আমার উপর নারাজ ছিলেন তা নয়) হাতে যে দিন পড়িলাম সেই দিন হইতেই তিনি আমাকে ক খ শেখাতে আরম্ভ কল্লেন! কি করি, তাঁর খাতিরে কালির আঁচড় পাড়তে হলো। ক্রমে দাতাকর্ণ, কালীবিলাস, অন্নদামঙ্গল, শেষ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পর্য্যন্ত সায় করে ফেল্লেম। তারপর কর্ত্তাটির অনুগ্রহে নাটক, নভেলেও ঠোকর মারতে শিখলাম। সে স্বাদ পেয়ে অবধি আর কিছু ভাল লাগে না। সম্পাদক মহাশয়, আপনি কি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী? মাপ করবেন, আমি ক্ষুদ্রমতি অবলা, কিন্তু আমার বোধ হয় নবেল পড়া যে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সে শিক্ষা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। সে যাক, আমি অভ্যাস বশতঃ সে দিনও একখানি নভেল খুলিলাম। সেখানার নাম চন্দ্রশেখর। সর্ব্বনাশ! তার প্রথম পৃষ্ঠায় দুইটী বালক বালিকায় প্রেম! লেখক কোন্ গুণধর? প্রেম আর কি খেলিবার জিনিষ যে, যে ইচ্ছা সেই প্রেম করিবে? বলক বালিকায় প্রেম! পোড়াকপাল—ছি আরকি! মনটা বড়ই কেমন কর্ত্তে ছিল, তার পর আর একখানা

খুলিলাম—সে খানা মাধবীকঙ্কণ। হরিবোল হরি! এক ভস্ম আর ছাই। দূর হোক, বালিকার প্রেম নইলে বুঝি বাঙ্গালায় বৈ হয় না। শুনেছিলাম, কোন্ রসিক সমালোচক নাকি অগ্নিপরীক্ষার কথা লিখিয়াছিলেন, আমার মতে বাঙ্গলার এরকম বৈগুলোর জন্য সেই ব্যবস্থা করাই বিধি। সম্পাদক মহাশয়! কি জানি, আপনারও যদি ওরূপ লেখা রোগ থাকে, মুখরা ব'লে আমার উপর রাগ করবেন না। আমি আপনারই বিচারাকাঙ্ক্ষিণী

প্রবীণা।*

প্রতাপ।

(৯৪পৃষ্ঠার পর।)

ফষ্টর শৈবলনীকে লইয়া গেলে পর, সুন্দরী রূপসীকে দেখিবার ছল করিয়া প্রতাপের বাড়ি গেল। অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর প্রতাপ চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তখন সুন্দরী সমস্ত কথা প্রকাশ করিল। সে কথা শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই শৈবলিনীর উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রতাপ যে শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসা ছিল বলিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন তাহা নহে, উপকারের প্রত্যুপকার জন্য। চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে যে উপকার পাইয়া-

---

* বাস্তবিক, আমরা প্রবীণার দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার প্রথম শত্রুর প্রতি কি দণ্ড দিব, তাহা আমরা এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় শত্রু নবীনাদের উপর আমি এই অভিশম্পাত করিলাম যে তাহারাও ৮।১০ বৎসরের মধ্যে প্রবীণার দশা প্রাপ্ত হইবে। বোধ হয় ব্রাহ্মণের এ অভিশম্পাত মিথ্যা হইবে না। তাঁহার তৃতীয় অভিযোগ শুনিয়া আমাদের একজন বন্ধু বলিলেন "ইহা Contempt to the Court; বাদিনী এজন্য দণ্ডনীয়া।" সে যাই হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটা কথা বলিবার আছে, অতএব মোকদ্দমা আপাততঃ মুলতুবি রাখা গেল। ভরসাকরি, প্রবীণা অসন্তুষ্টা হইবেন না।

সম্পাদক।

ছিলেন, সে জন্য প্রতাপ চন্দ্রশেখরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন; এখন শৈবলিনীর গৃহত্যাগে চন্দ্রশেখরের বিপদ জানিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজে বলিয়াছেন—"আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে।" কৃতজ্ঞতা প্রতাপ চিত্রের আর একটি উজ্জ্বল বর্ণ।

তাহার পর যেরূপ কৌশলে ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীকে প্রতাপ উদ্ধার করিলেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই, এই খানে আবার তাঁহার সাহসের পরিচয় পাই। কবি প্রতাপচিত্রে বাঙ্গালিচরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালিরা কৌশল জানে, কৌশলে কোন জাতির নিকট পরাস্ত হয় না; কিন্তু বাঙ্গালির সাহস নাই। কবি দেখাইলেন, কেবল কৌশলে কার্য্য উদ্ধার হয় না, কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে সাহস চাই, তবে কার্য্য উদ্ধার হইবে। এই স্থলে প্রথমে আমরা প্রতাপের বীরত্বের পরিচয় পাই, শৈবলিনীর নৌকাখানি হস্তগত হইলে প্রতাপ বীরদর্পে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা গুলি এই—"শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। মুরশীদাবাদের নবাবও আমায় ভয় করেন।" ইত্যাদি।

শৈবলিনীর উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, কিম্বা তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন না। রামচরণকে জগৎশেঠের বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। প্রতাপ জানিতেন, শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিত নয়, সে সাক্ষাতের ফল শুভ হইবে না। যে অনল হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে; এ স্থলে তিনি আপনার হৃদয়কেও বিশ্বাস করিলেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য হইল না—"রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল।"

এইবার প্রতাপের যথার্থ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। শৈবলিনীর প্রণয়বহ্নিতে পোড়াইয়া এইবার আমরা জানিতে পারি যে, প্রতাপ সোণা কি পিতল। প্রতাপ রামচরণের নিকট পরে শুনিলেন যে শৈবলিনীকে তাঁহার গৃহে আনা হইয়াছে, কিন্তু রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, শৈবলিনীকে তাঁহারই শয্যায় শয়ন করান হইয়াছে। প্রতাপ আপন শয্যাগৃহে গিয়া

াপালোকে দেখিলেন—“শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুম-রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালীন গঙ্গার স্থির শ্বেত বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে।” এখানে প্রতাপের হৃদয় কত বল ধারণ করে তাহা আমরা দেখিতে পাই। সেই মনোমোহিনী শোভা দেখিয়াও প্রতাপের মন অটল রহিল। প্রতাপ সে শোভা দেখিলেন বটে, কিন্তু তাহা সৌন্দর্য্য-মোহ বা ইন্দ্রিয়বশতা প্রযুক্ত নহে। তখন তিনি এক দিক সামলাইতে গিয়া আর এক দিক সামলাইতে পারিলেন না—“অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।”

তাহার পর শৈবলিনী প্রতাপকে দেখিয়া “একি এ? কে তুমি!” বলিয়া চীৎকার করিয়া পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আমরা শৈবলিনীর হৃদয় যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় সে মূর্চ্ছা ভীতিজনিত নহে। যে শৈবলিনী ফষ্টরের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করিতে পারিল, যে শৈবলনী দস্যুহস্তে পড়িয়াও ভীত হয় নাই সে যে একজন পুরুষ দেখিয়া (অপরিচিত হইলেও) মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ইহা বহুদিনের পর প্রণয়পাত্রসম্মিলনজনিত মূর্চ্ছা। তাহার কারণ, প্রতাপ অগত্যা সে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে শৈবলিনী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—“কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?”

প্রতাপ শৈবলিনীকে সুস্থ করিয়া সেখান হইতে গমনোদ্যত হইলেন, কিন্তু শৈবলিনী তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তাহার পর উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

শৈ। আমাকে এখানে কে আনিল?

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

শৈবলিনী পোড়ারমুখী বড় দুষ্টা, এখন আবার প্রতাপকে পরীক্ষা করিতেছে। প্রতাপ সে কথায় রুষ্ট হইয়া বলিলেন—“তোমার মত পাপি-

ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর এখানে কেন আনিলে?"

শৈ। যদি ম্লেচ্ছ ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্র। তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। কিন্তু তোমার মরণই ভাল।

এ কথা শৈবলিনী হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, তাই সে কাঁদিল। যাহার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, যাহার জন্য শৈবলিনী ধর্ম্মের বন্ধন, সমাজের বন্ধন, সংসারের বন্ধন, প্রণয়ের বন্ধন—সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া গৃহত্যাগিনী হইয়াছে, আজ তাহার নিকট তাহাকে এই কথা শুনিতে হইল, তাই শৈবলিনীর এত কষ্ট; তাই সে বলিল—"আমার মরাই ভাল, কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক -তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হইতে? তোমা হইতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্যে সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

কিন্তু এ মৃদু ভৎ‍‍র্সনায় প্রতাপের হৃদয় টলিল না। শৈবলিনীর এই প্রণয়স্রোত তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়াও তাঁহাকে ভাসাইতে পারিল না—তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারিল না। প্রতাপ সেই প্রবল প্রণয় স্রোতের গতি আপনার হৃদয়ের বলে বন্ধ করিয়া বলিলন—"তুমি পাপিষ্ঠা তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিনী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

প্রতাপ।

ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার চিত্তসংযম। ধন্য তোমার ধর্ম্মভয়! ধন্য তোমার হৃদয়ের বল! ধন্য তোমার লোভসংবরণ! তুমিই এ পৃথিবীতে ধন্য তোমার ন্যায় পুরুষ এ জগতে দুর্লভ।

ফণিনীর ন্যায় শৈবলিনী এ কথায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি কি করিয়াছ! কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবতামূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে। আমার স্ফুটনোম্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়া ছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়া দিলে?*** তুমি কি জাননা, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? ** তোমারই আশায় গৃহত্যাগী হইয়াছি; নহিলে ফষ্টার আমার কে?" কথা শুনিয়া প্রতাপের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অস্থির হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। এইখানে আমাদের কবিবর গোল্‌ডস্মিথের একটি উপদেশ মনে পড়ে; সে উপদেশটি এই—Where it is hard to combat learn to fly! প্রতাপ এই রূপ ভাবিয়াই বেগে পলাইলেন। শৈবলিনী যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল তাহাতে তাঁহারও হৃদয়ের ঘুমন্ত প্রণয় জাগরিত হইতে আরম্ভ হইল। সেইজন্য প্রতাপ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই স্থানেও প্রতাপ-চিত্র উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, এইস্থলেই প্রতাপের যথার্থ প্রতাপত্ব প্রকাশ হইয়াছে। এইরূপ চিত্র কবির কল্পনা ভিন্ন অন্যত্র আমরা বড় দেখিতে পাইনা। এইরূপ চিত্র দেখাইয়াই কবি উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দেন; সেইজন্যই কবির আদর জগতে এত অধিক। বঙ্কিম বাবুর প্রতাপ বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্ন; সেই জন্যেই এই রত্নটি পৃথক করিয়া ইহার অমূল্যতা দেখাইবার জন্য এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই প্রতাপ চরিত্রের জন্য আমরা কবিকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিই! তাঁহার কল্পনাশক্তি অক্ষয় হউক, অচিরাৎ বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডার এইরূপ নানা অমূল্য রত্নে পূর্ণ হইবে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী কে?

—০৩০—

বড় নিগূঢ় প্রশ্ন। কতদিন কত ভাবিয়া দেখিয়াছি, কতদিন কত তর্ক বিতর্ক করিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারি নাই, বাঙ্গালী কে। আজকাল চারিদিকে জাতীয়জীবন উদ্ভূত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। সে চেষ্টার অনেক লেখক দীর্ঘচ্ছন্দে দীর্ঘ প্রবন্ধে আপনার বিদ্যাবত্তার সহিত মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, বক্তা, কাব্যে মত হউক বা না হউক, শব্দের তরঙ্গে শ্রোতৃবর্গের মনকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন; সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে, সেই সকল বক্তৃতার ভিতরে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, বুঝিতে পারি নাই, বাঙ্গালীর জন্য জাতীয় জীবনের এত আড়ম্বর কেন। কেন, তাহার কারণ—এখনও কেহ বুঝাইয়া দেন নাই, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বাঙ্গালী কে। বুঝিবার কয়েকটি উপায় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম উপায়—পরিচ্ছদ। যে দেশ নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ, যেখানে অতি স্বল্পমাত্র মনুষ্য পশুদিগের সহিত বাস করে, সভ্যতার রেখা এখনও যেখানে নিপতিত হয় নাই—এ প্রকার বনাস্থান হইতে একটি পশুতুল্য অসভ্যকে আনিয়া সমবেত কয়েকটী জাতির মধ্যে ছাড়িয়া দাও, সে ঐ সকল জাতির পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দেশ করিতে না পারুক, তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়া অনায়াসেই পৃথক জাতিকে পৃথক্‌রূপে বিভক্ত করিতে সক্ষম হইবে। ইংরাজ ও চীন ইহাদিগের নাম সে না জানিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি তাহা সে অক্লেশেই বলিয়া দিবে। কিন্তু সেই অসভ্যকে মাত্র বাঙ্গালীদিগের মধ্যে লইয়া আইস, সে কখনই বলিতে পারিবে না, তাহারা এক জাতীয়। বলিতে পারিবে না, কেন না, বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ নাই, বাঙ্গালী যখন যা দেখে তখন তাই পরে; বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ অনন্ত। বাঙ্গালী বহুরূপী।—

> "সবুজ সবুজ ইহা সবুজ নিশ্চয়।
> সবুজ কেমনে? কালো, অন্যে রেগে কয়।"

—বাঙ্গালীর সম্বন্ধে পরিদর্শকদিগের এই প্রকার মত। অতএব কেমন করিয়া বুঝিব, বাঙ্গালী কে?

দ্বিতীয় উপায়—ভাষা। বাঙ্গালীর ভাষার নাম বাঙ্গালা ভাষা। কিন্তু সে ভাষায় বাঙ্গালীকে কেমন করিয়া চিনিব? একজন পণ্ডিত বলিলেন—"অস্মদ্দেশেঽধুনা যা কাচিদ্ভাষা প্রচবদ্রূপা সংস্কৃতোহি প্রায়শস্তাসাং প্রসূতিঃ।" বুঝিলাম, তবে যে একটু সংস্কৃতঘটিত কথা কহিবে সেই বাঙ্গালী। কিন্তু Plain, Complete এ সকল কথা সংস্কৃতে কোথা হইতে আসিল? মজলিস্, দিল্, দুনিয়া এ সকল শব্দও তো সংস্কৃতের ভাঙ্গা নয়; তবে বাঙ্গালা ভাষাটা কি রকম জিনিস? একজন বন্ধু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষা বড় অপুষ্ট, ইহাতে প্রয়োজনীয় সকল শব্দ মিলে না, অপরাপর বিদেশীয় ভাষা হইতে সে সকল কথা আমদানি করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করা যাইতেছে। বন্ধুর কথাটা তত মনে লাগিল না, কারণ, ঐ যে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, প্লেটদার কামিজের উপর উড়ানিব ফুলটি বাঁধিয়া গৌর বাবু তাঁহার বন্ধু হ্যাটকোটধারী কালাচাঁদ বাবুর দক্ষিণ করে দক্ষিণ কর সংলগ্ন করিয়া বিদায়কালে Goodnight বলিলেন, বাঙ্গালায় কি ঠিক্ উহার অনুরূপ শব্দ নাই? ধনীর প্রাসাদে, নির্ধনের পর্ণকুটীরে, বিলাসীর নিকুঞ্জে, বিবেকীর ভজনাগৃহে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই বহুরকমের মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাই। ভাষাতত্ত্ব এখানে হারি মানে। কতদিন চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভাষা দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই, বাঙ্গালী কে।

আর একটি উপায়—দেশ। কোন একটি জাতি নিরূপণ করিতে হইলে তাহার দেশ বা জন্মভূমি জানিয়া সহজে স্থির করা যায়। ভূগোলবেত্তা বলিলেন—"যে দেশে যাহার বাস বা জন্মস্থান, তাহাকে সেই দেশীয় বা সেই জাতীয় বলে; যথা, বাঙ্গালায় যাহাদের জন্ম তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়।" এ কোনও ছেলে-ভুলান কথা। চক্ষুষ্মান্ পাঠকমাত্রেই কখনই এ বাহ্য ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইবেন না। ভূগোলবেত্তা আমাদিগকে অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেন, তাঁহার কথায় আমরা বুদ্ধি-হারা হইয়া যাই, আমাদিগের প্রশ্নের ক্ষেত্র আরও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। ভূগোলবেত্তা যে পথ দেখাইলেন, তাহাতে বাঙ্গালার তিন সরিক। বাঙ্গালী হিন্দু,

বাঙ্গালী মুসলমান, বাঙ্গালী ফিরিঙ্গি। উপরে যে দুইটি উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা তাহাদিগের জন্য যাহারা বাঙ্গালী এবং হিন্দু। তাহাদিগের কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দাও, তাহাদের বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। কিন্তু মুসলমান যে বাঙ্গালী তাহা চিনিব কি প্রকারে? ফয়জু মোড়ল কথা কয় বাঙ্গালায়, খায় পরে বাঙ্গালার, সে জন্মিয়াছে বাঙ্গালার মাটিতে, কিন্তু সে যে হিন্দু দেখিলেই "কাফের" বলিয়া উঠে তাহার উপায় কি? সে না হয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু হিন্দুর সহিত এক জাতীয় তো বটে, তবে তাহার সহিত এত প্রভেদ কেন? আমাদিগের হর ভট্টাচার্য্যই বা তাঁহার ছায়া মাড়াইলে স্নান করিতে যান কেন? ইংরাজ প্রটেষ্টাণ্ট আছে, ইংরাজ রোমানক্যাথলিক আছে; কিন্তু তাহাদের জাতি তো সেই একই রহিয়াছে। জাতীয়জীবন সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। একজন রোমানক্যাথলিককে একটি উচ্চ কথা বল দেখি, এখনই তাবৎ প্রোটেষ্টাণ্টমহল ক্ষেপিয়া উঠিবে; কিন্তু সহস্র মুসলমানের সম্মুখে একজন হিন্দুর নিগ্রহ কর, কেহ তোমার বিপক্ষে একটি কথা বলিবে না। বরং সকলে মনে মনে হাসিয়া উঠিবে। ইহা দেখিয়াও কে বলিবে তাহারা একজাতীয়? সংস্কৃতকলেজে মুসলমান বালকের পড়িবার অধিকার নাই, কোন হিন্দু বালকও মাদ্রাসা কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে না, তবে কেমন করিয়া বুঝিব ইহাদিগের বাঙ্গালি কে? তারপর ফিরিঙ্গি ভায়ারা। তাঁহারা favored few, তাঁহাদিগের কথা বলা আমাদিগের শোভা পায় না। হোমিওপাথিক মাত্রায় ইংরাজ রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকায় তাঁহারা আর মাটিতে পা দিতে চান না। বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়া অকৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় সচ্ছন্দে ইংলণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতৃ সম্বোধন করেন। আমরা হই damned natives, আর তাঁহারা? তাঁহারা যে কি তাহা তাঁহারাই জানেন। আমাদের সে কথা বলা বড় ভাল দেখায় না। কিন্তু সহজেই যেন কবির কথা মনে জাগিয়া উঠে—অমনি দেহের ভিতর হইতে প্রাণ যেন বলিয়া উঠে—

> Ingratitude! thou marble-hearted fiend!
> More hideous when thou showest in a child
> Than a seamonster.............................."

সত্য বটে তাঁহাদের জন্মভূমি বাঙ্গালা, বসতি বাঙ্গালায়, খান পরেন বাঙ্গালার; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? লর্ড রিপন ভারতের প্রকৃত বন্ধু সত্য, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভায় যে এমন লোক থাকিতে পারে—এমন লোক আছে তাহা আমরা জানিতাম না। এখনই আমাদের অদৃষ্টদোষে গভর্ণমেণ্ট গেজেটে Native আর Eurasian দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখনই কর্ত্তৃপক্ষের অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের প্রতি নজর পড়িয়াছে। Eurasian Education জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এসকল জানিয়া শুনিয়াও কে বলিবে তাঁহারা বাঙ্গালী? বাস্তবিক, আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বাঙ্গালী কে।

বাঙ্গালী কে? আর বাঙ্গালা কার?—এ দুই প্রশ্নে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব বাঙ্গালা যদি কার তাহাই এ পর্য্যন্ত ঠিক না হইল তবে, বাঙ্গালার আর উপায় কি? আজকাল অনাথিনী বাঙ্গালার মুখ চাহিয়া অনেকেই স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বড় সুখের কথা; কিন্তু মাথা না থাকিলে মাথা-ব্যথা বলা সে কেবল উপহাসের জন্য; কার দেশ অথবা স্বদেশীয় কে এ সকল তথ্য নিরূপিত না হইলে দেশের মঙ্গলের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বাঙ্গালায় স্বদেশানুরাগের বহ্নি কখন জ্বালাইতে হয়, যুগপৎ হিন্দু, মুসলমান ও ফিরিঙ্গি এই তিন শ্রেণীর মধ্যে তাহা সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক। নহিলে বাঙ্গালা কার মুখ চাহিবে? বাঙ্গালার ভাগ্যনেমির পরিচালক এক্ষণে তিনজন। বাঙ্গালার ভরসা ত্রিপথগা। এ ত্রিপথের স্রোত এক মুখে প্রবাহিত না হইলে অন্য উপায় নাই। 'সাজার মা গঙ্গা পায় না'—এ কথাটি সামান্য হউক, কিন্তু ইহাতে অনেক উপদেশ আছে। বাঙ্গালায় তিন সরিকের তিন দিকে প্রবণতা যতদিন থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালার কোন বিশেষ মঙ্গলের আশা আমরা দেখিতে পাই না। তাই বলিতেছিলাম, হে স্বদেশবৎসল সভ্যসমুত্থান-পক্ষপাতিন্! যদি যথার্থই দেশের জন্য ব্যথিত হইয়া থাক, যদি যথার্থই মাতৃভূমির জন্য হিকৈমীর ন্যায় বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, দেশানুরাগ প্রণোদনায় যদি ইচ্ছা থাকে, তোমার ও আড়ম্বরময় বাক্যের বাগুরা বিস্তার রাখিয়া দাও; অগ্রে শিখাও, তুমি কে, তোমার দেশ কে, তোমার

স্বদেশীয় কে, আর তুমি যে বাঙ্গালীর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ সে বাঙ্গালী কে।

স্বায়ত্তশাসন।

মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য। তুমিও মনুষ্য আমিও মনুষ্য, কিন্তু আমাপেক্ষা মনুষ্যত্ব-রক্ষায় তুমি এত শ্রেষ্ঠ কেন? কেন, তাহার কারণ, হয় আমার বুদ্ধি নাই—আমি নির্ব্বোধ, না হয় এ সংসারে আসিয়া আমি কখন কার্য্য করি নাই, কার্য্য করিবার অবসর পাই নাই। পক্ষান্তরে, আমাপেক্ষা তোমার বুদ্ধি আছে বলিয়া, আমা হইতে তুমি কার্য্য করিতে জান বা কার্য্য করিতে পাও বলিয়া তুমি আমা হইতে মহৎ, মনুষ্যত্বের গৌরব-বর্দ্ধনে অপেক্ষাকৃত সুপটু। সুতরাং, মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য। অপিচ, বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, কার্য্য থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য। বুদ্ধি আবার কার্য্যের জন্য, কার্য্য বুদ্ধির জন্য। হইতে পারে, আমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরেই চিরদিন হইতে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে কখনও উপগত হয় নাই, মস্তিষ্ক মাত্র বিলোড়ন করিয়াই তাহা আবার স্বস্থানশায়ী হইয়াছে, সে বুদ্ধির খেলা কার্য্যে কখন দেখাইতে পারি নাই, অথবা হয়তঃ আমি অনেক কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু কখন তাহার জন্য বুদ্ধির পরামর্শ গ্রহণ করি নাই, আমার কার্য্যে বুদ্ধিকে হস্তক্ষেপ করিতে দিই নাই; সুতরাং উভয়তঃ বুদ্ধি এবং কার্য্য পরস্পর পরস্পরার্থে নিয়োজিত হয় নাই, সেই জন্যই আজও মনুষ্যত্বের কিছুই সাধিতে পারি নাই, জগতে মনুষ্যমধ্যে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছি। গ্লাডষ্টোন বা ডিস্‌রেলি যে বুদ্ধি ধরেন হয়তঃ তোমারও সে বুদ্ধি আছে, কিন্তু তোমার সে বুদ্ধি দেখাইবার ক্ষেত্র পাও না, তাহার অনুরূপ কার্য্য করিবার অবসর তোমার নাই, গ্লাডষ্টোন

ডিস্‌রেলির নামে জগত কাঁপিতে লাগিল, আর তুমি চিরকালের জন্য অস্ফুটবাক্‌ শুকের ন্যায় নগণ্য রহিয়া গেল। ম্যাঞ্চেষ্টার যে কার্য্য করিতেছে হয়তঃ বুঝাইয়া দিলে তুমি সে কার্য্য করিতে পার, কিন্তু তোমার নিজের বুঝিবার ক্ষমতা নাই—তোমার বুদ্ধি নাই, ম্যাঞ্চেষ্টার বুদ্ধিবলে রাজরাজেশ্বর হইল, আর তুমি বুদ্ধির দোষে চিরদিনের তরে কড়ারকাঙ্গাল থাকিলে। সুতরাং বুদ্ধি এবং কার্য্য, কার্য্য এবং বুদ্ধি পরস্পর পরস্পরের সহায়ীভূত না হইলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে না। আবার এমন ও দেখা গিয়াছে, যাহার তাদৃশ বুদ্ধি নাই সে যদি কোন কার্য্যে প্রাণপণ করে, শতবার ব্যর্থচেষ্ট হইলেও সে যদি সেই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে, দিনে দিনে তাহার বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়, খনিগর্ভস্থ মনিখণ্ড শাণে চড়িয়া ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই জন্যই পণ্ডিত বলিয়াছেন—"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।"

পর্ব্বত-গুহায় দেখিলাম, বহ্নি ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে, তাহাতে তত তেজ নাই, তত জ্বালা নাই—ক্ষীণদীপ্তি, মন্দভাস, স্তিমিতপ্রায়। অদূরে অনেক ইন্ধনরাশি পড়িয়াছিল, সংযোগ করিলাম, বহ্নি তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যদি সে ইন্ধন রাশি সংগ্রহ না হইত, ধীরে ধীরে সে বহ্নি মন্দীভূত হইয়া নির্ব্বাণগত হইয়া যাইত। আমার হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থলে হয়তঃ একটু বুদ্ধির আগুন চুপে চুপে জ্বলিতেছে, যদি কার্য্যের ইন্ধন তাহাতে সংলগ্ন করিতে পারিতাম, অচিরাৎ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু সে ক্ষমতা ছিল না, অগ্নি ধুমাইয়া ধুমাইয়া নিভিয়া গেল। কার্য্যের ক্ষেত্র যাহার নাই, কার্য্য করিবার অবসর যে পায় না, সহস্র বুদ্ধি থাকিলেও মনুষ্য মধ্যে সে নগণ্য মাত্র। কবিহৃদয় ইহা বুঝিয়াছিল, তাই সে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠিয়া গাহিয়াছিল—

"Some village Hampden, that, with dauntless breast,
The little tyrant of his field withstood;
Some mute inglorious Milton here may rest—
Some Cromwell, guiltless of his country's blood."

গ্রে একটা ক্ষুদ্র স্থানে একটা ক্ষুদ্র সমাধিক্ষেত্র দেখিয়া এ কথা লিখিয়াছেন; আজ যদি তিনি এই নদ-নদী-বন-উপবন-নগর-উপনগর-পূর্ণ বিস্তীর্ণ

ভারতে এই বিশাল শ্মশানভূমি দেখিতেন, কে জানে, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া কাদিয়া কতই মনের ব্যথা জানাইত ? ভারতের সমাধিক্ষেত্র অতি বিচিত্র ! কেহ চলিয়া গিয়াছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে, কেহ আছে কিন্তু না থাকা মাত্র। সকলের একই দশা। জগত কাহাকে চিনেনা, কাহারও নাম কখন শুনে নাই, তাহারা এ বিপুল সাগরে এক একটি জলবুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু ভারতের অবস্থা কি চিরকালই এইরূপ ছিল? ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠা উন্মোচন কর। প্রাচীন বৈদিক অধ্যায়ে যত কিছু পাও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কর, তারপর রামায়ণে আইস—অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে, তাহার পর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে—সে প্রান্তরে দৃষ্টান্তের রাশি ; কিন্তু তাহা রাখিয়া দিয়া আরও অগ্রসর হও, ঐ সম্মুখে কে এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ অসি চর্ম্ম লইয়া মার মার শব্দে "জগত বিজয়ী" সেকেন্দার সাহকে দূরে খেদাইয়া লইয়া চলিয়াছে, ইচ্ছা হয় আরো অনুসন্ধান কর, যবনদিগের পাপনিশ্বাসে যেখানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমা ধারণ করিয়াছে সেখানে চাহিয়া দেখ —কত শিবজী, কত প্রতাপ, কত গোবিন্দ সিংহ, কত টোডরমল্ল ! কে বলিবে তাহার এ অবস্থা চিরকাল ধরিয়া ছিল ? তবে এখন ভারতে এ যুগান্তর পরিবর্ত্ত কেন ? ভারতে মানুষ নাই কেন ? মনুষ্যত্ব নাই কিসের জন্য ? এখনও বুদ্ধিজীবী বলিয়া ভারতবাসিদিগের যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে, এখনও ভারতবাসীর বুদ্ধির নিকট অনেক জাতি হারি মানে, তবে এ বিপর্য্যয় কিসের জন্য ? সেই অসামান্য বুদ্ধিবলসম্পন্ন হইয়াও ভারতবাসি মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে কেন এত অক্ষম ?

"সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটায় ?"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য। ভারতবাসীদিগের বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহারা কার্য্য করিতে পায় না। সুতরাং সে বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইতে না পারিয়া ক্রমেই জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অগ্নি ইন্ধন অভাবে মন্দ মন্দ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে। কালব্যাপী অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতবাসীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি

ক্রমেই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পক্ষান্তরে, যে ইংরাজ অসভ্য বন্যদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না, যাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে বুদ্ধির প্রখরতা কিছুই লক্ষিত হইত না, এক কার্য্যের সহায়ে তাহারা এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, ইংরাজের রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তগত হইতে পারেন না। অতএব ভারতবর্ষে এখন কার্য্যের অবতারণা আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষ কার্য্য করিতে পায় না, ভারত পরাধীন। তাহার নিজের কার্য্য নিজে চালাইবার তাহার অধিকার নাই, ভারতের শাসনপ্রণালী পরায়ত্ত। স্বায়ত্ত শাসন না হইলে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; ইংলণ্ডে যদি স্বায়ত্তশাসন না থাকিত, ইংলণ্ড এত কার্য্য করিতে পারিত না। বড় সুখের সমাচার, ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। যে কেহ বলেন, ভারত আজও এ শাসনপ্রণালীর অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা কিছু বলিতে চাহিনা, তাঁহাদের দূষিত চক্ষের নিকট কোনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচন করিয়া দেখাইতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই, সে প্রলাপবাক্যের আবার কি উত্তর দিব? অন্যান্য জাতিদিগের শাসন কার্য্য এবং ভারতীয়দিগের শাসন কার্য্যের জন্য এখনও চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রহিয়াছে। জগত জানে, ভারতীয়ের হৃদয়ে এখনও কত বুদ্ধি বাস করে এবং সেই বুদ্ধি কার্য্যের সহায়ে কতদূর বল বিস্তার করিতে সক্ষম হইতে পারে। রিপন বাহাদুর সুখে থাকুন, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক, তিনি আজ স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রচলিত করিয়া ভারতে যে কার্য্যের পথ খুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সে জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। আমাদিগের এক নিবেদন, তিনি যেন তাঁহার সহযোগীদিগের দ্বারা প্রতারিত না হন, যেন কেহ তাঁহাকে এ মহদনুষ্ঠান হইতে স্খলিত করিয়া ভ্রমের পথে নিক্ষেপ না করে—যিনি যাহাই বলুন—ভারতের বুদ্ধি অতুলনীয়, তাহার উপর পণ্ডিত বলিয়াছেন "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।" তবে স্বায়ত্তশাসন ছিলনা বলিয়া ভারত এতদিন কার্য্য করিতে পায় নাই, বুদ্ধি স্বত্ত্বেও মনুষ্যত্ব অর্জনে এত পশ্চাৎপদ ছিল। স্বায়ত্তশাসন কার্য্য ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার, সে দ্বার একবার উদ্ঘাটিত হইলে,

ভারত একবার কার্য্য করিবার অবসর পাইলে, তাহার বুদ্ধি এবং কার্য্য পরস্পর পরস্পরার্থে ব্যবহৃত হইলে, অচিরাৎ সে আপনার অবস্থাকে উন্নীত করিতে সক্ষম হইবে, অচিরাৎ মনুষ্যজাতি মধ্যে তাহার নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন কার্য্যের উপায় নাই, কার্য্য ভিন্ন মনুষ্যত্বের উপায় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য। বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, কার্য্য থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য।

রাবণবধ*।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, লেখক হওয়া ভাল কি সমালোচক হওয়া ভাল? যাই বল, লেখক হওয়াটায় কিছু বুদ্ধি খরচ করিতে হয়, কিছু কেরামত দেখাইতে হয়, কিন্তু সমালোচক হইলে তাহার কোন কিছুরই দরকার নাই। কেহ কেহ বলেন, সমালোচক হইতে হইলে অনেক দেখা শুনা চাই—অনেক জানিতে হয়। আমি তাঁহাদিগকে বাতুল মনে করি। গায়িতে কয় জনে জানে? কিন্তু গান ভাল লাগিল কি মন্দ লাগিল তাহা কে না বলিতে পারে? আমার মতে লেখক অপেক্ষা সমালোচক হওয়ায় কিছু মজা আছে—নামটাও খুব জাহির হইয়া পড়ে। সাক্ষ্য চাই? আমাদের বাঞ্ছারামকে দেখ। বাঞ্ছারাম ভায়া দুইদিন না যাইতেই সমালোচক হইয়া সাহিত্য জগতে বড়ই গোলমাল করিতেছেন। স্বীকার করি, বাঞ্ছারামের ন্যায় অত গোলমাল করিতে পারিব না; বাঞ্ছারাম নবীন, নবীন লইয়াই বড় ব্যস্ত, আমার জীবন এক একটানা গঙ্গা, এই একটানা স্রোতে সকলকার ভাসিয়া যাইতে ভাল লাগেনা। সুতরাং অতটা আর পোষায় না, বাঞ্ছারামের ন্যায় রঙ্গমতীর রঙ্গ দেখাইতে বাঞ্ছা নাই। কিন্তু তবে সাধ মিটে কৈ? ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার সাধের আশাটিকে সঙ্গে

* শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

লইয়া লোকান্তরে গমন করিতে হইবে; কিন্তু দীনবন্ধু দীনের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, সুবিধা জুটিয়াছে। অতএব লেখক এবং পাঠক সাবধান হওন, সমালোচকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হাতে লইয়া তোমাদের নদের গোরা চাঁদ আজ বীরাসনে উপবিষ্ট হইল!

দেবাসুরে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিল, কিন্তু তার ফল হইল—একের ভাগ্যে সুধা অন্যের ভাগ্যে হলাহল। জগতের কি নিয়ম তা কে জানে? কিন্তু পাত্রভেদে এক বস্তুর ফলভেদ লক্ষিত হয়। রাবণবধে আমার সৌভাগ্য কারণ আমি সমালোচক হইব বলে একটা প্রকাণ্ড পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি, গিরিশবাবুর বড় দুরদৃষ্ট কারণ এত পরিশ্রম করিয়াও আজ তিনি আমা হেন জনের সমালোচনভাজন হইয়াছেন। অনেক দিন হইল আধুনিক নটকুলচূড়ামণি ও কবি গিরিশ বাবুর রাবণবধ পুস্তক খানি আমি পড়িয়াছি এবং কোন কোন সমালোচনী পত্রিকাতেও উক্ত পুস্তকের সমালোচনা দেখিয়াছি। সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক সমালোচনা করিতে করিতে তাহাকে মান মন্দিরের (Temple of fame) মধ্যস্থিত উচ্চাসন দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তবুও সে সমালোচনার বিন্দু বিসর্গ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয় বাঙ্গালার ভাল-মন্দ-বিবেচনা-শূন্য পাঠকমণ্ডলীকে ভ্রান্তির পথে অগ্রসর করিবার জন্য আর গিরিশ বাবুকে বিদ্রূপ করিবার জন্য ঐরূপ লেখা হইয়াছে। রাবণবধের ছন্দোবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া একজন একস্থানে বলিয়াছেন "মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি এই পরিচ্ছদ আবিষ্কার করিতে সাহস করেন নাই বা সন্ধান পান নাই"। সত্য বটে, মাইকেল বা দীনবন্ধু এ প্রকার অদ্ভুত ছন্দে (আমরা ছন্দ বলিলাম কেননা ইহাকে গদ্য বা পদ্য কি আখ্যা দিব, আজও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই) পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়াই গিরিশ বাবুকে এ প্রকার লেখার প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাহার কারণ—

প্রথমতঃ এছন্দ নূতন নয়। গিরিশ বাবু ইংলণ্ড হইতে ইহা আমদানী করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোভেণ্ট গার্ডনস্থ রয়েল থিয়েটর (Theatre Ro-

al, Drurylane Covent garden) অতি প্রসিদ্ধ। Inchbald নাম্নী জনৈক ইংরাজী নটী সেই নাট্যালয়ের কর্ত্তী ছিলেন। সেই রঙ্গ ভূমে ইংলণ্ডের বিখ্যাত নাটক লেখকদিগের নাটক অভিনীত হইত। সেই ন্যাট্যালয়ের কর্ত্তী কখনই গ্রন্থকারদিগের মুদ্রিত পুস্তক বা তাহার পাণ্ডুলিপি অনুসারে অভিনয় করিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন, সেই সকল পুস্তক রঙ্গালয়ের উপযোগী ছন্দে লিখিত হয় নাই, সে ছন্দে অভিনয় করিলে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত সম্যকরূপে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়াচুরিয়া না-গদ্য-না-পদ্য এক অদ্ভুত আকারে গড়িয়া লইতেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত নাটক প্রণেতাও কবি Thomas Otwayর গ্রন্থ The Orphan or The Unhappy Marriage বড় আশ্চর্য্য রকমে ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। Inchbald এর মুদ্রিত পুস্তকের আবরণীতে এইরূপ লেখা আছে "Printed under the authority of the managers from the promnt book with remarks by Mrs. Inchbald." এখন বুঝা গেল এ ছন্দের এই নূতন আবিষ্কার নহে। সমালোচকেরা যাহাই কেন বলুন না, গিরিশ বাবু এছন্দের নূতন প্রবর্ত্তয়িতা নহেন।

দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড ছাড়িয়া দিয়া এখন দেখা যাউক এ প্রকার ছন্দ আমাদের দেশে আছে কি না। থাকিবেনা কেন? প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু তাহা শিক্ষিত সমাজের উপযোগী নহে বলিয়া তাহা অনেকের নয়ন পথে পড়ে নাই। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমারা একদিন চারিটী মাত্র পয়সা লইয়া দুষ্টা সরস্বতীর নিবাস ভূমি বটতলায় গিয়াছিলাম। রাবণ বধের সমালোচক দিগকে আমরা একবার সেই থানে যাইতে বলি, তথায় গিয়া দেখুন রাবণ বধের ছন্দে বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ আছে কি না। আমারা তাঁহাদিগের সেই কষ্ট কতকটা নিবারণ করিয়াছি। তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে আমারা সেই কষ্ট লইয়া নগদ চারিপয়সা মূল্য দিয়া একখানি বৃহৎ তবলা পুস্তক ক্রয় করিয়াছি। প্রত্যয় করুন আর নাই করুন, তাহাও অবিকল রাবণবধের ছন্দে অনেক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বড়দুঃখ রহিল এতকষ্ট করিয়া নগদ চারিপয়সা মূল্য দিয়া যে তবলার পুস্তক ক্রয় করিলাম

তাহা কোন কাজে লাগিল না, কল্পনার সম্পাদক তাঁহার পত্রিকায় তরজা উদ্ধৃত করিয়া দিতে দিলেন না। অনেক অনুনয় করিয়াছিলাম তথাপিও স্বীকৃত হন নাই। যদি স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কল্পনার পাঠক দিগকেও রাবণ বধের সমালোচক দিগের চক্ষের উপর দেখাইয়া দিতে পারিতাম রাবণবধ নূতন ছন্দে লিখিত হয় নাই।

এত দিনে বুঝিলাম, কল্পনার সম্পাদক একটী নীরস তরু মাত্র, নতুবা আবার সাধের চারিপয়সার তরজা উদ্ধৃত করিতে দিলেন না কেন? সে যাহা হউক ইহা নিশ্চয় কথা রাবণ বধের ছন্দ নূতন নহে। দুষ্টা সরস্বতীর প্রেতভূমিতে বিরাজ করিতেছে। সেই জন্যই বোধ হয় দীনবন্ধু বা মাইকেল এই প্রকার ছন্দে লিখিতে সাহস করেন নাই; তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেন, কোন কর্ম্ম করিয়া পরিহাসের পাত্র হওয়া অপেক্ষা সে কর্ম্ম না করাই বিধেয়।

তৃতীয়তঃ।—এইরূপ ভাঙ্গাদলের তালহীন স্বর আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। শুনিয়াছি নাকি প্রায়ই এই প্রকার ছন্দহীন কবিতা পদ্য কিম্বা গদ্য চোদ্দয় চিনিয়া লইয়া কল্পনার সম্পাদক ধ্বংশপুরে ফেলিয়া দেন। বালকেরা এইরূপ ছন্দে কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের অঙ্গুলীকণ্ডুয়ন রোগের শান্তি করিয়া থাকে। ইহাতে কোন প্রকার কষ্ট নাই, মিলের অনুরোধ নাই অক্ষরের মাত্রার পীড়াপীড়ি নাই, নাকি স্বরে পড়িয়া যতি দিয়া ৩।৪টী বা ২০।২০টী অক্ষরে ছত্র লিখিলেই কবিতা হইল। কল্পনা-সম্পাদকের অনুগ্রহে তাহার একটী নমুনা পাইয়াছি। সেটি এই—

মাতৃস্নেহ।
কি মধুর নাম!
হায় জননীর স্নেহ!
সুপবিত্র নির্ম্মল যেন সারগের দ্যুতি,
চির প্রজ্বলিত;
পৃথিবীর ছাঁচে ঢালা, প্রিয় অতিশয়,
নিভেওনা নিভে কভু যাহা, সেই সরগের জ্যোতিঃ
জননীর স্নেহ মধুরিমাময়।

ইহাই বালকদিগের কবিতা, ইহাই তাহাদের অঙ্গুলি কুণ্ডুয়ন পরিতৃপ্তি;

রাবণবধের ছন্দ ও এই প্রকার নূতন আমদ এবং সৃষ্টিছাড়া। রাবণবধে কবিত্ব থাকিতে পারে, শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য থাকিতে পারে, চরিত্রগঠনে নিপুণতা থাকিতে পারে; কিন্তু—"একোহিদোষো * * * গুণরাশি নাশী।" আমরা রহস্য ছাড়িয়া যথার্থই বলিতেছি, রাবণবধ নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া গিরিশ বাবুর লেখনী হইতে কেন বহির্গত হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সমালোচক যতই কেন বলুন না—"এতদিনে বাঙ্গালার নাটক আপনার পরিচ্ছদ চিনিয়া লইয়াছে।" আমরা এ ছন্দের পক্ষপাতী নহি, এ ছন্দ পড়িতে ভাল বাসি না, বাঙ্গালায় এ ছন্দ ব্যবহৃত হয় ইহা আমাদিগের ইচ্ছা নহে। আমাদের চিরকাল হইতে একটা সংস্কার আছে—"জিহ্বা জানে ছাঁদ বিছাঁদ।" চিরকাল হইতেই আমাদের জিহ্বা বাঙ্গালার কবিতা-পুস্তক সকল ছাঁদ বিছাঁদ চিনিয়াই পড়িয়া আসিয়াছে, আজ হঠাৎ রাবণবধ পড়িতে গিয়া জিহ্বা আটকাইয়া যায় ছাঁদ কি বিছাঁদ কিছুই চিনিয়া উঠিতে পারে না। ছন্দে গ্রথিত হইলে কবিতাগুলি যে অধিকতর সুমিষ্ট হয়, তাহা আমাদের চিরবিশ্বাস। এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে চাহি না, গিরিশ বাবুরই রাবণবধ ও সীতার বনবাস হইতে আমারা দুইটী উদাহরণ দেখাইতেছি—একটি—

"দেহ ফিরে ভিখারীরে ভিখারীর ধন।"

আর একটি—"রাণিজোর পূর্ণতরী ডুবাইল কুম্ভে।"

আমাদের বোধ হয়, তাঁহার সমগ্র পুস্তকে এত মিষ্ট আর অতি অল্প স্থান আছে। সেই গিরিশ বাবু, সেই তাঁহার কল্পনা—তবে এ দুই পঙ্ক্তি অন্য অপেক্ষা এত মিষ্ট কেন? বাস্তবিক, ছন্দ কবিতার একটি প্রধান অঙ্গ। ছন্দ না থাকিলে কবিতার অঙ্গ হানি হয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এরূপ ছন্দহীন কবিতার প্রশ্রয় দিলে অঙ্গভ্রষ্ট হইয়া কবিতার শীঘ্রই অকাল-মরণ সম্ভব। গিরিশ বাবুর কবিত্বশক্তি আছে, অতএব এই সময় হইতে তাঁহার লেখনীকে ফিরাইতে আমরা অনুরোধ করি। রাবণবধ সম্বন্ধে গিরিশ বাবুকে দুই একটি উপদেশ দিতে ইচ্ছা রহিল। কিন্তু বারান্তরে, আজ আর নয়। ইতি।

নন্দের গোরা চাঁদ।

প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাস ও সেক্সপীয়র।

— ০৪০ —

১ম খণ্ডের ২৩২ পৃষ্ঠার পর

আমরা কল্পনার প্রথম খণ্ডে কুমার হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাহ্য প্রকৃতিবর্ণনায় কালিদাসের যে অসাধারণ ক্ষমতা তাহা দেখাইয়াছি। তাঁহার যে কোন কাব্য উন্মোচন করা যায় সেই খানেই প্রকৃতির উজ্জ্বল ছবি আমাদের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। এমন কোন বস্তু প্রকৃতিতে নাই, যাহা সে কল্পনার আয়াত্তাধীন নয়। ক্ষুদ্র লতা পাতা হইতে সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত পর্য্যন্ত সকল ছবিই আমরা তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাই। আমরা এবার রঘুবংশ হইতে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বাক্যের যথার্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

রঘুবংশে কালিদাস যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছেন, অমরা এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না। সে কবিত্বের ইয়ত্তা করিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? মাত্র, তিনি যে একজন সুনিপুণ চিত্রকর তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিব। কবির চক্ষু অসাধারণ, তিনি দিলীপকে যখন বশিষ্টধেনু লইয়া বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন সেই অসাধারণ চক্ষুতে দেখিলেন।

মরুতপ্রযুক্তাশ্চ মরুসখাভং তমর্চ মারাদভিবর্ত্তমানম্।

অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈরাচারলাজৈরিব পৌরকন্যাঃ।।

বায়ুভরে আন্দোলিত নবীন বনলতাগুলি পুরকন্যাদিগের আচারলাজবিসর্জ্জনের ন্যায় সেই অনল প্রভাব সমীপচারী অর্চ্চনীয় ভূপতির উপর পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কি সুন্দর বর্ণনা! কি সুন্দর ভাব! আবার যখন দিলীপ বশিষ্টাশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন কবি আমাদিগকে যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমাদের হৃদয়ের স্তরেস্তরে তাহা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সে চিত্রটি এই—

সেব্যমানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণূৎকিরৈর্বাতৈরাধুত বন রাজিভিঃ ॥
মনোঽভিরামাঃশৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ।
ষড়জ সংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥
পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদূরোজ্ঝিত বর্ত্মসু।
মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু ॥
শ্রেণী বন্ধাদ্বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণ স্রজম্।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ ॥

সস্ত্রীক দিলীপ পথে যাইতে যাইতে শালতরু-নির্য্যাস-গন্ধবাহী সমীরণ নানা বিধ পুষ্পরেণু লইয়া এবং বনরাজী মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে আসিয়া লাগিতে লাগিল। তাহার স্পর্শে অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কোথায় রথ চক্রের গম্ভীর শব্দ যেন মেঘগর্জ্জনভ্রমে ময়ূরগণ উদ্ধমুখে দ্বিবিধ ষড়জতালে মনোহর কেকারব করিতেছে শুনিতে পাইলেন। অন্যস্থলে বিশ্বাসবশতঃ রথমার্গের নিকটে রথদর্শনে বিস্ময়ান্বিত হরিণহরিণীগণের অনিমিষ নয়ন তাঁহারা পরস্পরের নয়ন সাদৃশ্য দেখিলেন। কোন স্থলে সারসপক্ষিগণ আধার স্তম্ভে অনবলম্বিত তোরণ পুষ্পমালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড়িতে উড়িতে মধুর রব করিতেছে শুনিতে পাইয়া উদ্ধমুখে সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন। আরো কএকটি এইরূপ বর্ণনা রহিল কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। এরূপ সুন্দর বর্ণনা আর কোথায় আছে কি? যেন বর্ণনাস্রোতে ভাবের তরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে; কবিত্বের কথা কি বলিব? ইহার প্রতিছত্রে প্রতি কথায় প্রতিবর্ণে কবিত্বের ছড়াছড়ি হইয়াছে। এরূপ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আমরা মোহিত হইয়া সমাজ ভুলি, সংসার ভুলি, শেষে আপনাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। হৃদয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া তাহার প্রতি কক্ষ পবিত্র করে। তাহার পর কবিত্বের সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া ফেলে।

আমরা রঘু হইতে আর একটি মাত্র চিত্র পাঠকগণকে দেখাইব,

কারণ এক্ষুদ্র প্রবন্ধে অধিক দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। সে চিত্রটি এই——

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্বতন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারানিবদ্ধের কলঙ্করেখা॥

রাম চন্দ্র সিতাকে দেখাইতেছেন—তমালতালীবনশ্রেণীতে নীল বর্ণ এবং দূরতা বশতঃ অস্পষ্ট প্রতীয়মান বেলাভূমি লৌহচক্রসদৃশ লবণাম্বুরাশির নেমিসংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে।

সাগরের এইরূপ সুন্দর চিত্র জগতের কোন কবি অঙ্কিত করিতে যে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন ভাষায় সমুদ্রের এরূপ হৃদয়গ্রাহী মনোমদ বর্ণনা নাই। যে ইংলণ্ড কবির জন্মভূমি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে, তাহার কোন কবি প্রতিদিন সাগর বক্ষে বিচরণ করিয়া ও সাগরের একপ সুন্দর ছবি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন ?* কালিদাস জীবনে কখন সমুদ্র দেখিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ধন্য তাঁহার কল্পনা! ধন্য তাঁহার কবিত্বশক্তি! ধন্য তাঁহার প্রতিভা! তিনি সমুদ্রের যে সুন্দর নয়নানন্দদায়ক চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরা তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না।

(ক্রমশঃ।)

ব্রহ্মাণ্ড কত বড় ?

ঐ যে সুনীল নির্ম্মল নৈশ গগনে অসংখ্য তারা শোভা পাই উহাদের মধ্যে একটি বাছিয়া লও। আমি বলি ঐ ক্ষুদ্র নক্ষত্র তোমা

*এই স্থলে বলা আবশ্যক, যে সমালোচক বাইরণকে (Byron) এবিষয়ে প্রধান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

চক্ষুকে প্রতারণা করিয়াছে। বিশ্বাস হয় কি? ইহা সূর্য্যের ন্যায় কেবল আকারে বড় নহে, সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ও বটে। আচ্ছা সূর্য্যের আকার কত বড়? সূর্য্যের আকার জানিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর আকার জানিতে হয়। পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ এমন খণ্ডে ভাগ করিলে উনিশ কোটী ছসটি লক্ষ ছাব্বিস হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়।* সূর্য্য এত বড় যে পৃথিবী অপেক্ষাও ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। আবার হয়ত তোমার ঐ নক্ষত্রটি সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহৎ। সৌর-জগৎ কাহাকে বলে জান কি? সূর্য্য এবং যে সকল গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে, এসকল লইয়া একটি সৌর জগৎ। সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যেক নক্ষত্রেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে। সেইরূপ একটি নক্ষত্র এবং যে সকল গ্রহ উপগ্রহ তাহার চারিদিগে ভ্রমণ করে, এই সকল লইয়া আবার একটি নাক্ষত্রিক জগৎ হয়। এখন একবার আকাশের চারিদিকে চাহিয়া বল দেখি কত তারা দেখিতেছ? তুমি যাহা দেখিতেছ তাহাকে বলিবে অসংখ্য। (২) কিন্তু এখানেও তোমায় চক্ষু তোমায় প্রতারণা করিতেছে। তুমি যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতেছ, তোমার চক্ষের অগোচরে আরো অসংখ্য অসংখ্য তারা রহিয়াছে। এখন আকাশে কত তারা আছে বুঝিলে কি? এক একটি তারা আবার এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের একটি গ্রহ মাত্র, এক একটি নাক্ষত্রিক জগতেও এইরূপ কত গ্রহ আছে। এখন বল দেখি এই সৌরজগৎ আর অসংখ্য নাক্ষত্রিক জগৎ লইয়া যদি ব্রহ্মাণ্ড হয়, তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কত বড়?

---

* বঙ্গ দর্শন [illegible] খণ্ড—৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) এখানে বলা আবশ্যক যে তুমি যে আকাশ দেখিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগও নহে।

অবাধ বাণিজ্য।

মানুষ অভাব লইয়া। সে যখন সূতিকাগৃহের আনন্দকোলাহলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া একবার জগতের পানে প্রথম চাহিয়াছিল, তখনই বুঝিয়াছিল তাহার এ মনুষ্যজন্ম কেবল অভাবপূরণ জন্য, তাই সে শিশু তখন আত্মীয়বর্গের উৎসব-কোলাহলে কর্ণপাত না করিয়া মাতৃক্রোড়ে শুইয়া হাত পা নাড়িয়াছিল, তাই সে তখন তাহার অব্যক্ত স্বর উর্দ্ধে তুলিয়া আপনার দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছিল। মানুষ সেই যে তাহার জন্মের আদি দিন হইতে অভাবের অনন্ত তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এখনও সেই স্রোতের মুখে পড়িয়া শত শত ঘাত প্রতিঘাত নিঃশব্দে সহ্য করিয়া জীর্ণ-তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, বর্ষের পর চলিয়া যাইতেছে, শিশুশরীর যতই সংপুষ্ট হইতেছে ততই অভাবসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। ক্রমে সে শিশু যাইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ হইল, অভাব বাড়িল বৈ কমিল না। মানুষ বুঝিল, সে অভাবের দাস। এই খানেই জ্ঞানের সূত্রপাত, এই বোধশক্তির নাম জ্ঞানের প্রথম বিকাশ। যিনি আপনার অভাব বুঝেন, তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। সক্রেতিস মহাজ্ঞানী, কারণ, তিনি জানিতেন, তিনি কিছুই জানেন না; নিউটন বলিতেন, তাঁহার বিদ্যার্জ্জন কেবল উপকূলে উপলখণ্ড সঞ্চয় করা মাত্র, তাই জ্ঞানী বলিয়া নিউটনের প্রশংসা এত অতুল; আর যে ব্রাহ্মণ অনেক দেখিয়া শুনিয়া এক দিন জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন "প্রভো! তুমি অগম্য, তুমি অপ্রধৃষ্য, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কে তোমায় বুঝিয়া উঠিবে?" তিনি জ্ঞানীর রাজা। যে অভাব বুঝে সে জ্ঞানী, যে অভাব বুঝিয়া অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পায় সেই সার্থকজন্মা। যে আপনার অভাব বুঝিয়া চলিতে পারে না সে মনুষ্য-মধ্যে অধম—সংসারের অতি অপকৃষ্ট জীব।

মানুষ এ পৃথিবীতে প্রথম যখন একা আসিয়াছিল, তখন সে কেবল আপনার অভাব লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, অন্যের জন্য তাহাকে ভাবিতে হইত না; কিন্তু, ক্রমে মানুষ সংসার-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল, তাহার সন্তানসন্ততি হইল, মানুষ হইতে মানুষ জন্মিল। তখন অভাব বাড়িয়া উঠিল। অভাবের সংখ্যায় পারিবারিক অভাব বলিয়া একটা নূতন অঙ্ক সংযুক্ত হইল। মানুষ ইতঃপূর্ব্বে নিজের একটা যৎসামান্য অভাব কোনও প্রকারে পূরণ করিতে পারিলে সুখী হইত, এক্ষণে তাহাকে পরের মুখ তাকাইয়া নিজের অভাব অপেক্ষা পরের অভাব গুরুতর মানিয়া অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। কালে, মানুষের সে যুগও চলিয়া গেল; মনুষ্য-সংখ্যায় পৃথিবী ছাইয়া পড়িল, মানুষ তখন সমাজে প্রবিষ্ট হইল। এই খানে তাহার অভাবের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত—আরও সুদূরপ্রসারিত। যে মুহূর্ত্তে মানুষ সামাজিক জীব [illegible] মুহূর্ত্ত হইতে তাহার চরণে অভাবের নিগড় আরও শত হস্ত বর্দ্ধিতাকারে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। মানুষ এখন অভাবের পদানত হইয়া সংসারের দগ্ধমরুতে অভাবপূরণবাসনায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় দিক্‌দিগন্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ আপনা ভুলিয়া সমাজের অভাবোচিত কার্য্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এই অভাবপূরণপ্রবৃত্তি কখন তাহাকে আকাশে তুলিতেছে, কখনও সাগরে ডুবাইতেছে, অসাধ্য-সাধনে শক্তি দিতেছে।

বালক মাতৃপার্শ্বে তাঁহার অঞ্চলে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তাহার সেই ঈষৎপ্রোস্ভিন্ন-গোলাপকুসুম-সদৃশ সুকুমার ওষ্ঠ ফুলাইয়া কাঁদিতেছে—কেন? বুঝি, কোনও অভাব পূরণের ইচ্ছা হইয়াছে। মাতা তাহার বদনে আপনার অমৃতপ্রস্রবণ স্তন প্রদান করিলেন, শান্তভাবে তাহা চুষিয়া চুষিয়া বালক ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার অভাব সংপূরণ হইল। যুবক আপনার অভাবপূরণে দৃঢ়সংকল্প, তাই আজ গ্রন্থকীট হইয়া অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া সাহারার বালুরাশি গণনায় নিবিষ্টচিত্ত। বৃদ্ধ শেষ দিনে আপনার আর একটী নূতন অভাব আবিষ্কার করিয়াছে, তাই সে স্ত্রীপুত্র পরিবার ছাড়িয়া, সংসারের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া গহন বনে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত! মানুষ সকল অবস্থাতেই অভাবের চিরসেবক। কত নিদাঘ

সূর্য্যের খররৌদ্র, কত প্রাবৃটের বজ্রবৃষ্টিবর্ষণ কালমেঘ, কত শীতের শিলাকৃৎ হিমানীরাশি মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, সংসারপান্থ একই ভাবে দ্রুতপাদবিক্ষেপে দিনরাত্রি চলিতেছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্লান্তি-বোধ নাই, অন্য লক্ষ্য নাই। এক উদ্দেশ্য—অভাবপূরণকামনা। আপনার জন্য, স্ত্রীপুত্রপরিবারের জন্য, সমাজের নরনারীর জন্য অভাবের গুরুভারে তাহার দুই স্কন্ধ অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে সেই অভাব সংপূরণ হয় সেই মৃগচঞ্চল মনোবৃত্তি তাহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, তাহার যত কিছু বল মানুষ জন্মিয়া অবধি এই অভাবপূরণে প্রয়োগ করিতেছে। তুমি বড়, তুমিও যেমন করিতেছ; আমি ছোট, আমিও তেমনি করিতেছি; তুমি পুরুষ, তুমিও যেমন করি-তেছ; তিনি স্ত্রী, তিনিও তেমনি করিতেছেন। ইহাতে বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, [illegible] [illegible]নাবদ্ধ ছিল, মানুষ অন্তর্বাণিজ্য ভিন্ন জানিত না। ক্রমে বহির্বাণি[illegible] স্বার্থ করিল। যে মৌলিক অভাব তাহাকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল [illegible] পূরণ [illegible] তখন তাহার অভাবের আপত্তিক্ষেত্র দূর স্থান ব্যাপিয়া প্রসারিত হইয়া পড়ে, গুরু-ভার গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পক্ষান্তরে, আবার, এই সমাজে থাকিয়া সে অনেক পূরণীয় বিষয়ে অনেকের সাহায্য পাইয়া থাকে; সমাজে প্রবেশ করিলে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির জন্য ভাবিতে হয়, সুতরাং কার্য্যে উভয়ে উভয়ের সহায়তা পাইতে পারে। সমাজে বহু ব্যক্তি, বহু ব্যক্তির সহায়তা পাইলে একের অভাবের অতি সহজেই সংপূরণ হয়। ইহা না হইলেও সংসার, সমাজ চলিতে পারিত না। মানুষ পূর্ব্বে যখন একা ছিল, তখন সে কথঞ্চিৎ আপনার অভাব পূরণ করিতে পারিত বটে; কিন্তু বহু লোকের অভাব একা তাহা দ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব। উদরান্নের নিত্য প্রয়োজন, আচ্ছাদনের জন্য পরিধেয়ের সংস্থান করিতে হইবে, একটা আশ্রয় না হইলে ঋতুর তাড়নায় শরীর রক্ষা হয় না—ক্ষুদ্র বৃহৎ, ছোট বড় আরো কত অভাব রহিয়াছে—কে তাহার গণনা করিবে? মাত্র এক ব্যক্তিকে যদি নিজের জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, মানুষ সমাজে বাস করিতে পারিত না। সমাজে মানুষ যেমন মানুষের জন্য ভাবিল, মানুষ

তেমনি মানুষের সহায় হইল। কেহ অন্নের বৃক্ষ রোপণ করিতে নিযুক্ত হইল কেহ বস্ত্রবয়নে মন দিল, কেহ গৃহরচনা শিখিল—আরও যে সকল কাজ ছিল সকলে মিলিয়া বাঁটিয়া লইল। অতঃপর কার্য্যের বড় সুবিধা ঘটিল। এক ব্যক্তি অপরের নিকট তাহার পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে নিজের অভাব পূরণ করিতে শিখিল। কৃষি তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পীর নিকট শিল্পদ্রব্য গ্রহণ করিল, শিল্পী তাহার শিল্পদ্রব্য দিয়া কৃষিদ্রব্যের অভাব পূরণ করিল। এইরূপে যে যে দ্রব্যের ব্যবসায়ী সে সেই দ্রব্য দিয়া অন্য ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অন্য দ্রব্য লইয়া আপনার অভাব পূরণ করিতে আরম্ভ করিল। পরস্পর সাহায্যের বিনিময়ে সমাজ চলিতে লাগিল।

[illegible] যেমন সংসারে থাকিয়া সমাজ জানিয়াছিল, তেমনি আবার [illegible] শিখিল। [illegible] বিদেশের বস্তুর পরি-

[illegible]

ময়প্রণালী লব্ধপ্রসব হইল কখন ;

তাহার পরিবারের এবং তাহার সমাজের সেই সামগ্রীর অভাব সংপূরণ করিয়া উদ্বৃত্ত হইল। মানুষ এইরূপে যখন বুঝিল, অপরের নিকট তাহার শ্রমসামগ্রীর বিনিময়লব্ধ দ্রব্যে সে নিজের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম, তখন ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোনও অভাবের রৌদ্র ভোগ করিতে না হয় এই জন্য মানুষ অধিক শ্রম করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে তাহার উদ্বৃত্ত অনেক হইল। মানুষ তখন সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে কোথায় অধিক সামগ্রী পাইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক, সে যখন দেখিল, তাহার বিনিময়ে এত প্রাপ্য হইতেছে যে তাহা বহন করিয়া আনয়ন করা অথবা অধিকদিনের জন্য সঞ্চিত রাখা অসম্ভব, তখন অর্থের সৃষ্টি করিল। অর্থ অন্য কিছুই নহে; যে বস্তুকে মধ্যে রাখিয়া মানবীয় বিনিময় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহারই নাম অর্থ। মানুষ অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু লইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথায় বিনিময়ে অধিক সামগ্রী মিলে, কোথায় অধিক পরিমাণে অর্থ লাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম, যে দেশে যে বস্তুর জন্ম সে দেশে সে বস্তুর বিনিময় অতি বিরল;

প্রচার। ইহার কারণ, সে দেশের অনেকেই সে দ্রব্য উৎপাদিত করিতে চেষ্টিত হয়, অনেকের গৃহেই তাহার উদ্বৃত্ত অংশ পড়িয়া রহে, সুতরাং তথায় তাহার বিনিময়বহুলতা হইতে পারে না। মানুষ তখন সে সকল সামগ্রী অন্যত্র প্রেরণ করিতে যত্নপর হয়। যে দেশে সে দ্রব্য নাই অথবা অতি অল্পই আছে তথায় ইহা মূল্যে বিক্রীত হয়, বিনিময়ে প্রচুর অর্থ লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার এক দেশের দ্রব্য অন্য দেশে লইয়া গিয়া বিনিময় করাকে বাণিজ্য বলে। যে ব্যবসায়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ এক দেশের কোনও সামগ্রীর উদ্বৃত্তভাগ অন্য যে দেশে তাহার অভাব লক্ষিত হয় তথায় লইয়া গিয়া তাহার বিনিময়ে সেই দেশের সেই সামগ্রীর অভাব সংপূরণ করিয়া নিজের অন্যান্য অভাব পূরণ করিতে সততঃ যত্নশীল তাহারই নাম বাণিজ্য-ব্যবসায়। ক্রমে এই বৃত্তি মানুষকে অনেক আশা দেখাইয়া আপনার পথে অগ্রসর করিয়া লইল। পূর্ব্বে [illegible] সীমাবদ্ধ ছিল, মানুষ অন্তর্বাণিজ্য ভিন্ন জানিত না। ক্রমে বহির্বাণি[illegible] স্বী[illegible] করিল। যে মৌলিক অভাব তাহাকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল [illegible] সে [illegible], সেই অভাবের প্রণোদনায় মানুষ আপনার [illegible] উঠিতে [illegible] প্রেরণ করিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিল। যে অভাব তাহাকে তুষানলের ন্যায় দহন করিতেছিল, বাণিজ্যের সুখশীতল সলিল প্রক্ষেপে তৃপ্তিগত হইয়া ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মানুষ তখন বাণিজ্যের মোহন প্রণোদনে বিভোর হইয়া আপনার সকল চেষ্টা উহাতেই উপগত করিল। বাণিজ্যের কোমল ক্রোড়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন একে একে সকলই আসিয়া আশ্রয় লইল। সকলকেই মানুষ বাণিজ্যের উপযোগী করিতে চেষ্টা পাইল। কবি উচ্চে তাঁহার মধুরঝঙ্কার বীণা বাজাইয়া গাহিলেন—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলেই স্বীকার করিতেছেন বাণিজ্য অভাব পূরণের স্বর্ণসোপান; বাণিজ্য লক্ষ্মীর পূর্ণ-আবসথ। ক্রমে মানুষের কত বিপ্লবের পর বিপ্লব চলিয়া গেল, কত সমাজবিঘট্টনের পর সমাজবিঘট্টন চলিয়া গেল, তাহার বাণিজ্যের মত্তপ্রবাহিনী আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া ভাগিরথীর ন্যায় শতধারা বহির্গত করিয়া শতদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যে দেশে, যে জাতি মধ্যে বাণিজ্যের খরস্রোতঃ কূলপ্লাবী ও বহনপ্রবল সেই দেশ,

সেই জাতি আজ পৃথিবী মধ্যে উচ্ছ্রিতশিরঃ। যে দণ্ডে যে দেশে বাণিজ্যের এই স্রোতোগতিত্বের পূর্ণ বিরাম, সেই দণ্ডে সেই দেশের উচ্ছিন্ন দশা; তাহার নিদ্রিত অভাবগুলি একে একে জাগরিত হইতে থাকে, অভাবের সংপেষণে পড়িয়া সে জাতি জর্জরিত হইয়া পড়ে; বাণিজ্যের প্রসাদাৎ অচিরবন্য পশুসহচর ইংরাজ আজ বাহুবলদৃপ্ত, রাজরাজেশ্বর, জাতির অগ্রগণ্য, পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। আর বাণিজ্যভ্রষ্ট হইয়া লক্ষ্মীর নিলয়ভূমি ভারত আজ অভাবনিগৃহিত, মুষ্টিভিক্ষুক, পর-প্রত্যাশী কড়ার কাঙ্গাল।

পূর্ব্বাপর ঘটনাজাল বিবরিত করিয়া যুক্তিশাস্ত্র এক্ষণে দেখাইল, মানুষ যেমন অভাব লইয়া, এবং পরস্পরের শ্রমসামগ্রী পরস্পরের সহিত বিনিময়ে বা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সে অভাব যেমন সংপূরণ হয়, বাণিজ্য যাহাতে দশ বিদেশে অ[illegible] তাহার উপায় বিধান কর্ত্তব্য। অবাধ বাণিজ্য [illegible] উন্নতিধামে উত্থানপথে সোপানমঞ্চ। রাজকরাদি বাণিজ্যের বাধা বিঘ্ন [illegible]নতিপবিপন্থী, অভাব পূরণের বিশেষ অন্তরায়। বাণিজ্যবৃত্তি যখন মানুষের শিরা[illegible] ধমনীতে অনুস্যূত হইতে থাকে, সকলেই যখন অভাব-পূরণ-কামনায় বাণিজ্যজীবি হইয়া উঠে, তখন প্রতিযোগিতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দেশে যে যে দ্রব্য পূর্ব্বে ছিল না, সে দেশ কালে সেই সেই দ্রব্য প্রসব করিতে যত্ন পায়, সুতরাং অন্য যে দেশ তথায় তাহার তত্তৎসামাগ্রীর উদ্বৃত্তাংশ প্রেরণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিজের অন্যান্য অভাব সংপূরণ করিতেছিল, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহার শ্রমসামগ্রীর উদ্বৃত্তাংশ অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা গৃহে পড়িয়া পচিতে থাকে, সে তাহার বিনিময়ে নিজের দ্রব্যান্তর-অভাব পূরণ করিতে পারে না। আয়র্লণ্ডে লৌহ শিল্পের একবার এই প্রকার উদ্বৃত্তাধিক্য হইয়াছিল, মাঞ্চেষ্টারের শ্রমশিল্প একবার এই প্রকার অতিরিক্ততা-দোষদুষিত হইয়াছিল। এইরূপ সকল দেশেই হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই সমস্ত দেশকে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে হয়। রাজকর প্রভৃতি দিতে হইলে সে প্রতিযোগিতা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং মানুষের অভাব পূরণ করিতে হইলে, অভাবপূরণ জন্য

পরস্পর সহায়তা সাপেক্ষ বিনিময়প্রণালী অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অবাধ বাণিজ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। আমরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। বড় সুখের সমাচার, বাণিজ্যগতপ্রাণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে এই অবাধ বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। রাজনীতিকুশল রিপন-শাসনইতিহাসে ইহা একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে প্রাণালীমতে ইহার সপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পক্ষপাতদুষ্ট, আমরা উদারনীতিজ্ঞের নিকট এ প্রকার ব্যবস্থাপনা প্রত্যাশা করি নাই, ইহার অনুষ্ঠান দেখিয়া আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছি। মানুষমাত্রই যখন অভাবের দাস, সেই অভাব সংপূরণের জন্য যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অপরের সহায়তায় নির্ভর করিয়া বিনিময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখন ভারত রাখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারকে কেন এ অনুগ্রহ করা হইল—আমদানীশুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইল অথচ রপ্তানিশুল্কে হস্তক্ষেপ হইল না কি জন্য—নীতির কোমল তনু স্বার্থের তীব্রশিখায় আহুতি ঢালিয়া দিলেন--কিসের জন্য সে সকল গূঢ় রহস্য আমরা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। একে ভারত বাণিজ্যে জাতিমধ্যে হীনাবস্থ, বাণিজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিগতলক্ষ্মীক হইয়া পড়িয়াছে; এ সময়ে তাহার প্রতি অকরুণ দৃষ্টি তাহার পক্ষে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন। ভারত তাহার শ্রমসামগ্রীর উদ্বৃত্ত ভাগ লইয়া কি করিবে? * আবার অবাধবাণিজ্যপুষ্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত সে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, তাহাকে সে দ্রব্যের জন্য নিজের চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে, কালে কোনও সুযোগে যদি ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতে আর তাহার দ্রব্য প্রেরণ না করে, ভারত অভাবনিপীড়িত হইয়া পড়িবে। অবাধ বাণিজ্য না থাকিলে, বাণিজ্যহেতু রাজকর আদি দিতে হইলে, নিজে খাটিয়া খুটিয়া যে সামগ্রী উৎপাদিত করিবে অন্যত্র লইয়া প্রতিযোগিতায় কখনই

* কেহ হয়তঃ বলিবেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; একে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট প্রভৃতিতে ভারত জরজর, তাহার উপর দ্রব্যজাত বিদেশপ্রেরিত হইলে বিষম অনিষ্টপাতের আশঙ্কা। আমরা এ কথা বুঝি; বুঝি এ কথা টা অসঙ্গত নহে, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই জন্যই অবাধ বাণিজ্যের

সে সামগ্রী বিনিময়ে নিজের অভাবোচিত দ্রব্যাদি পাইতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, এ প্রকার মঙ্গলপ্রসূ প্রণালী অন্যায়োপেত ও পক্ষপাতদুষ্ট হয় ইহা বড় কষ্টের কথা। ভরসা করি, রাজপুরুষগণ ইহার গৌরব রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইবে না। অবাধ বাণিজ্যের শীতলচ্ছায়ায় অভাবের রৌদ্র স্থান পায় না। আবাধ বাণিজ্য বাণিজ্যের স্বাস্থ্যকর নিয়ম, বাণিজ্য পরস্পর সহায়তার বাহু পসারিয়া পরস্পর শ্রমসামগ্রীর বিনিময়ের নামান্তর মাত্র, বিনিময় মানুষের অভাব পূরণের প্রশস্ত পন্থা, অভাব মানুষের দুশ্ছেদ্য চরণনিগড়। মানুষ অভাব লইয়া।

বাঙ্গালার লেখক, পাঠক ও সমালোচক।

আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশের লেখক, পাঠক ও সমালোচকের মধ্যে প্রীতি বা সহানুভূতি নাই; পরস্পরের মুখে পরস্পরের নিন্দা আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। লেখক দুঃখ করেন যে, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়াছে, তাঁহার পুস্তকের উপযুক্ত পাঠক বা সমালোচক নাই—কারণ কেহ সে পুস্তকের আদর করিল না। এদিকে পাঠক ও

সূত্রপাত দেখিয়া চীৎকার ছাড়িতেছেন। কিন্তু এজন্য আমরা অবাধ বাণিজ্যপ্রণালীকে দোষ দিই না। প্রথম জানা উচিত, মানুষের বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কখন? যখন তাহার শ্রমসামগ্রী দ্বারা তাহার নিজের, তাহার পরিবারের এবং তাহার সমাজ বা স্বদেশের অভাব পূরণ করিয়া উদ্বৃত্ত থাকিবে। এই উদ্বৃত্তাংশ বিনিময়ের নামই বাণিজ্য। তাই বলিয়া নিজে পেটে না খাইয়া, পরিবারবর্গ বা স্বদেশীয়গণ অন্নাভাবে মারা যাইতেছে তাহা দেখিয়াও—নিজের শ্রমসামগ্রীদ্বারা নিজের সেই সামাগ্রীর অভাব পূরণ না করিয়া তাহা বাহিরে প্রেরণ করার নাম বাণিজ্য নহে। অযথা রপ্তানি হইতেই ভারতের এই দুর্দ্দশা; কিন্তু অযথা রপ্তানি আর অবাধবাণিজ্য স্বতন্ত্র পদার্থ। অবাধ বাণিজ্য সামাজিক জীবের পক্ষে অর্থনীতির অতি মঙ্গলপ্রসূ নিয়ম। আমরা এ নিয়মের পক্ষপাতী।

সমালোচক বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালায় লেখক নাই, কাহাকে আদর করিব? আমরা এ বিবাদ ভঞ্জন করিতে আজ এ প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করি নাই; আমাদের উদ্দেশ্য, কে কিরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহার সমালোচনা করা।

বাঙ্গালার লেখক আমাদের প্রথম সমালোচ্য। বাঙ্গালায় যে লেখক নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি না, বরং লেখক সংখ্যা যে যথেষ্ট আছে, এবং দিন দিন যে সে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কুলেখকের সংখ্যাই অধিক, সুলেখকের তাহাদের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতাবলে বাঙ্গালির অনেক উন্নতি হইয়াছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত বঙ্গদেশ এখন সভ্যতালোকে আলোকিত। বাঙ্গালি এখন বুদ্ধিমান, বিদ্বান, চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম। বাঙ্গালির দেহ এখন কষ্টসহিষ্ণু, মন উন্নত, ও হৃদয় প্রশস্ত। তবে এ সকল গুণ থাকিতেও বাঙ্গালায় সুলেখকের সংখ্যা এত অল্প কেন? আমরা এ বিষয় অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কারণ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়—যে যাঁহারা কৃতবিদ্য এবং এই সকল গুণ-বিশিষ্ট তাঁহাদের অনেকের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঘৃণা—তাঁহারা ইংরাজীর পক্ষ। বাঙ্গালাভাষায় লেখা দূরে থাকুক, কথা কহিতেও তাঁহাদের ঘৃণা হয়—তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন। তাঁহারা সকলি বুঝিতে পারেন, কেবল কোন ভাষার উন্নতি না হইলে যে, সে জাতির জাতীয়উন্নতি হইতে পারে না, এইটি বুঝিতে পারেন না, কিম্বা বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

মুসলমান রাজত্বের সময় বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা কিছুই ছিল না, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের সময় যখন প্রথম বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইল, ান ইহা ন্নতির ভার প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের উপর দেওয়া হয়, হারা ্যর অনুবাদ করিয়া যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক লেখেন, তাহা ্রূপ সংস্কৃত,—বাঙ্গালিরও দুর্ব্বোধ্য। তাঁহারা বুঝিতেন না, যে কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, তাহার স্ব করা আবশ্যক। তাহার পর যখন ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কৃত-বি । বাঙ্গালায় লিখিতে কলম ধরিলেন, তখন হইতেই ভাষার ারম্ভ হইল। ইহাদের মধ্যে মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম,

এবং হেমচন্দ্রই প্রধান। এইখানে বলা আবশ্যক বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শন অনেকগুলি কৃতবিদ্যকে ইংরাজী ছাড়াইয়া বাঙ্গালায় লেখক করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। ইহা সত্তেব বাঙ্গালায় আরো অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখ করিলাম না।

বাঙ্গালায় দুই শ্রেণীর লেখকের আদর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহারাই পুস্তক লিখিয়া অর্থের মুখ দেখিতে পাইয়া থাকেন। ইহার প্রথম শ্রেণী স্কুল পাঠ্য-পুস্তক লেখক। পঞ্জিকা সহায় বাঙ্গালায় যদি সহস্রাধিক পুস্তক একবারে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তবে সে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক। এই সকল লেখকের পুস্তক বিক্রয়ের আয়ও যথেষ্ট হয়, মাত্র বর্ণপরিচয়ের আয়ে, একটি ছোট রকমের গৃহস্থের ভরণপোষণ চলিতে পারে। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন বাঙ্গালি অর্থ দিয়া প্রায় আর কোন পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নয়, যদি পাঠ করেন তবে সে ভিক্ষা করিয়া। এই সকল কারণেই এই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা এত অধিক। কিন্তু ইহাদের রচিত পুস্তক কেবল বালকদিগের উপযুক্ত, তাহাতে ভাষার কোন উন্নতি বা গৌরব নাই, লেখকদিগেরও চিন্তাশক্তি বা বিদ্যাবত্তার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকই এই শ্রেণীর লেখক।

ইহার দ্বিতীয় শ্রেণী নাটক ও নভেল লেখক। ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম বাবু ও রমেশ বাবু, এই শ্রেণীর লেখকের শীর্ষস্থানীয়। ঠাকুর পরিবার হইতেও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট না টক ও নভেল বাহির হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু প্রণয়ের সুন্দরচিত্র অ ঙ্কিত করিয়া পাঠকগণের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই জন্যে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। এই শ্রেণীর লেখকের স গণনা করা আমাদের সাধ্য নহে। পূর্ব্বে দিনকতক নাটকের বড় ধু য়া গিয়াছিল, এখন তাহা নভেলে পরিণত হইয়াছে। এই শ্রেণীর র মধ্যে অনেক অপকৃষ্ট লেখক দেখিতে পাওয়া যায়; যখন নাটক পড়িয়াছিল, তখন বাঙ্গালায় যে সকল অপাঠ্য, কদর্য্য, সকল বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় অন্য কোন ভাষায় নাটক বাহির হয় নাই। গ্রন্থকার নাটক লিখিয়া ভাবিয়া

নাটকের কি নাম দিবেন, কারণ সকল নামের নাটক প্রায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। কথাচ্ছলে পুস্তক লিখিলেই যে নাটক হয়, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। নভেলের বাজারও আজকাল ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই ইহা নাটকের ন্যায় অত্যাচার এখনও আরম্ভ করে নাই।

বাঙ্গালায় তৃতীয় শ্রেণীর লেখক কবি। বাঙ্গালার কবির সংখ্যাও অগণনীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৬।৭ জন কেবল কবি নামের উপযুক্ত। হেম বাবু, নবীন বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু, বিহারী বাবু, এবং রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি আমাদের দেশে কয়েকজন উৎকৃষ্ট কবি আছেন। তাঁহাদের কাব্য কয়খানিও সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই—এক হেম বাবু ভিন্ন আর কাহারও আদর ততদূর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী কাব্যের আস্বাদ জানে সত্য, কিন্তু কবিদিগকে আদর করিতে জানে না। সংবাদ পত্র কিম্বা সমালোচনী মাসিক পত্রে দুই চারি পংক্তি লিখিয়া সুখ্যাতি করিলেই যে কবিকে উৎসাহ দেওয়া হইল, তাহা নহে। কবির কাব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় না হইলে তাঁহাকে প্রকৃত উৎসাহ দেওয়া হয় না। বাঙ্গালার কবিরা উৎসাহ পাইলে, বাঙ্গালার অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে। বাঙ্গালায় সুকবি অপেক্ষা কুকবির সংখ্যা বড় অধিক। বাঙ্গালি প্রথম লিখিতে আরম্ভ করিলে, কবি হইবার চেষ্টা করে। পাঠশালার বালকেরা পর্য্যন্ত যখন প্রথম রচনা আরম্ভ করে তাহা পদ্যে—গদ্যে নহে। এই সকল বালক-কবি সাহিত্য-আসরে নামিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালায় কাব্যের বাজার এত ছড়াছড়ি।

এই তিন শ্রেণীর লেখক ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালায় আর বড় লেখক থাকে না; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল স্কুলপাঠ্য এবং নাটক নভেলও কাব্য লেখক ভিন্ন অন্য লেখকের বাঙ্গালায় তেমন আদর নাই—তাহাদের পাঠক জোটে না। বাঙ্গালায় যে সকল ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক আছে, তাহা এরূপ ভাবের লেখা যে পাঠশালার বালকেরা শিক্ষকের ভয়ে বাধ্য হইয়া তাহা পড়িবে, অন্য কাহার তাহা পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। অনেক লেখককে বাঙ্গালাভাষার গৌরব করিতে

আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু যখন আমরা এই বিষয় ভাবি, তখন আমাদের মস্তক নত করিতে হয়। ভারতবাসীর লিখিত ভারতের ইতিহাস নাই বলিলে অনেক বাঙ্গালি গালি মনে করেন; কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগেও সুসভ্য কৃতবিদ্য বাঙ্গালির আপনার দেশের বিদেশীয়-লিখিত ইতিহাস ভিন্ন স্বদেশীয় লিখিত প্রকৃত ইতিহাস নাই। কিন্তু এ দোষ কাহার? লেখকের না সুরুচি সম্পন্ন প্রবলপ্রতাপান্বিত বাঙ্গালায় পাঠক মহাশয়দিগের? আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—এ দোষ লেখক অপেক্ষা পাঠকের অধিক। বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে যে "বাঙ্গালির উৎপত্তি" লিখিতেছিলেন, বঙ্গদর্শনের কয়জন পাঠক তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন? আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি বঙ্গদর্শনের সে দিগের পাতা পর্য্যন্ত অনেকে কাটেন নাই তবুও বঙ্কিম বাবু বুদ্ধি খরচ করিয়া "বাঙ্গালার ইতিহাস" নাম দেন নাই, তাহা হইলে ত স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লিখিতেছেন বলিয়া অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। আর সে দিন বঙ্গদর্শনে তাঁহার "কমলাকান্তের জবানবন্দি" বাহির হইলে, কত পাঠক আহ্লাদের সহিত তাহা পাঠ করিয়া হাসির তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এ সকল স্বচক্ষে দেখিয়া বাঙ্গালার পাঠকের রুচির দোষ ভিন্ন আমরা আর কি বলিব? আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—রজনী বাবুর "সিপাইযুদ্ধের ইতিহাস" ৪।৫ বৎসরে ও প্রথম খণ্ড বই আর বাহির হইল না। আর এই ৪।৫ বৎসরের মধ্যে তিনি ৫।৬ খানা স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিলেন, তাহাদের আবার ২।৩ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, জীবনচরিত সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। //

আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রদিগের জন্যে যে সকল গণিত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সমস্তগুলিই ইংরাজীর অনুবাদ, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। এ দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার এই সূত্রপাত হইয়াছে, সুতরাং এখন ও বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পুস্তক হয় নাই; কিন্তু বিজ্ঞান চর্চ্চার দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে অনেক আশা হয়। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে রামদাস বাবু "ঐতিহাসিক রহস্য" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার একটি অভাব পূরণ

করিয়াছেন, তাঁহার ঐ পুস্তকে অনেক প্রত্নতত্ত্ব বাহির হইয়াছে। ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, এবং অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালায় এখনও বাহির হয় নাই।

বাঙ্গালায় যে কয়েকজন সুলেখক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুই চারি খানি পুস্তক লিখিয়াই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু সুলেখকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমাদের তাহাতে আশা মেটে না। বঙ্কিম বাবু নানা বিষয়ে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট নই, আমরা আরো অনেক পুস্তক তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করি। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় এই অল্প বয়সে নানা রকমে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিলে ভবিষ্যতে আরো অনেক পুস্তক লিখিবেন, তাঁহার অধ্যবসায়কে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী বান্ধব প্রভৃতি কয়খানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি করিতেছে। এই সকল মাসিক পত্রে আমরা সকল বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকি। ইহাদের সম্পাদক ও লেখকগণের নিকট বাঙ্গালা ভাষা অনেক বিষয়ে ঋণী,—ভবিষ্যতে এই সকল লেখকের দ্বারা ভাষা গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে এক "ভারতী" ভিন্ন কোন খানিই নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হয় না। তাহার প্রধান কারণ গ্রাহকেরা রীতিমত আপনার দেয় মূল্য দেয় না। বঙ্গদেশের ন্যায় পৃথিবীর কোন অংশে গ্রাহকের এরূপ নীচ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা গ্রাহক হইয়া সম্পাদককে অনুগৃহিত করেন, মনে করিয়া থাকেন; মূল্য দিবার কথা শুনিলে চটিয়া উঠেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগের অত্যাচার আরো ভয়ানক, তাঁহারা এক পয়সার পোষ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহক হন, তাহাতে লেখা থাকে যে পত্রিকা প্রাপ্তি মাত্রেই মূল্য পাঠাইব, কিন্তু একবার পত্রিকা পাইলে একবারে গা ঢাকা দেন। ঈশ্বর জানেন কত দিনে আমাদের এ কলঙ্ক দূর হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় সমালোচ্য বাঙ্গালার পাঠক। বড় দুঃখের সহিত আমাদের এস্থলে বলিতে হইল, যে বাঙ্গালার পাঠক সংখ্যা এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। যদি ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে ছয় লক্ষ

বাঙ্গালি থাকে, তবে তাহার মধ্যে পঁচিশ হাজার লোক ও রীতিমত পাঠকদল-ভুক্ত নয়। এখন বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ পাঠক নাই—এই বিষয় মনে হইলে আমাদের বড় লজ্জা বোধ হয়। পুস্তক প্রণয়ন করা অপেক্ষা যাহাতে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা এখন বড় আবশ্যক হইয়াছে। বটতলার লেখকদিগের উপর যিনি যত তীব্র আক্রমণ করুন না কেন, তাহারা আমাদের অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি করিতেছে। কারণ তাহাদের পাঠক সংখ্যা অগণনীয়। আমরা একখানি পুস্তক লিখিয়া পাঁচ শত কাপির অধিক মুদ্রিত করিতে শঙ্কিত হই, কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, যে তাহাদের অনেক পুস্তকই ৪।৫ হাজার এককালে মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানে প্রেরিত হয়, একটি ক্ষুদ্রপল্লীর হাটে, বাজারে, মাঠে এবং রাস্তাতেও ইহাদের পাঠকেরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সাহায্য লইলে আমাদের পাঠকশ্রেণী বৃদ্ধি হইতে পারে। সুরুচি-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া অল্প মূল্যে ইহাদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতে পারিলে, অনেক পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। যাহারা এই সকল কদর্য্য পুস্তক পাঠ করে, তাহাদের এক প্রকার পাঠ তৃষ্ণা জন্মিয়াছে, সুতরাং অল্প মূল্যের ঐ সকল পুস্তক তাহাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিলে, তাহারা নিশ্চয় তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইলে, আমাদের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। আর একটি কথা—এ দেশের সাধারণ পাঠক-দিগের রুচি বড় দোষনীয়। সে রুচির পরিবর্ত্তন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ইহার জন্যে আমাদের কতকগুলি সমালোচক আবশ্যক, এক্ষণে দেখা যাউক, সমালোচক ভায়ারা কি করিতেছেন।

আমাদের দেশে সমালোচকের সংখ্যা বড় অল্প। ৪।৫ জন সম্প্রতি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা এই নবজীবন লাভ করিয়া যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে হৃদয়ে অনেক আশা হয়। এখন আমাদের আরো জনকতক চিন্তাশীল সমালোচকের আবশ্যক আছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে এ দেশে জনকতক তীব্র সমালোচক আছেন, তাঁহাদের চক্ষে

সকল পুস্তকেই তাঁহারা কেবল দোষের অংশ দেখিয়া থাকেন। আমাদের মতে তীব্র সমালোচনা করা কিম্বা সমালোচনা করিতে করিতে রসিকতা করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ করা এখন উচিত নহে। তীব্র সমালোচনার সময় এখনও আমাদের হয় নাই। বন্ধুভাবে গ্রন্থকারের দোষগুণের বিচার করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণের রুচির পরিবর্ত্তন করাই সমালোচকের কার্য্য।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, লেখক, পাঠক ও সমালোচকদিগের ভালরূপ সমালোচনা করা যাইতে পারে না। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অনেক অংশে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, ভরসা করি সাধারণে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

আর্য্যচিকিৎসা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(১০৪ পৃষ্ঠার পর।)

দেশ প্রবিভাগ।

দেশ তিন প্রকার।—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। যে দেশে পর্ব্বত, নদ্যাদি জলাশয় ও বৃক্ষাদি অল্পমাত্র থাকে, তাহাকে জাঙ্গল দেশ কহে। জাঙ্গল দেশে বায়ুর অত্যন্ত আধিক্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে দেশের উদ্ভিজ্জ পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি সকলেতেই বায়ুর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

যে দেশে অধিক পরিমাণে নদী, ক্ষুদ্র২ জলাশয়, পর্ব্বত ও বহুবিধ বিশাল বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়, অল্পমাত্র বায়ু বহে, ও সতত ছায়াতে ভূমি আচ্ছন্ন, তাহাকে আনূপ দেশ কহে। আনূপ দেশ স্বভাবতঃ শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

জাঙ্গল ও আনূপ এই উভয়ের মধ্যবিধ দেশকে সাধারণ দেশ কহে।

সাধারণ দেশে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বাতাদি দোষত্রয়ের সমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঈদৃশ দেশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রকৃতি বর্ণন।

শুক্র শোণিতের সংযোগকালে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে দোষ প্রবলভাবে থাকে, তদ্দ্বারা জীবের প্রকৃতি বিশেষ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি সাত প্রকার।—যথা বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতপিত্ত প্রকৃতি, পিত্ত শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, ও ত্রিদোষ প্রকৃতি।

জগতে সচরাচর যতপ্রকার মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকেই ইহাদের কোন না কোন এক প্রকৃতিবিশিষ্ট।

বাতপ্রকৃতি মনুষ্যগণ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ, জাগরণশীল, অসংলগ্নভাষী নখদন্তখাদী, চঞ্চলচিত্ত, শীতবিদ্বেষী, দুর্ভগ, মাৎসর্য্যবিশিষ্ট, আমোদপ্রিয়, কৃতঘ্ন, কৃশ, বাচাল, দ্রুতগমনশীল, অবিশ্বাসী, ধন ও মিত্রসঞ্চয়ে মন্দ, ক্ষুদ্র চিত্ত ও ধৈর্য্যহীন হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর কর্কশ ও শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, শ্মশ্রু, নখ ও কেশ রুক্ষ, হস্ত ও পাদতল রক্তবর্ণ, এবং স্বভাব ঠিক্ ছাগ, শৃগাল, শশক, মূষিক, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ, কাক ও গর্দ্দভাদি জন্তুর ন্যায়। ইহারা স্বপ্নে আকাশপথে ভ্রমণ করে।

পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যেরা শ্রীহীন, বলি পলিতবিশিষ্ট, উচিতবক্তা, ভাবগ্রাহী, বহুভোজী, প্রখর বুদ্ধি, উষ্ণদ্বেষী, মেধাবী ও সাহসী। ইহাদের অঙ্গ অধিক ঘর্ম্মযুক্ত, পীতবর্ণ ও শিথিল; নখ, চক্ষু, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ হস্ত ও পাদতল তাম্রবর্ণ, এবং মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ইহারা কখন কাহার নিকট ভয়ে মূঢ়তা স্বীকার করে না; কিন্তু স্মরণাগত ও প্রণত ব্যক্তিদিগকে সতত প্রিয়বাক্যে তুষ্ট রাখিতে যত্ন করে। ইহাদের অতি সামান্য কারণেই ক্রোধের উদয় হয়, আবার সেইরূপ অল্পেই তাহা শান্ত হইয়া যায়। ইহারা স্বপ্নে সুবর্ণ, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা দর্শন করে; এবং ইহাদের স্বভাব সর্প, পেচক, গন্ধর্ব্ব (জন্তু বিশেষ), বনবিড়াল, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুল ইত্যাদি জন্তুর সদৃশ।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যগণ, গম্ভীববুদ্ধি, শ্রীমান, বলবান, লক্ষ্মীবান, ধৈর্য্যশীল স্থুলাঙ্গবিশিষ্ট, লোভশূন্য, সহিষ্ণু, কৃতজ্ঞ, মিষ্টদ্রব্যপ্রিয়, দৃঢ়বৈর, ক্লেশক্ষম, শুক্লনেত্র, গুরুজনের সম্মানকারী, প্রতিজ্ঞাপালক, ও সৎগুণবিশিষ্ট। ইহাদের কেশ সকল দৃঢ়, কুটিল, ও কৃষ্ণবর্ণ, স্বর মেঘ, মৃদঙ্গ ও সিংহের ন্যায় গম্ভীর; বর্ণ দূর্ব্বা, ইন্দীবর, প্রিয়ঙ্গু, শরকাণ্ড, কুশ, গোরচনা, ইহাদের অন্ত-ভাগের বর্ণের সদৃশ; ও নেত্রের প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ। ইহাদের মিত্র ও ধন স্থির থাকে ও শাস্ত্রে দৃঢ়বুদ্ধি জন্মে। ইহারা স্বপ্নে কমল, হংস, ও চক্রবাকাদি সমাকীর্ণ মনোহর সরোবর দর্শন করে। এই প্রকৃতিশালী মনুষ্যদিগের স্বভাব ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ, অশ্ব, গো, বৃষ ও হংসের ন্যায়।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের পরস্পর সংমিশ্রণ জন্য যে সংস-র্গিক প্রকৃতি জন্মে, তাহা লক্ষণদ্বারা নিরূপণ করিতে হইবে।

যে সকল মনুষ্য গর্ভস্থানদি সম্প্রকৃতি, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমানাংশভোগীরূপে দৃশ্য হয়েন তাঁহারা প্রায়ই অরোগী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে সকল রসই সমরূপ ব্যবহারে উপকারী হয়। বায়ুপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি বিশিষ্টেরা সর্ব্বদাই রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি বিশেষের প্রকোপ, ক্ষয় বা অন্যথাভাব স্বভাবতঃ হয় না। অর্থাৎ যাহার বায়ুপ্রকৃতি, তাহার শরীরে বায়ু কখনই কুপিত, বিকৃত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিষোৎপন্ন কীট, বিষ কর্ত্তৃক যেমন বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি কর্ত্তৃক জীবের কোন পীড়া সহসা জন্মিতে পারে না। তবে যদি এমন কাহার জন্মিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সে কখনই বাঁচে না।

মানবদিগের বয়স চারিভাগে বিভক্ত।—যথা, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য। জন্মকাল হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে বাল্য; ১৬ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে যৌবন, ৪০ হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে প্রৌঢ়, ৭০ হইতে তৎপরবর্ত্তী সমস্ত জীবনকালকে বার্দ্ধক্য বলে। এবং ঐ নির্দ্দিষ্টকালভুক্ত ব্যক্তিগণকে যথাক্রমে বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কহে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রতাপ।

(১২৩ পৃষ্ঠার পর।)

তাহার পর গল্‌ষ্টন্ ও জনসন্ নামে দুইজন ইংরাজ আসিয়া যখন প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিল, তখন ও প্রতাপের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রামচরণ প্রতাপকে অন্ধকারে লুকাইতে বলিলে, তিনি বলিলেন—"আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে তাহাদের দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।"

প্রতাপের এই বীরবাক্য শুনিলে মনে বড় আনন্দ হয়; আবার যখন "আমি প্রতাপ রায়" নির্ভীকহৃদয়ে ইংরাজদ্বয়কে আপনার পরিচয় দিলেন, তাহাও বড় সুন্দর। বাঙ্গালিচরিত্রে সে সকল গুণ দুর্লভ। সেই গুণ অভাবে কত অনিষ্ট হয়, তাহা কবি রামচরণের দ্বারা দেখাইয়াছেন। তাহাকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দেখিয়া জন্‌সন্ তাহাকে লক্ষ্য করিল, রামচরণ, চরণে আহত হইয়া বসিয়া পড়িল। সুতরাং যথাসময়ে প্রতাপের বন্দুক আসিয়া পৌঁছিল না। প্রতাপ নিঃশব্দে ইংরাজের বন্দী হইয়া চলিলেন।

তাহার পর শৈবলিনী নবাবের নিকট সাহায্য পাইয়া কৌশলে প্রতাপকে কারামুক্ত করিয়া গঙ্গায় সাঁতার দিয়া যখন দুইজনে পলাইতেছিল, সে দৃশ্য কি মনোহর! আবার সে সাঁতার কি সুখের সাঁতার! 'সেই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীরবক্ষে, চন্দ্রকরসাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে' সাঁতার কি সুখের সাঁতার নহে?

প্রতাপ শৈবলিনীকে সর্পিনীর ন্যায় ভয় করিত, প্রাণান্তেও কখন ও তাহার সম্মুখে যাইত না। প্রতাপ জানিত যে, শৈবলিনী তাহার আদরের ধন হইলেও এখন সে পরস্ত্রী, সেই জন্য তিনি যতদূর পারিতেন তাঁহার ভালবাসা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া হৃদয়কে বশ করিতেন। তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না যে শৈবলিনী এখনও তাহাকে এতদূর ভাল বাসে এবং

তাহার জন্যই সে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। সেই রাত্রে তাঁহার শব গৃহে শৈবলিনীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সকলি জানিতে পারিলেন। ভালবাসিলে ভালবাসিতে হয়, এইটি স্বাভাবিক নিয়ম, শৈবলিনীর হৃদয়ের ভাব জানিয়া প্রতাপেরও ঘুমন্ত ভালবাসা জাগন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই আজ সাঁতার দিতে দিতে "শৈবলিনী—শৈ।" বলিয়া ডাকিল। সে কথা শুনিয়া শৈবলিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে 'অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিয়া' বলিল—"প্রতাপ! আজও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ এই সময় আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বুঝিলেন। ধর্ম্মের কঠোর শাসন তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, ধর্ম্মভয় প্রতাপের মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শৈবলিনীর বেগশালী প্রণয়স্রোত ফিরাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। উপায় এখন বড় সহজ বোধ হইল, কারণ প্রতাপ জানিতেন যে, শৈবলিনী তাঁহার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে পারিবে না, তাই তিনি বলিলেন "আমি আজি মরিব। তামাসা নয়—নিশ্চয় ডুবিব।"

শৈবলিনী জানিত যে প্রতাপ মৃত্যুকে ভয় করে না, একদিন এই গঙ্গায়ই তাহার পরিচয় পাইয়াছিল,—শৈবলিনী সে কথা ভোলে নাই। তাই সে বলিল—"কি চাও প্রতাপ? যা বল, তাই করিব।" তখন প্রতাপ তাহাকে একটী শপথ করিতে বলিল। শপথের নাম শুনিয়া শৈবলিনীর হৃদয় আকুল হইল, 'তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।' প্রতাপ পুনরায় বলিলেন—"আমায় শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্যে প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?'

তাহার পর শৈবলিনী শপথ করিতে প্রস্তুত হইলে বলিলেন—"শপথ কর, যে এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্য—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এ জন্মে তুমি আমায় অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্য চক্ষে ভাবিবে না। শপথ কর।'

আবার বলি, ধন্য প্রতাপ! রমানন্দস্বামী তোমায় যথার্থই বলিয়াছেন, যে 'ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না।' প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে এইরূপ গুরুতর সম্পর্ক না করিলে শৈবলিনীর চিত্ত ফিরিবে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় ফিরাইবার ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এ কথায় শৈবলিনী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—"এ সংসারে আমার মতন দুঃখী কে আছে প্রতাপ?" প্রতাপ উত্তর করিলেন—"আমি।"

এই এক "আমি" শব্দ দ্বারা কবি প্রতাপের হৃদয়ের ভাব যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ করা যায় নাই। প্রতাপের হৃদয় ও তখন যে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতেছে, তাহা আমরা ইহাতেই বুঝিতে পারি। প্রতাপ যদি শৈবলিনীকে এখন ভাল না বাসিত, তাহা হইলে এ স্থলের এই অভিনয় এত সুন্দর হইত না। শৈবলিনীর এখন মরণে ভয় নাই, কারণ এখন তাহার জীবনের আশা ফুরাইয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রতাপ মরিবে তাহা প্রাণ থাকিতে সহ্য হইবে না। সুতরাং অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে, পূর্ব্বমত শপথ করিল। উভয়ে তাহার পর তীরে উঠিল। প্রতাপ আজ এই গঙ্গাজলে কেবল শৈবলিনীর জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিল না তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ও সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিল।

শৈবলিনী প্রতাপের অজ্ঞাতসারে ছিপ হইতে পলায়ন করিলে পর, প্রতাপ তখন মনে করিলেন যে শৈবলিনী মরিয়াছে। তখন তিনি আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—এখন প্রতাপ দস্যু। কিন্তু তাঁহার দস্যুতা ভিন্নরূপ। তিনি 'আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। কবিবর স্কটের "লেডি অফ দি লেকের" (Lady of the Lake) রডারিক ও একজন দস্যু ছিল, কিন্তু সে দস্যুতার সহিত প্রতাপের এ দস্যুতার প্রভেদ আছে, দস্যুতা রডারিকের জীবনোপায় ছিল, প্রতাপের তাহা নহে।

এখন ইংরাজ জাতির উপর প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল, কারণ ইংরাজ বাঙ্গালায় না আসিলে ফষ্টারের সঙ্গে শৈবলিনী গৃহত্যাগিনী হইয়া শেষে এইরূপে মরিত না। আসল কথা, প্রতাপের হৃদয়ে তখন প্রতি-

হিংসার জ্বলন্ত বহ্নি জ্বলিতেছিল, ইংরাজ রক্তে সে বহ্নি নির্ব্বাণ হইবার সম্ভব, তাই বীরের হৃদয়ে যুদ্ধতৃষ্ণা বলবতী হইল। এই সময় নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, প্রতাপ আপনার লাঠিয়াল এবং দস্যু লইয়া ইংরাজের রসদ এবং যে গ্রামে ইংরাজের সাহায্য করিবে, তাহা লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতাপ যে এ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার কারণ শুদ্ধ প্রতিহিংসা নহে, তাঁহার হৃদয়ে আর একটু স্বার্থ ছিল—সে স্বার্থ এই—'নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে, দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব।' আমরা মনুষ্যহৃদয় যে স্বার্থহীন নয় তাহা স্বীকার করি বটে, কিন্তু প্রতাপ সাধারণ মনুষ্য নহে, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে এরূপ স্বার্থ আমরা অনুমোদন করি না। কবি সে নির্ম্মল হৃদয়ে কেন যে এই কালির দাগ দিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে, বোধ হয়, ইতিহাসের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়াই বঙ্কিম বাবুর রঞ্জন-তুলিকা এই কলঙ্কস্পৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেলে পর ইংরাজেরা যে দিন নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তখন সে শিবিরে শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর ও রমানন্দস্বামী ছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া পথে দেখিলেন যে 'একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা রণমত্ত হইয়া দর্পিতপদে পর্ব্বত-রন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া ইংরাজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে।' তাঁহারা তাহার অশ্বারোহী সেনানায়ককে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে ইনি প্রতাপ রায়। প্রতাপ চন্দ্রশেখরের ও শৈবলিনীর বিষয় পূর্ব্বেই সমস্ত জানিতেন। তিনি তাহাদিগকেই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহার পর পর্ব্বতমালার মধ্যস্থ নির্গমন পথ দিয়া তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে আনিলেন। সেখানে আসিয়া চন্দ্রশেখর প্রতাপকে ধন্যবাদ দিয়া দরবারের সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন—"এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। শৈবলিনী পাগলিনী হইয়াছিল, কিন্তু আজ হইতে তাহার জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু সে কথা এখনও কেহ জানে না। শৈবলিনী প্রতাপকে হস্তেঙ্গিতের দ্বারা ডাকিল, প্রতাপ দেখিল যে এখন শৈবলিনী প্রকৃতিস্থা হইয়াছে, কিন্তু শৈবলিনী তাহাকে এখন সে কথা গোপন করিতে বলিল। প্রতাপ শৈব-

লিনীকে তাহার পূর্ব্বকৃত মনের পাপ প্রকাশ করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।"

শৈবলিনী তাহার উত্তরে বলিল—"আমি সুখী হইব না, তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই"। সে কথা প্রতাপের হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রশেখর অনেকবার বারণ করিলেন কিন্তু প্রতাপ অতি মধুর হাসি হাসিয়া "আমার প্রয়োজন আছে" বলিয়া অশ্বে কষাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। সে হাসি সাধারণ হাসি নয়, তাহা মহান্ অর্থপূর্ণ। সে প্রয়োজন সাধারণ প্রয়োজন নহে, তাহা পরোপকারের জন্য নিজের জীবনবিসর্জ্জন। প্রতাপ এখন শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য দেশের শত্রু ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিলেন। প্রতাপের সকলি অসাধারণ—তাঁহার মরণও সাধারণ মরণ নহে!

তাহার পর আর একবার মাত্র প্রতাপের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। সে স্থান সে দৃশ্য এত ভয়ানক যে তাহা মনে ভাবিলেও আমাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে—আমরা তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। সে স্থান রণভূমি, সে দৃশ্যে প্রতাপ বীরদর্পে ইংরাজের অসংখ্য সেনা নিপাত করিয়া এখন গুরুতর আঘাতে সেই রণভূমিতে মৃতপ্রায়।

রমানন্দস্বামী অনেক অনুসন্ধানের পর অসংখ্য স্তূপাকৃত মৃতদেহের মধ্য হইতে তাঁহাকে বাহির করিলেন। মুখে জল দিয়া চেতনা সঞ্চার হইলে, তাঁহাদের বারণ সত্ত্বেও এই দুর্জ্জয় রণে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতাপ শৈবলিনীর সহিত যাহা যাহা কথা হইয়াছিল, সে সমস্ত কথা এবং এ কথায় তাঁহার মনের অবস্থা কি রূপ হইয়াছিল, তাহা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

আত্মবিসর্জ্জনের এরূপ সুন্দর চিত্র আর কোথাও আছে কি?

সেই মৃতপ্রায় অবস্থায় রমানন্দস্বামী শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রতাপ সুপ্তসিংহের ন্যায় জাগরিত হইয়া

উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী ! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে। কে বুঝিবে, আজি-এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

প্রতাপের শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসা তাহার শিরায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। আজ তাহার মৃত্যুকালে রমানন্দস্বামী সে কথার উল্লেখ না করিলে জগতের কোন লোক তাহা জানিতে পারিত না। তাহার পর ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কালের অনন্ত ক্রোড়ে প্রতাপ চির-কালের জন্য বিরামলাভ করিলেন। আকাশের উজ্জ্বল তারা খসিয়া পড়িল।

আমরাও কবির সহিত এইখানে বলি—"যাও, প্রতাপ ! অনন্ত-ধামে। যাও যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও ! যেখানে রূপ অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময়লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভাল বাসিতে চাহিবে না।"

উপসংহারকালে আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, বঙ্কিম বাবু এই লোভপরবশ, কাপুরুষ, ভীরু, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বঙ্গসমাজকে যে উদ্দেশে এই প্রতাপচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা যেন সফল হয়—যেন বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতাপ আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হানিম্যানের জীবন চরিত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। এই জীবন চরিত প্রথমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত

হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ইহা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। হোমিওপ্যাথিক আবিষ্কারকের জীবন চরিত পাঠ করিলে যে উপকার হইবে তাহা বোধ হয় কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। এই জীবনী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে, এক্ষেত্রে সে স্থান নাই। বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে ইহার সবিস্তার সমালোচনা করিব।

হরধনুর্ভঙ্গ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। রাজকৃষ্ণ বাবুর এই নূতন দৃশ্যকাব্য পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকখানি লিখিতে হইল," বোধ হয় এত অল্পসময় মধ্যে ইহা লিখিতে হইয়াছে বলিয়াই কোন২ স্থান অন্যান্য অংশের ন্যায় তত সুন্দর হয় নাই। রামায়ণে যে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিলক্ষণ দখল আছে, রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ও সীতার চিত্র বড় সুন্দর হইয়াছে। আমরা তাঁহার (দীর্ঘ ভূমিকা সত্ত্বেও) ছন্দের অনুমোদন করি না, অভিনয়ের জন্য ফরমাইস মত এরূপ ছন্দে লিখেন ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন তিনি কোন পদ্যে ইহা ব্যবহার না করেন, এইটি আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

কয়েকখানি পত্র। পুস্তকে লেখকের নাম নাই। ইহার উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষা, উদ্দেশ্য মহৎ, তজ্জন্য লেখক ধন্যবাদের পাত্র। পত্র কয়খানি প্রিয়তমাকে লেখা হইয়াছে সুতরাং ইহা বড় গোপনীয়, গ্রন্থকার এরূপ গোপনীয় পত্র প্রকাশ করাতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু আমরা সে আপত্তি করি না।

প্রণয় কণ্টক। শ্রীসত্যভূষণ কর্মকার প্রণীত। পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা একখানি প্রহসন। প্রহসন খানির উদ্দেশ্য ভাল, লেখা মোটের উপর মন্দ নয়। কিন্তু স্থানে স্থানে বড় কদর্য্যভাব সকল প্রকাশ করা হইয়াছে, গ্রন্থকারের রুচি বড় দূষণীয়।

বাসন্তী। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অবকাশ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নবন্যাস খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। ইহার দেবেন্দ্র ও বাসন্তীর প্রণয়ের চিত্রটি বড় সুন্দর হইয়াছে। ঘটনা—যোজনায় তত পারিপাট্য না থাকিলেও আমরা ইহার ভাষার সুখ্যাতি করি।

নববর্ষ।

ভৈরব—চৌতাল।

বরষ আইল, ভুবন ভাতিল
অপরূপ রূপরাগে।
ধাতার আদেশে নব উষা হেসে
শোভিল পূরবভাগে।
কালস্রোতসঙ্গ একটি তরঙ্গ
মিশা'যে পড়েছে চলি ;
কে জানে কখন একটি বাঁধন
এলা'য়ে গিয়াছে খুলি।
যা কেহ দেখে নি যা কেহ শুনে নি
ধরা হেরে তাই আজ—
নবীন যুবতি নবীন ভূপতি
নবীন বরষরাজ।
নব রবি উঠে, নব বায় ছুটে,
পাখী গায় নব গীতি ;
সেই গীতিচ্ছলে দিগঙ্গনাদলে
পূজে মিলে নবপতি।
এ নব বরষে কেন রে অলসে
কেন আর ভাঙা প্রাণে,
জাগ্ রে কল্পনে ! বাজা তোর বীণে
নব নব নব তানে।

শিক্ষাসমিতি।

সত্য বটে, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধবিষয়ক ইতিহাস স্বার্থপরতার একটী পূর্ণ কাহিনী মাত্র ; সত্যবটে, প্রজাবর্গকে যে শিক্ষা প্রদান করা রাজার অবশ্য করণীয়, সে শিক্ষাদানবিষয়েও ইংরাজরাজ প্রথমতঃ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন ; সত্য বটে, রাজকীয় কর্ম্মনির্ব্বাহের সুবিধা বিধান হেতুই ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ; কিন্তু এগুলি যেমন সত্য কথা, ভারতবাসী, ইংরাজ অনুগ্রহে, মাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানে উদ্বোধিত হওয়াতেই যে উন্নতি পথে নীত হইতেছে তাহাও তেমনি ইংরাজি শিক্ষা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের যৎপরোনাস্তি কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ প্রণোদনাও যে প্রথম অবস্থায় স্বার্থপরতা-কলুষিত ছিল একথা এস্থলে উপেক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। যদি কিছুতে ভারতবাসীকে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ করিয়া থাকে ত তাহা শিক্ষার বিস্তার,—যদি কিছুতে সমাজমস্তক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরাজভক্ত করিয়া থাকে ত সে তাহার শিক্ষা। অথচ ভারতীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে বাঙ্গালী এ শিক্ষার বিশেষ ফলভাগী—বাঙ্গালী ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত—বাঙ্গালা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী। সুতরাং শিক্ষাবিষয়ক কোন কথা উত্থাপিত হইলে বাঙ্গালী যে তাহা আদরে গ্রহণ করিবে—বাঙ্গালী যে অন্য সকলের অপেক্ষা ভাল বুঝিবে তাহা আর কাহকেও বলিতে হইবে না। সম্প্রতি সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনার্থ একটী শিক্ষাসমিতি সংগঠিত হইতে দেখিয়া বাঙ্গালীহৃদয় বড় আনন্দিত হইয়াছে ; কিন্তু দুঃখের কপালে সুখ নাই। এই আনন্দের ভিতরেও আশঙ্কা আসিয়া দেখা দিয়াছে। আশঙ্কা এই যে, পাছে ইহাতেও চিরপ্রথানুযায়ী স্বার্থপরতা আসিয়া মিশ্রিত হয়। তাই, আজ কল্পনায় আমরা দুই একটী কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

যাঁহারা দেশের খবর রাখেন, ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া সমাজনীতি ও রাজনীতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, লর্ড ডেলহৌসীর রাজত্ব সময়ে Sir Charles Wood(এখনকার Lord Halifax) শিক্ষা বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত বিধানহেতু একটী অনুষ্ঠানলিপি প্রস্তুত করেন। সে খানি ভারতবাসীর বড় আদরের সামগ্রী—বড় যতনের ধন। সেখানি একখানি প্রধান সনন্দ বলিয়া পরিগৃহীত। বলিতে কি, ইংরাজের যেমন Magna Charta—১৮৫৪ খ্রীঃ ভারতবাসীর তেমনি শিক্ষাবিষয়ক রাজানুষ্ঠানলিপি। যাহাতে সাধারণ শিক্ষা সকল শ্রেণীর মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণই সে বিজ্ঞাপনীর মূল মর্ম্ম। সেই বিজ্ঞাপনী-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতঃ কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে কি না সময়ে ২ সে বিষয় আন্দোলন হইয়া থাকে। রাজপ্রতিনিধির পর রাজপ্রতিনিধি যিনি যখন ভারতীয় রাজ্যের কর্ণধার হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই তখন উক্ত অনুষ্ঠানলিপি শিরোধার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং তাহা হইবারই কথা। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ শিক্ষার উপরই ভারতবর্ষস্থ এই পঞ্চবিংশকোটী মানবমণ্ডলীর অদৃষ্ট-বিপর্য্যয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কে বলিতে পারে ভারতবাসীর অদৃষ্টে ভবিষ্যতের জন্য কি আছে? যাহা হউক, ১৮৭১ খৃঃ যখন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে স্থানীয় শাসনভার অর্পিত হয়, তখন শিক্ষাভারও স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে গমন করে। শিক্ষা বিষয়ে সেই একবার শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তাহার পর মধ্যে ২ এ বিষয়ে কথা উঠিত বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। লর্ড নর্থব্রুক কিছু করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু শাসনকার্য্য অন্য দিকে আকর্ষিত হওয়ায় এ বিষয় কিছু করিতে পারেন নাই।

সে দিন যখন উদারনীতিক লর্ড রিপন ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া এ দেশে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, General Council of Education in India হইতে মিশনরি-প্রমুখ জনষ্টন সাহেব ও লর্ড হালিফাক্স স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ রাজানুষ্ঠানলিপির প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ

করেন। তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া আসেন। সেই অবধিই আমরা মনে মনে করিয়া আসিতেছি, শিক্ষা বিষয়ে কি একখানা হইবে। বিশেষ আশঙ্কা—মিশনরি ইহার গোড়ায়। যাহা হউক, আজি দশ বৎসরের পর পুনরায় শিক্ষাবিষয়ক ফলাফলের সমালোচনহেতু একটী শিক্ষাসমিতির অভিষেক হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বোক্ত আন্দোলনের ফল লর্ড রিপন তাহা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। সঙ্কুচিত হইয়াছেন বলিয়াই আমাদের আরও আশঙ্কা। আমাদের আশঙ্কা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের যেরূপ বোধ হইতেছে, আমরা তাহাই স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি। আমরা জানি না, এই পর্ব্বতপ্রমাণ কার্য্যানুষ্ঠান ইন্দুরপ্রসূ হইবে কি না।

প্রথমেই তিনটী প্রধান ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাসমিতির বিবেচনাধীন করা হয় নাই। এক, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কার্য্যকলাপ; অপর, বিশেষ শিক্ষা, যথা—আইন, চিকিৎসা, ও ইঞ্জিনিয়ারিং; শেষ, ইউরোপীয় শিক্ষা। কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অসদৃশ উপায় অবলম্বনের গূঢ় কারণ কি? লর্ড রিপন বলেন যে, তাহা করিতে গেলে শিক্ষাসমিতির কার্য্য বহুলবিস্তৃত হইয়া উঠে। কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এ কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন? বলিতে কি, আমরা এজন্য আন্তরিক দুঃখিত ও অতীব আশঙ্কিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা যে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমানের প্রবর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানের উচ্চ আদর্শ ও কার্য্যকরী ক্ষমতার সম্প্রসার করিতে সমর্থ হয় নাই ইহা কিছু অল্প দুঃখের কথা নহে। ইহাতেও কি এ শিক্ষাসমিতির দূষণীয়তা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে না? কেন? সেদিন তো লর্ড রিপন নিজ মুখেই Convocation বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন। তবে কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন শিক্ষাসমিতির কার্য্যানুষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তী হইল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে এখন যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত রহিয়াছে তাহাদের তুলনা এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। এমন সুযোগ আর শীঘ্র ঘটিবার সম্ভাবনা

নাই। পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত তাহা অতীব শোচনীয়। এই অবসরে সে বিষয়ের মীমাংসা হইলে বিশেষ উপকার দর্শাইত। এই কারণ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যানুষ্ঠান শিক্ষাসমিতির বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করিলেন না তাহা কে বলিবে ?

তার পর, বিশেষ শিক্ষা—(১) আইন, (২) চিকিৎসা, (৩) ইঞ্জিনিয়ারিং। এ তিন বিষয়েই অল্পাধিক মাত্রায় অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। প্রথম, সামাজিক জীবমাত্রেরই দেশের আইন কানুন জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার অভাবহেতু অনেক সময়ে বৃথা অনেক অত্যাহিত ভোগ করিতে হয়। সুতরাং আইনশিক্ষা বিষয়ে যতদূর সহজ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে তাহার বিধান কর্ত্তব্য—উকীলের সংখ্যা দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা নাই। সে অভাব দূরীকরণ প্রয়োজন। ২য়, চিকিৎসা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিকিৎসকদিগের হস্তেই সমাজস্থ লোকের জীবন মরণ নিহিত। এই চিকিৎসা বিভাগের সম্যক্ ব্যবহার ও আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যায়ী মহোদয়গণ দেশীয় ঔষধি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পাছে ইংলণ্ডের ঔষধির বাজার মারা যায় এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। উদারহৃদয় চিকিৎসকপ্রধান ওশানসি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। গভর্ণমেণ্ট সে বিষয় চুপে চাপে সারিয়াছিলেন। বুঝিলেন না যে, দেশীয় ঔষধি দেশীয়দিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর। ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ উচ্ছিন্ন যাইতে বসিয়াছে ; ইংরাজি ঔষধির শিরোমণি কুইনাইন শিশি শিশি গলাধঃকৃত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না। তবুও ইহার দেশীয় ঔষধ এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হইল না ; অথচ, ইহার দেশীয় ঔষধ যে আছে তাহা নিঃসংশয়। তার পর,—ইঞ্জিনিয়ারিং। এই খানে আমাদের সকল আশা ভরসার মূলে কুঠারঘাত করা রহিয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কল-কৌশল-যন্ত্র-তন্ত্রময় উন্নতির সময় যে জাতি কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অসমর্থ রহিবেন তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত সন্দেহ নাই। ম্যানুফ্যাকচরির উন্নতি না হইলে কোনও দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, সভ্যসমাজে ইহা একটি পরিগৃহীত স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। যন্ত্রাদি

নির্ম্মাণ-কৌশল না শিখিলে মামুফাকচরি চলে না—সত্য, কিন্তু তাহা কে দেখে ? সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইংলণ্ড মারা যায়। গভর্ণমেন্ট সেই-জন্য মন-ভুলান প্রবোধ দিয়া Engineering college খাড়া রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহা হইতে প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতেছে না। শিক্ষা-সমিতি যদি এ সকল বিষয় মীমাংসা না করিবেন তবে তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন বড় বেশী দেখি না। ইহার গূঢ়নীতি উচ্ছেদ করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্বাধীন নহে। বলিতে পারি না, ইহার ভিতরে কি আছে।

আরও একটি বিষয় শিক্ষাসমিতির বিবেচনাধীন হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। তাহা ইউরোপীয় এবং সেই ইউরোপীয় রক্ত যাহাদের ধমনীতে হোমিওপেথিক মাত্রায় প্রবাহিত সেই ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষা। এখানে আর কথা কহিবার যো নাই। অর্থের যতই অনাটন হউক, আইনের চক্ষে সকল সম্প্রদায় সমান বলিয়া পরিগৃহীত হউক, এখানে সে সকল খাটিবেনা। হিন্দু মুসলমানের অর্থে পরিপুষ্ট ভারতকোষ এই সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে অর্থ রাশি ঢালিয়া দিতেছে, অথচ সেই হিন্দু মুসলমানের শিক্ষার জন্য অর্থের সম্পূর্ণ অনাটন! ইহা কোন্ ন্যায়ও যুক্তির অনুমোদিত আমরা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, এ কয়েকটি প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা-সমিতির কার্য্যবহির্ভূত। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা মূলতঃ দোষপূর্ণ তাহা সকলেই বুঝিতেছেন ; কিন্তু তাহা হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি ? উচ্চ-শিক্ষার মন্দির গুলি স্পষ্টতঃ উঠাইয়া দিতে হইলে বা হস্তান্তরীকরণ করিতে গেলে মহা হুলস্থূল বাঁধিবার সম্ভাবনা। সে সকল গোলে কাজ কি ? তাহাদের দোষপূর্ণজীবন আপনা আপনি লোপ পাইবে। আর নিতান্তই যদি তাহা না হয়, ধীরে ধীরে আজ বেরিলি, কাল আগ্রা, পরশ্ব দিল্লী এইরূপ করিয়া কলেজ গুলি উঠাইয়া দিলেই চলিবে। এদিকে শিক্ষাপ্রণালীর দূষণীয়তা হেতু বালক যুবক সকলেই একপ্রকার ভাবময় (Theoratical)জীবে পরিণত হইতেছে। ইহাদের কার্য্যকরী (Practical) ক্ষমতা আদৌ প্রস্ফুটিত হয় না। একতঃ ভারতবর্ষীয় হিন্দু—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—ভাবময় জীবের প্রতিকৃতি, কার্য্যকরী ক্ষমতায় ইহারা সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ; তাহার

উপর শিক্ষার এই দুষণীয় পদ্ধতি বশতঃ আমাদের অনিষ্টের সীমা নাই। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন না। যে পর্য্যন্ত রাজপুরুষ-দিগের স্বার্থে আঘাত না লাগে, যে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বার্থ যে কোনও প্রকারে বজায় থাকে, সে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এ সকল গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সেই জন্যই উচ্চশিক্ষায় শতদোষ সত্ত্বেও ইহা শিক্ষাসমিতির পর্য্যালোচনা-বিষয়ীভূত হয় নাই। শিক্ষাসমিতির প্রস্তাবে আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এই সকল কারণ-পরম্পরায় আমরা দমিয়া গিয়াছি—আশঙ্কিত হইয়াছি। যাহা হউক, এখনও যাহা আছে তাহা মানে মানে বজায় থাকিলে রক্ষা পাই। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সেগুলিরও সর্ব্বনাশ সাধন বড় বিচিত্র নহে। রুড়কি কলেজের উপর বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে। ধূয়া—সাধারণ শিক্ষা।

এই সাধারণ শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করাই শিক্ষাসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে যাহাতে সামান্য শিক্ষা প্রচলিত হয় শিক্ষাসমিতির মনোযোগ তাহাতে বিশেষ আকর্ষিত হইয়াছে। সত্য সত্যই যদি সাধারণ জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে হয়, তাহার জন্য অগাধ অর্থের প্রয়োজন। তাহাদের হংসপুচ্ছধৃৎ করিলে চলিবে না—করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপযুক্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষিকে কৃষি কর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে, শিল্পকরকে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিতে হইবে, যে যে ব্যবসায়ী তাহাকে সেই ব্যবসায়ের বিষয় উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু, তাহা কি হইবে? আমাদের সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। বলিয়াছি তো, সাধারণ শিক্ষা অগাধ অর্থসাপেক্ষ। সে অর্থ আসে কোথা হইতে? গভর্ণমেণ্ট তাহা দিতে পারেন না। তবে দেশের বড়লোক ধরিয়া, তাহাদের গলায় উপাধিপদক বাঁধিয়া দিয়া, বা অন্য কোন ঐ প্রকার উপায় অবলম্বনের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আছে। সে চেষ্টা কত দূর ফল-প্রসূ হইবে বলিতে পারি না। তবে অর্থ আছে—তাহা মিসনারি-ফণ্ডে। কিন্তু তাহারা কি সাধারণ শিক্ষায় সে অর্থ ব্যয় করিবে? তাহাতে তো লাভ নাই। তবে বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবে যে কথার আঁচ দিয়াছেন,

তাহাই বা কার্য্যে পরিণত হয়! তিনি বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন স্থানের উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহার যোগ্যতা বুঝিয়া গভর্ণমেণ্টের উচ্চশিক্ষার মন্দিরগুলি তাহার হস্তে প্রদত্ত হইবে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, মিশনারিগণের আন্দোলনের ফল এত দিনে ফলিল। উচ্চশিক্ষা ক্রমে ক্রমে তাহাদের হস্তগত হইতে চলিল। তাহা হইতে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, এবং অন্য উপায়ে যে টাকা পাওয়া যাইবে সে গুলি সাধারণ শিক্ষায় ব্যয়িত হইবে। সাধারণ শিক্ষার ধূয়া এইরূপে উচ্চ শিক্ষার সর্ব্বনাশ সাধিবে, হতভাগ্য ভারতবাসীর ইতভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবে; এই Convocation স্থলে যে ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ক ঈঙ্গিত করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপে সম্পূরণ হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আর অধিক বলিতে চাহি না, সেজন্য সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ অনেক চিৎকার ছাড়িয়াছেন। বাস্তবিক, সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা বড়ই আশঙ্কিত হইয়াছি। আমাদের অনুমান মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হউক—এই প্রার্থনা। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ শিক্ষাবিষয়ে স্বার্থপরতার খরদৃষ্টি কমাইয়া দিউন—ইহাই আমাদের কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন। এখন, আমাদের কপাল!

বিদ্যাধর।

রাজস্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, তাহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রত্যেক পৃষ্ঠার আমরা ভারতের অতীতসাক্ষী মহিমার জ্বলন্ত এবং জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রবলপ্রতাপ মহারাজা ভীমসিংহ, স্বদেশবৎসল রাণা প্রতাপ, বীরচূড়ামণি নাগসিংহ প্রভৃতি হিন্দু নরপতিবৃন্দের অমানুষ বীরত্ব এবং অপ্রতিহত সাহসের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, ভারতহিতৈষী হিন্দুর শরীরে আজিও শোণিতপ্রবাহ তীব্রবেগে বহিতে থাকে,—আজিও রাজস্থানের প্রাচীন হিন্দুকুল-গৌরব রাজবংশজদিগের কটিস্থ তরবারি বিদ্যুতীয় বেগের ন্যায় কাঁপিতে থাকে। রাজস্থানের ন্যায় বঙ্গদেশের

কোনও প্রকৃত ইতিহাস নাই স্বীকার করি। স্বীকার করি, সেই জন্যই আজ বাঙ্গালার মহিমা ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বঙ্গসন্তান পিতৃপুরুষগণের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বাঙ্গালী অতীত কাহিনীর সহিত বর্ত্তমানের কথার তুলনা করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু লইয়া যদি সেই আঁধার জালের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া দেখা যায়, অনেক গুলি অস্ফুটদীপ্তি বিমলিন তারকার মন্দভাতি পরিলক্ষিত হইবে। আজ আমরা কল্পনায় তাহারই মধ্যে একটির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালী তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামে সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন ইহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে। ইতিহাসে বাঙ্গালী-চরিত্রে এ সমস্ত মহত্ত্বের কথা পাঠ করিলে নির্জ্জীব বাঙ্গালীর দেহেও দেশানুরাগের তপ্তস্রোত প্রবাহিত হয়, মূহূর্ত্তের জন্য শরীরের প্রতি ক্ষুদ্র শিরা জাতীয় গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠে। ইতিহাস-বর্জ্জিত পূর্ব্ব-মহিমা-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর নিকট আজ এ সব কথা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইতে পারে; বাস্তবিক কল্পনায় বিদ্যাধরের ইতিহাস কল্পনাসম্ভূত নহে। আমরা সেই সকল অসাধারণ গুণরাশির পরিচয় পাইয়া বিমোহিত হইয়াছি বলিয়াই যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পর আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিলাম।

খ্রীঃ ১৬৯৫ অব্দে মহারাজা জয়সিংহ অম্বরের রাজছত্রতলে উপবিষ্ট হয়েন। জয়সিংহ যথার্থ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, সংগীত, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রদ্বয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি-বিষয়িণী খ্যাতি পৃথিবীর দূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাধর পণ্ডিত, মহারাজ জয়সিংহের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন। বিদ্যাধর জাতিতে বাঙ্গালী—কায়স্থ।

জয়সিংহ আপনার নামানুসারে জয়পুর (জয় নগর) নামে একটি নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নগরটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য কাল পর্য্যন্ত, সমগ্র আসিয়া মহাদেশের মধ্যে অতীব মনোরম ও সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। জয়পুরের প্রত্যেক রাজপথ, প্রত্যেক প্রাচীন সুদীর্ঘ স্তম্ভ, প্রত্যেক সৌধকারু, বাঙ্গালী বিদ্যাধরের অমর কীর্ত্তি-স্থানীয় হইয়া

তাঁহার অতুল মহিমা ও প্রাজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। টড্ সাহেব বলেন "ভারতবর্ষের মধ্যে কেবলমাত্র জয়পুর নগর বিশুদ্ধ ইউরোপীয় কৌশল মতে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাঁহার বুদ্ধিবলে এই নগরের মনোহর সৌধ ও রাজবর্ত্ম সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই।" বলা বাহুল্য যে, টড সাহেব এ কথা গুলি বিদ্যাধরকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন। জয়সিংহের বিজ্ঞান সভায় বিদ্যাধর সভাপতি ছিলেন। ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী, একজন ভুবনবিখ্যাত নরপতির সভায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, এ কথা শুনিলে কি আত্ম-গৌরবে হৃদয় প্রসারিত হয় না!

এই সময়ে দিল্লীর যবন সিংহাসনে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব্ উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের অন্য প্রান্তে পাঠান সিংহাসনে মহম্মদ সাহ উপবেশন করিয়া মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে ছিলেন। তিনি বিদ্যাধরের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং আপনার সভায় পঞ্জিকা সংস্কারের ভার দিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে বিদ্যাধর পণ্ডিত উজ্জয়িনী, কাশী, মথুরা, দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গ্রহ উপগ্রহদিগের পরিমাণ লইবার জন্য বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি উলুক্ বেঘ্ নামক মুসলমান আচার্য্যের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সমরখণ্ড নগরে গমন করেন, এবং তথায় কিছুকাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

এইরূপে সাতবৎসর কাল আসিয়ার নানা স্থানে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তিনি এক প্রস্থ ত্রিবল (A set of tables.) প্রস্তুত করিলেন। এই ত্রিবল পর্টুগালে প্রেরিত হইয়াছিল। পাদ্রী মানবেল সাহেব ভারতবর্ষ হইতে ঐ ত্রিবল লইয়া পর্টুগালে গিয়াছিলেন। সম্রাট এই মূল্যবান উপহার প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রস্তুতকারীকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং জেবিয়ার ডি সীলভা নামক পণ্ডিতের হস্তে বিদ্যাধর ও জয়সিংহের নিকট কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাঠাইয়া দিলেন *। এই সকল

* কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, রাজা জয়সিংহ ও ইমানুয়েল

উপহার জয়সিংহের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাধর পণ্ডিতই জয়সিংহের খ্যাতির মূল। অত্যল্পকাল পরে, মহারাজা জয়সিংহ ও বিদ্যাধর উভয়ে মিলিয়া টলেমি, হিপার্কশ্, দিইলা হায়র; মণ্টে পীগো প্রভৃতি জ্যোতিষঃশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রহগণনায় ভুল বাহির করিতে লাগিলেন। অপ্জা বেগ্ নামে জনৈক তুরস্ক দেশীয় বৈজ্ঞানিক এই সময়ে তাঁহাদের নিকটে জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

কিছু কাল পরে দিল্লী এবং উজ্জয়িনী নগরী মধ্যে জোতিষালয় স্থাপিত হইয়া দ্রাঘিমা এবং অক্ষ স্থিরীকৃত হইল। ডাক্তার হণ্টার ও গুডিণ সাহেব বলেন "জয় সিংহ ও বিদ্যাধরের জ্যোতিষিক পারদর্শিতা আলোচনা করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি।"

জয়সিংহ একখানি ত্রিবল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ৫ বৎসরের গ্রহ, উপগ্রহ এবং চন্দ্র সূর্য্যের গতি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এ ত্রিবল এখনও রক্ষিত আছে। ঐ ত্রিবলের নিম্নে, বিদ্যাধর 'জিজ্ মহম্মদ সাহী' এই নামে একটি প্রবন্ধ মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানী পঞ্জিকা লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমানের পঞ্জিকায় আজি পর্য্যন্ত বিদ্যাধরের গণনা প্রথা প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। * নেপিয়ার সাহেব, তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যাধর ও জয়সিংহের গণনা সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়পুরের অসংখ্য স্থানে বিদ্যাধর ও জয়সিংহের অগণ্য অমরকীর্ত্তি আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জয়নগরের 'আশ্চর্য্য স্তম্ভ' প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চার জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত। †

কাশীস্থ 'মান মন্দির' এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞানমন্দির ছিল। ইহা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার প্রিয়তম সখা বিদ্যাধরের অন্য-

---

এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। একথা যে ভ্রমাত্মক টড্ সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ডার সাহেব, ইমানুয়েলের রাজত্বকাল জয়সিংহের অনেক পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Treasury of Biography.

* TOD'S Rajasthan, vol. II.,

† *Vide* Pundit Bapudev Sastri's 'Man-mandir observatory.' and "sacred city of theHindoos," vol. I., Chap. X.

তম কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। এই মন্দির নির্ম্মাণে যে প্রকার অসাধারণ ধীশক্তি, অতুলনীয় প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয় হয়। এই নির্জ্জীব বাঙ্গালি জাতির কোন পূর্ব্বপুরুষ যে এক সময়ে, বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় জগতকে মোহিত করিয়াছিল, ইহা ভাবিলে ও মনোমধ্যে প্রভূত সন্তোষ ও শান্তির উদয় হয়।——আমরা নিম্নে মাণমন্দিরের একটি বিবরণ দিতেছি।

গঙ্গার তীরে 'মাণমন্দির' আজি ও দেখিতে পাওয়া যায়। পূতঃসলিলা ভাগীরথী আজও আপনার বিশালহৃদয়ে সেই ভীমছায়া ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার প্রথম প্রবেশ দ্বারে কতকগুলি প্রাচীনতম হিন্দু দেবমূর্ত্তি স্তূপাকার ভাবে বহুদিন হইতে স্থাপিত রহিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই হনুমানের প্রতিকৃতি। রাজা জয়সিংহের সম্মানার্থ এইস্থানে এখন পর্য্যন্তও একটি পতাকা উড়িয়া থাকে। ইহার নিকটে 'দোল্ভাই ঈশ্বর' নামে যে মন্দির আছে, তাহা এরূপ আশ্চর্য্য প্রস্তরে নির্ম্মিত যে, তাপমান যন্ত্রের ১৭০ ডিগ্রিতে পারদ উত্থিত হইলেও সে স্থানের বায়ু তথাচ শীতল থাকে। ঐ প্রস্তর অনাবৃষ্টি এবং অত্যুত্তাপ নিবারণের অন্যতম অমোঘ উপায়। ইহার নিকটে সোমেশ্বর এবং বরাহ নামে আর দুইটি মন্দির আছে।

মাণমন্দিরের একটি প্রাচীরে ভিত্তিযন্ত্র (Mural Quadrant) নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার উচ্চতা ১১ ফিট এবং প্রশস্ততা প্রায় ১০ ফিট। এই যন্ত্র দ্বারা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দূরত্ব, গতি, উত্তাপ, অক্ষ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার বর্ত্তুল প্রস্তর সন্নিবেশিত আছে; ঐ প্রস্তরের মধ্য দিয়া দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 'যন্ত্রসম্রাট' নামে আর একটি যে যন্ত্র আছে, তাহা আরও চমৎকার। ইহার বিস্তৃতি ৩৬ ফিট, প্রশস্ততা সার্দ্ধ চতুর্থ ফীট, এবং একপ্রান্ত প্রায় ২৩ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার মুখ উত্তর মেরু অভিমুখে অবস্থিত। ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির অবস্থা জানিতে পারা যায়; ইহা দ্বারা গ্রহণ এবং সৌরজগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনা সহজেই

অবজ্ঞাত হইতে পারা যায়। ইংরাজিতে ইহাকে (Double Mural Quadrant) কহে এতদ্ব্যতীত চক্রযন্ত্র, দিগংশ যন্ত্র, মাণযন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।*

মহারাজা জয়সিংহ লোকান্তরিত হইলে, বিদ্যাধর পণ্ডিত তাঁহার সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন। গান্ধার (Kandahar) প্রদেশে গমন করিবার উদ্দেশে তিনি পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছেন, এমত সময়ে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে কাল-মেঘের কোলে ডুবিয়া গেল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, বিদ্যাধর পণ্ডিত ইহ সংসার হইতে অবসৃত হইয়াছেন; কিন্তু আজিও ইতিহাস যতনে সেই নাম পৃষ্ঠে বহন করিতেছে। বিদ্যাধর তাঁহার স্বদেশীয় বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত এবং অনাদৃত হইলেও রাজস্থানের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার অমর কীর্ত্তির বিবরণ এখনও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

—:—

সুহাসিনী।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের ফল।

পাতকের প্রতিফল হইল উচিত।

কাশীদাস।

প্রভাতের সূর্য্য আকাশে উঠিয়াছে। সেই সূর্য্যালোকে হুগলীর ভীমকান্ত রাজদুর্গ অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ভাগীরথী সেই দুর্গচ্ছায়া বক্ষে ধরিয়া ধীরতরঙ্গবিক্ষেপে প্রবাহিত হইতেছে। প্রহরীগণ নিঃশব্দে নিষ্কো-

* *Vide* "Account of the astronomical labours of Jaya Singh," by Dr. W. Hunter. (Asiatic Researches, Vol. V.)

শিত অসি হস্তে দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছে। এখনও দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। দুর্গস্বামী রুদ্ধদ্বার হইয়া অনুচরবর্গের সহিত গভীর মন্ত্রণায় নিযুক্ত। বিস্তৃত গৃহে বিস্তৃত সভা হইয়াছে; মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে মাইকেল রডরিগ উপবিষ্ট রহিয়াছেন—মুখে কথা নাই, বদন গম্ভীর, ললাট চিন্তা-প্রদীপ্ত। চতুঃপার্শ্বে পদোচিত স্থান সকল অধিকার করিয়া পোর্ত্তুগীজ-মণ্ডলী নীরবে উপায় চিন্তা করিতেছে। মোগল সৈন্য যে এত চুপে চুপে এবং এমত সহসা আসিয়া দুর্গ বেষ্টন করিবে ইহা অচিন্তিতপূর্ব্ব। রডরিগের সকল ক্রোধ গঞ্জালের উপর। গঞ্জালে এই জনাই ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে-ছিল, সে কেন না পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিল? গঞ্জালে প্রভুর সমীপে আপ-নার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিতে ত্রুটি করে নাই। সে প্রভুর আদেশ সাধ্যমত পালন করিয়াছিল, সে কেমন করিয়া বুঝিবে, ভূপেন্দ্র তাহার সহিত এমন চাতুরী খেলিবে? ভূপেন্দ্র যে উপস্থিত সমস্ত অনিষ্টের মূল তাহার সন্দেহ নাই। রডরিগ ভাবিয়া ভাবিয়া যতই আপনার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে লাগিলেন, ততই ভূপেন্দ্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। ভূপেন্দ্র ধৃত হইয়া আসিয়াছিল, অদূরেই বদ্ধহস্তে দাঁড়াইয়া ছিল। রডরিগ তাহার প্রতি একবার কোপকুটিলনেত্রে চাহিলেন। ভূপেন্দ্র সম্মুখে আনীত হইল। অতি কঠোর স্বরে রডরিগ বলিলেন—"কেন, তুই এ প্রতারণা করিলি?"

ভূপেন্দ্র সে কঠোর স্বরে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, সেও তেমনি স্বরে বলিল—"কেন তোমরা আমার এ সর্ব্বনাশ সাধিলে?"

গঞ্জালে নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—"রাজসভায় এরূপ করিয়া কথা কহিলে কি হয়, জান?"

ভূপেন্দ্র বলিল—"জানি। কিন্তু এ রাজসভা নয়।"

সভাস্থ আর এক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া বলিল—"রাজসভা নহে তো এ কি?"

ভূপেন্দ্র নির্ভীকহৃদয়ে বলিল—"দস্যু-সভা!"

রডরিগের অসহ্য হইল। একবার কোপকষায়িত লোচনে ভ্রূকুটি করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন—"তোর মরণ নিকট।"

সে কথায় ভূপেন্দ্র কিছুমাত্র টলিল না, ঈষদ্ধাস্য করিল; বলিল—“সে তো সুখের কথা।”

সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে ভূপেন্দ্র অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, বদনমণ্ডল তাম্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সেই আরক্ত চক্ষে মূহুর্ত্তের জন্য এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। ভূপেন্দ্র নিঃশব্দে সে অশ্রু বিন্দু মুছিয়া গঞ্জালেব প্রতি তীব্রদৃষ্টে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিল—‘মার, মরার চেয়ে এখন আর আমার সুখ কি? মার; কিন্তু অন্যে মারিও না—আমার মা যে অসির আঘাতে মরিয়াছেন আমিও তাহাতে মরিব। বক্ষঃ পাতিয়া দিতেছি, দাও, তোমার ঐ হাতের তরবারি আমূল বিদ্ধ করিয়া দাও, এখনও উহাতে আমার মার রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, এখনও উহা হইতে মার সেই উষ্ণ রক্তের ধূম নির্গত হইতেছে, আমাকে বধ কর, শৈলবালা যে পথে গিয়াছে, আমিও সেইপথে চলিয়া যাই। শৈলবালা—শৈলবালা!”

ভূপেন্দ্র আর বলিতে পারিল না; উদ্ভ্রান্তের ন্যায় চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। সভ্যদিগের মধ্যে তাহার অবস্থা দেখিয়া কেহ দুঃখিত হইল, কেহ বা আনন্দের হাসি হাসিল। রডরিগ সহস্র দস্যুতা করুন, তাঁহার হৃদয় একেবারে দয়াবর্জ্জিত ছিল না। রডরিগ কিছু দুঃখিত হইলেন। গঞ্জালের প্রতি হুকুম হইল—“ইহাকে বধ করিও না, আপাততঃ বন্দী করিয়া রাখ।”

গঞ্জালে ভূপেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। পাপের প্রতিফল আরম্ভ হইল।

তার পর রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গসূচক দুন্দুভিধ্বনি হইল। উপস্থিত মন্ত্রণা-কার্য্য অপরাহ্নের জন্য রাখিয়া প্রভাতের সভা ভঙ্গ হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমরনির্ঘোষে।

Heard ye the din of battle bray.
Grey.

ধু-রু-ম্। অকস্মাৎ মোগলের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সভাভঙ্গের পর রডরিগ এবং সভ্যগণ আপন আপন গৃহে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, আর পা উঠিল না। বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে একবার পরস্পর পরস্পরের মুখ প্রতি চাহিল, উৎকর্ণ হইয়া সেই শব্দ শ্রবণ করিল। আবার তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রতিবোধে অন্য তোপ ডাকিল। শ্রাবণের জাহ্নবীহৃদয়ে সেই শব্দ প্রহত হইয়া আরও উচ্চতর হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের মধ্যে তোপের গর্জ্জনে আকাশ মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে বুঝিলেন, বিপদ আগত হইয়াছে; বুঝিলেন, মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে, বাহিরে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। প্রত্যুৎপন্নমতিমান্ কার্য্যকুশল রডরিগ স্থির থাকিবার নহেন; তৎক্ষণাৎ দলবলে সে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুর্গের দ্বারে আসিয়া সকলে দেখিল, পোর্ত্তুগীজ সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোপ চালাইতেছে, তাহাদের পশ্চাতে গঞ্জালে অশ্বারোহণে বিউগল বাজাইয়া সৈন্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন; সে সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়া দলে দলে পোর্ত্তুগীজসৈন্য আসিয়া শ্রেণীসঙ্গে যোগ দিতেছে। সকলে মিলিয়া এতক্ষণ আপনাদের সৈন্য দেখিতে ব্যস্ত ছিল, অধরোষ্ঠের অগ্রভাগে গর্ব্বের মন্দ হাসা দেখা যাইতেছিল; হঠাৎ পরিখার কালজলে দৃষ্টি পড়িল, অধরের হাসি অধরে বিলীন হইয়া গেল। সে পরিখার জলে অপর পারে অসংখ্য সেনার ছায়া, বিস্মিত হইয়া সকলে একবার সে পরপারের দিকে তাকাইল। মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সকলে ভবিষ্যৎ বিপদ গণনা করিল। দেখিল, সৈন্যসংখ্যায় পরপার ছাইয়া পড়িয়াছে—পীপিলিকাশ্রেণীর ন্যায় তাহার গণনা হয় না, তাহা অসংখ্য। সেই অসংখ্য সৈন্যের করে অসংখ্য বর্ষাফলক বালসূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে।

মুহুর্মুহুঃ তোপের ভৈরব গর্জ্জনে পরিখার জল স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে বহুতর পোর্ত্তুগীজসৈন্য সেইখানে আসিয়া একত্রিত হইল। কিন্তু মধ্যে পরিখা ব্যবধান—বর্ষার জলে পরিখা টলটল করিতেছে; কার সাধ্য তাহা উত্তীর্ণ হইবে? যে সেই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। দুই পারে দুই দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। তখন দূরে থাকিয়া দুই দলের কামানে কামানে ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। প্রচণ্ড ধূমে জলস্থল সমস্ত ছাইয়া পড়িল; সহসা কে যেন চারিদিকে আঁধার রাশি ছড়াইয়া দিল; যেন রাহুগ্রাসে সূর্য্য ডুবিয়া গেল; চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ গোলা দুই দল হইতে প্রধাবিত হইতে লাগিল। দুই দলেই সমান ব্যস্ত, সমান নিযুক্ত—কাহারো অন্য মন নাই, অন্য লক্ষ্য নাই, অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতেছে। পরিখার জল আঁধারে মিশাইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

সেই সকল তোপের ভীষণ নিনাদ অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ রডরিগের বিউগল বাজিয়া উঠিল। সে বাদ্যধ্বনি সহজ নয়, তাহা গিয়া পোর্ত্তুগীজ-হৃদয়ে প্রতিঘাত করিল; সে বীরহৃদয়ও ক্ষণমাত্রের জন্য টলিল, নির্ভীক-হৃদয়ে ক্ষণমাত্রের জন্য ভয়ের সঞ্চার হইল; তোপ রাখিয়া সকলে একবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল, তীরের ন্যায় অন্য দিক্ হইতে রডরিগ অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসিতেছেন—অশ্বের পা মাটীতে পড়িতেছে না, বিদ্যুত্বরিত-গতিত্বের জন্য সকল সময়ে ভাল করিয়া লক্ষ্য পর্য্যন্ত হইতেছে না, এক একবার অশ্বের হ্রেষারব পরিশ্রুত হইতেছে—মাত্র এক একবার বিউগলের ভীষণ শব্দ বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া জলস্থল কাঁপাইয়া তুলিতেছে। মুহুর্ত্তমধ্যে পোর্ত্তুগীজমণ্ডলীর উৎসুক নয়ন-সমক্ষে রডরিগ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতেছিল, হৃদয় গুরুতররূপে আঘাত করিতেছিল—রডরিগ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্যমণ্ডলী আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। হতভাগ্য অশ্ব উৎপাদ হইয়া দুই একবার লম্ফ ছাড়িয়া ভূতলে শয়ন করিল, মুহূর্ত্তপরে বাহিরের বাতাসের সহিত তাহার প্রাণবায়ু মিশাইল। রডরিগ

তাঁহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠ উচ্চে তুলিয়া বলিলেন—"তোমরা সাবধান! বিপদ্ উপস্থিত। কতক সৈন্য পরপার হইতে আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়া ধূর্ত্ত-মোগলেরা সেতুর উপর দিয়া এপারে আসিয়াছে—যবনেরা আমাদিগকে ঠকাইয়াছে, উহাদিগকে ঠকাইতে হইবে।" হঠাৎ যবনদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পোর্ত্তুগীজসেনা বিস্মিত হইল, তাহাদের দর্পিত হৃদয় কিছু দমিয়া গেল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রডরিগ তাহা বুঝিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই জলদনিস্বন বিউগল মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে আবার বাজিয়া উঠিল। সে রণরণ নাদে বিভোর হইয়া পোর্ত্তুগীজসেনা ভয় ভুলিয়া গেল; উচ্চে মাতা মেরীর নাম গাহিয়া উঠিল। অবিকল সেই মুহূর্ত্তেই যেন সেই শব্দের উত্তরে বিদ্রূপ করিয়া কাহারা উচ্চে 'আল্লা হো আকবর' বলিয়া জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। পোর্ত্তুগীজসেনা দেখিল, মোগলসেনা তাহাদের সম্মুখভাগে। ভাবনার অবসর নাই—কিংকর্ত্তব্য-বিবেচনার সময় তখন অতীত হইয়াছিল, ভাগীরথীর তরঙ্গের ন্যায় পোর্ত্তুগীজসেনা মোগলসেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলন।

শুভ দিনে শুভক্ষণে ইংলণ্ডবাসী ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল; যখন রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র লইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য উদ্দেশে ভারতে পদার্পণ করে, তখন কে জানিত যে সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক দিন ভারতের অধীশ্বর হইবে? অন্ধকূপ হত্যার ভয়ঙ্কর কাণ্ড স্মরণ করিলে, আজও হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায় সত্য, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে এই রোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডই ইংলণ্ডের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে ইংলণ্ডের

হৃদয়ে যে প্রতিহিংসার জলন্ত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্ব ছারখার হইয়া গেল। এই হত্যাকাণ্ড না ঘটিলে ধূর্ত্ত ক্লাইভের ধূর্ত্ততা, চতুরতা, কূটযুদ্ধকৌশল, সাহস প্রভৃতির পরিচয় জগতের কেহ জানিতে পারিত না, তাহা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেই লীন হইত। আজ প্রায় সার্দ্ধশতবর্ষ অতীত হইল, ভারতে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পর ধীরে ধীরে মুসলমানের সৌভাগ্য-সূর্য্যও বহুকাল হইল অস্ত গিয়াছে। এখন ইংলণ্ডের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিন্দু ও মুসলমান থরহরিকম্প! হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা এখন সমান, উভয়েরই জীবনের সুখ দুঃখ এখন ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতেছে, উভয়েই এখন ইংলণ্ডের অনুগ্রহ-প্রার্থী।

এই উভয় জাতি একত্রে এক শাসনে এক অবস্থায় বাস করায়, একটি শুভফল উৎপন্ন হওয়া উচিত, সেটি এই—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পূর্ব্ব বৈরীভাব পরিত্যাগ এবং সদ্ভাব স্থাপন; কিন্তু ভারতে তাহা হইতেছে না। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, যদি কোন দেশ বিদেশীয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হয়, এবং পরাজিত দেশবাসীরা ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করে; পরে সেই অত্যাচারী রাজা যদি কোন তাহার অপেক্ষাও প্রবল প্রতাপান্বিত আক্রমণকারীর কর্তৃক পরাজিত হয়, তবে সেই দেশবাসী এবং প্রথম জেতারা সমাবস্থাপন্ন হওয়াতে পূর্ব্ববৈরীভাব ঘুচিয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব জন্মায়; এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা একজাতি হইয়া যায়। ইংলণ্ডে উইলিয়ম দি কঙ্কারার (William the Conqueror) নরম্যানডি (Normandy) হইতে আসিয়া স্যাক্সনরাজ হ্যারাল্ডকে (Harold) পরাজিত করিয়া নরম্যানরাজ্য স্থাপনা করিলে, স্যাক্সন এবং তাহাদের পরাজিত এবং অত্যাচরিত ডেন্সদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সদ্ভাব জন্মিয়া, পরিশেষে তাহারা সামাজিক, লৌকিক সকল বাধা, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়া গেল। ইংলণ্ডের ন্যায় অন্যান্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এই সত্য আমরা দেখিতে পাই। এইরূপ সম্মিলন যে শুভ, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। দুইটি পরাজিত জাতি যদি একত্র হয়, তাহা হইলে, এই একতা যে কতদূর

ফলপ্রদায়িনী—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহার স্বাপক্ষে অন্য স্বাক্ষী আবশ্যক করে না।

এক্ষণে দেখা উচিত যে এইরূপ সম্মিলন সহজ কি না। আমাদের মতে দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির সম্মিলন এইরূপ অবস্থাপন্ন না হইলে, কোনক্রমেই সংঘটিত হইতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার রাজ্যে বাস করিলে, দুইটী স্বতন্ত্রজাতির সম্মিলন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, উভয়ের সুখ দুঃখে উভয়ের সহানুভূতি সহজে জন্মায়। এবং উভয় জাতির অভাবও রাজনৈতিক অবস্থা সমান হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সহজেই সদ্ভাব স্থাপিত হয়, এবং কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।

অন্য দেশে এই সম্মিলন সহজ ও সুসাধ্য হইলেও, ভারতে তাহা এত দুঃসাধ্য কেন? কেন এই শতবর্ষেও এই শুভ মিলনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হইল না? আমরা ইহার কারণ যতদূর অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টিই ইহার গুরুতর প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হয়।

১ম। হিন্দুদিগের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি, মুসলমানদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। হিন্দুরা তাহাদের সামাজিক নিয়ম পালন করিতে হইলে, মুসলমান জাতির ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করা অবৈধ।

২য়। মুসলমান রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের প্রতি তাহারা যে সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, হিন্দুগণ এখনও তাহা বিস্মৃত হয় নাই; এখনও তাহা প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে জাগিতেছে। হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমা না করিলে এই উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব কোনক্রমেই হইতে পারে না।

৩য়। মুসলমানেরা এখনও হিন্দুর প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন। এখনও কাফেরের নাম শুনিলে তাহাদের শীতল রক্তও উষ্ণ হয়; পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া এখনও তাহারা গর্ব্বিত। পরাজিত হিন্দুর সহিত মিসিতে এখনও তাহাদের অপমান বোধ হয়।

এই তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক যত দিন থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এ সম্মিলন হওয়া অসম্ভব। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে এই সকল প্রতিবন্ধক কোন কালেই যাইবে না। হিন্দু কখনই মুসলমান হইবে না, মুসল-

মান কখনই হিন্দু হইবে না। কিন্তু আমরা এ সকল কথা বিশ্বাস করি না, উভয় জাতি চেষ্টা করিলে এই সকল প্রতিবন্ধক দূর করা যাইতে পারে। অনেকের মতে প্রথম প্রতিবন্ধকই গুরুতর, হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার যেরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে এই দুই জাতির সম্মিলন বড় সুসাধ্য নহে। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, সে কথাটি এই——সুশিক্ষিত হিন্দুরা ইংরাজ সহবাস এত ভাল বাসে কেন? ইংরাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইয়াও কেন ইংরাজ সম্মিলনে তাঁহাদের এত আগ্রহ? অথচ এই দুই জাতির মধ্যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহারে কোন রূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজগণ অনুগ্রহ করিলে এতদিন এ সম্মিলনের বাকি থাকিত না; সুশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান হইতে ঘৃণা করিলেও ইংরাজ হইতে কুণ্ঠিত নয়। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে ইংরাজ আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইংরাজ হওয়াও শ্লাঘার বিষয়। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু যদি বিদেশীয়, বিধর্ম্মী, অত্যাচারী, লুণ্ঠননিরত, ধনরত্নাপহরণকারী রাজার জন্যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে, তবে স্বদেশবাসী সমদশাপন্ন ভ্রাতৃসম, মুসলমান জাতির সহিত মাত্র সদ্ভাব স্থাপিত করিতে পারিবে না? হিন্দুর প্রতি যাহা যাহা বলা হইল, মুসলমানদিগের প্রতিও অবিকল তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কয় জন সুশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান সহবাস ভাল বাসে? কিম্বা কয় জন মুসলমান হিন্দু সহবাস ভাল বাসে? সেই জন্যেই আমরা বলি যে, ইহার মূলে অন্য কারণ আছে, সে কারণ আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবন্ধক। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদিগের পরস্পরে মধ্যে ঘৃণা থাকিবে, ততদিন এই উভয় জাতির কোন উন্নতি হইবে না।

আমরা সেনশস্ আফিসের কোন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে শুনিলাম যে, গত লোকসংখ্যায় বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আর বিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতের এই দুইটি প্রধান জাতির মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী

লোকের করা কর্ত্তব্য। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" এই মহাবাক্যের মহান্ অর্থ কেহ যেন বিস্মৃত না হন। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলনে যে ভারতের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তন হইবেনা, তাহা কে বলিতে পারে? এই শুভ সম্মিলনের ফল যাহা হইবে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। কিন্তু এখন সে আনন্দের কথা দূরে থাকুক, এখন কার্য্য চাই।

এখন ভারতমাতার হিন্দু জ্যেষ্ঠ সন্তান, মুসলমান কনিষ্ঠ সন্তান। এই দুই সন্তানের উপর জননীর জীবনের সুখ ও দুঃখ নির্ভর করিতেছে। হিন্দু দক্ষিণ হস্ত, মুসলমান বাম হস্ত, পতিত ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র ভরসা এই দুই হস্তের সম্মিলন। এই দুই জাতি সম্মিলিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে কাহাকে ভয়? স্বদেশের কথা দূরে থাকুক, এ সম্মিলনে পৃথিবী ভয়াকুল হইয়া কাঁপিবে। কিন্তু কল্পনার এ ক্ষীণ স্বর ভারতের কতদূর যাইবে? কয় জন লোক ইহাতে মনোযোগ দিবে? কেহ না শুনিলেও ক্ষতি নাই। কল্পনা আপনার কার্য্য সাধন করিবে, সে কার্য্যে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহার সেই ক্ষীণস্বর যত উচ্চে উঠিতে পারে, সেই স্বরে বলিবে—"ভাই হিন্দু! ভাই মুসলমান! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমাদের সম্মিলনে ভারতের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তন হইবে, এবং অনন্ত যন্ত্রণাও দূর হইবে।

এখন কি উপায়ে এই সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে, আমরা ভাবিয়া যাহা স্থির করিয়াছি তাহা এই—

১ম। ভারতের প্রত্যেক প্রধান ২ নগরে হিন্দু মুসলমান সম্মিলন সভা স্থাপিত হউক।

২য়। প্রত্যেক সহৃদয় সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান এই সভার সভ্য হউক।

৩য়। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার সকল সভ্য সমাগত হইয়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য দেশহিতকর বিষয়ে আন্দোলন করিয়া একত্রে কার্য্য আরম্ভ করুক।

আমাদের এ প্রস্তাব কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে জানি না। ভারতে

এত সভার মধ্যে কি এই শুভফলপ্রদায়িনী সভার স্থান হইতে পারে না? আজ ভেলোরে, কাল মিরাটে এইরূপ সামান্য কারণে গৃহ বিচ্ছেদ কি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরকাল চলিবে? বিধর্ম্মী দুই জাতির মধ্যে কি সদ্ভাব থাকিতে পারে না? ভারতের হিন্দু-মুসলমান কি এতই নীচ? এতই ভ্রাতৃবিদ্রোহী? এতই কলহপ্রিয়?—আর কেন?—অনেক বিবাদ হইয়া গিয়াছে, অনেক রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, এখন যখন দুই জনেই এক জননীর সন্তান, তখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় এ বিবাদ ভাল দেখায় কি? অনেক শত্রু হাসিয়াছে, তাই আবার বলি—আর কেন?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

——(:)——

অধ্যাত্ম-রামায়ণ। আমরা ইহার দুই সংখ্যামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি: অনুবাদ সরল ও অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে; ভারত-সাহিত্যাগারে অধ্যাত্ম-রামায়ণ একটি উজ্জ্বল রত্ন, অনুবাদক মহাশয় সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর কণ্ঠে এই রত্নটি পরাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সাধু চেষ্টার প্রশংসা করি।

ওলাউঠার চিকিৎসা। অতি সহজ কথায় ও বিশুদ্ধ ভাষায় ওলাউঠার চিকিৎসা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে কি প্রকার প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ জানি, বিসূচিকা-রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ ফল দর্শে। গৃহস্থের ঘরে এ প্রকার পুস্তক থাকা আবশ্যক।

রাজ উদাসীন। লেখকের নাম প্রকাশিত নাই; তিনি যিনিই হউন, আমরা তাঁহার লেখার প্রশংসা করি। শাক্য সিংহ ও রাজা রাম-মোহন রায়ের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া তিনি যে ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ লিখিয়া-

ছেন, তাহা অনেকের নিকট আদর পাইতে পারিবে। স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফূরণ আছে।

বামাবোধিনী—বৈশাখ ১২৮৮। আমরা বামাবোধিনীর উন্নতি দেখিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়াছি। এত দিনের পর ইহার ডিমাই আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া রয়াল আকার হইয়াছে। বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সে জন্য সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। বামাবোধিনী আজিকার পত্রিকা নহে; আমাদের মনে পড়ে, বাল্যে যখন আমারা বিদ্যালয়ের কাষ্ঠাসনে বসিয়া পাঠ বলিতাম, সেই সময়ও ইহা পাঠ করিয়া কত উপদেশ লাভ করিয়াছি, তার পর আজও কল্পনা কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় বামাবোধিনীর নিকট অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। বাস্তবিক, ইহার উন্নতি লাভ দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার গার্হস্থ্য শিক্ষা অতি সুন্দর লিখিত হইতেছে। তবে পূর্ব্বে আমরা ইহাতে ভূবৃত্ত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইতাম, আজ কাল প্রায় সে সব দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; আমরা ইহার এই নব কলেবর সুন্দর অথচ জ্ঞানগর্ভ নব নব দৃশ্যদ্বারা পরিশোভিত দেখিলে আরো অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিব। বামাগণের রচনাস্তম্ভ উত্তরোত্তর আরো কিছু ভাল হওয়া আবশ্যক।

পাঁচ ঝাঁটা। খোস গল্প নং ৩—ইহাও সেই ঘোড়ার ডিমের ছাঁচে ঢালা। সেই সহজ কথায় সেই নাচানি ছন্দ অথচ উপাখ্যানভাগ উপদেশ পূর্ণ। লেখক যথার্থ কবিনামের যোগ্য।

দুই শিকারী। আর এক রকম খোস্ গল্প নং ১—ইহাতে সে সহজ কথা আছে, কিন্তু সে নাচানি ছন্দ নাই; ইহাতে উপাখ্যানের অংশ যথেষ্ট আছে; কিন্তু তেমন উপদেশমাধুরী নাই। আমরা 'খোস্‌গল্প' চাই; কিন্তু 'আর এক রকম খোস্‌গল্প' আর চাহি না।

ভিক্ষুকের কথা।

বলিতে পার, ভিক্ষুকের এত নিন্দা কেন? কাহিনী আছে, এক সময়ে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় এক নিশাচর গিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—তৃণ হইতে লঘু কে? নবরত্নের প্রধানতম রত্ন জগৎপূজ্য মহাকবি না কি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—ভিক্ষুক! তাহাই বলিতেছিলাম, ভিক্ষুক এত লঘু—এত অসার কিসে? ভিক্ষুকের এত নিন্দা কেন? পেটের দায়ে, ক্ষুধার জ্বালায় চৈত্ররৌদ্রের তপ্তবালুকায় হাঁটিয়া হাঁটিয়া তৃতীয় প্রহরে হতভাগ্য দরিদ্র মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হয়তঃ তুমি তখন কাঞ্চনপাত্রে রাজভোগ আহার করিয়া মৃদুমধুর নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে সুখনিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তোমার দ্বারবান সেই হতভাগ্যকে হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিল; বলিতে পার, তবে ভিক্ষুক পৃথিবীর অসার জীব নয় তো কি? হইতে পারে, তুমি এ কথা একা বল না; তোমার সংসার, তোমার সমাজ সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। মূর্খ যেমন ভিক্ষুককে ঘৃণা করে, পণ্ডিতও তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকে অবজ্ঞা করেন। পণ্ডিত বলিলেন, ভিক্ষার ন্যায় নীচবৃত্তি আর নাই, মুহূর্ত্তের জন্য যে একবার ইহার অনুসরণ করে, সে কেন সহস্র উচ্চপদবীস্থ হউক না, তৎক্ষণাৎ নীচ দশা প্রাপ্ত হইবে। কবি ইহার প্রমাণে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন—"বলিমপি যাচন-সময়ে শ্রীপতি র্বামনোঽভূৎ।" আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কবির কথা টালিতে পারি না; কিন্তু তবু বুঝিলাম না তো ভিক্ষুকের এত নিন্দা কেন।

এ সংসারে আসিয়া ভিক্ষুক হইয়া জন্মে নাই কে? ধনিন্! তুমি ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া একজন পথের মুষ্টি ভিক্ষুককে তৃণ হইতে লঘু বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ভাবিয়া দেখ, তুমিও কি কিছুরই ভিখারী নও? হইতে পারে, তুমি অতুল ধনের অধিকারী, ধনভিক্ষা আর তোমার হৃদয়ে স্থান না পাইতে পারে, কিন্তু তুমি কি মানের ভিখারী নও, যশের ভিক্ষায় লালায়িত নও? তুমি দাতা—সহস্র সহস্র প্রাণী তোমার মুক্ত বদান্যতার অনুগ্রহে প্রাণধারণ

করিতেছে, কে বলিল তুমি কিছুই ভিক্ষা কর না? গোপনে গোপনে তোমারও হৃদয়ে এক যশের ভিক্ষা আধিপত্য করিতেছে, অথবা তাহাপেক্ষা নীচ—জঘন্য উপাধির ভিক্ষা তোমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। এ সংসারে আসিয়া ভিক্ষুক হইয়া জন্মে নাই কে? মাতা পুত্রের পীড়ায় কাতর হইয়া দেবতার নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন কেন? মাতা পুত্রের কল্যাণ ভিক্ষা করেন। সেকেন্দার শাহ রাজরাজেশ্বর হইয়া—দিগ্বিজয়ীহইয়াও—সকল ছাড়িয়া পুরুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন কেন? সে কেদার বিজয় ভিক্ষা করিতেন বলিয়া। নিউটন আহার নিদ্রা ভুলিয়া এক আতা বৃক্ষের তলায় দিন রাত্রি কাটাইলেন কি জন্য? নিউটন জ্ঞানের ভিখারী। ইংরাজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আজ এই ভারতের দগ্ধ মরুভূমে আরও আগুন ঢালিতেছে কিসের জন্য? ইংরাজ বাজ্যের ভিক্ষুক। রোমিও জুলিয়েটের কিসের অভাব ছিল? তবে তাহারা গৃহপরিজন ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া চরমে সে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইল কেন? রোমিও জুলিয়েট প্রেমের ভিখারী। আর শাক্য সিংহ সে অতুল ঐশ্বর্য্য কেন চরণে ঠেলিলেন—সে রাজ্যপাটের মমতা কেন ভুলিলেন—কেন বনবাসী হইলেন? জননী, ভার্য্যা ও নদীয়াবাসী সকলকে কাঁদাইয়া সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোরা কেন সেই নবীন বয়সে বিবেকী হইল? শাক্যসিংহ ও গোরা ঈশ্বর-প্রেমের উন্মত্ত ভিক্ষুক। এ সংসার ভিক্ষাপূর্ণ। ধনের ভিক্ষা, মানের ভিক্ষা, যশের ভিক্ষা, প্রণয়ের ভিক্ষা, ঈশ্বর প্রেমের ভিক্ষা—যে দিকে তাকাই সে দিকে অনন্ত ভিক্ষার উপাসনা দেখিতে পাই। এই ভিক্ষাব্রত সাধনার জন্য সকলে আপন আপন সাধ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। ছোট বড় যেই হউক, এ সংসারে সকলেই ভিক্ষুক হইয়া আসিয়াছে—ভিক্ষুকের কার্য্যে প্রাণ পণ করিতেছে। তাহার মধ্যে যে আপনার ভিক্ষাব্রত সাধিয়া চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারিয়াছে জগতে সেই পূজনীয়—সেই লোকের সম্মাননার প্রকৃত পাত্র। তবে কেমন করিয়া বুঝিব, ভিক্ষুক এত লঘু কিসে। সেই জন্যইতো জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—বলিতে পার, ভিক্ষুকের এত নিন্দা কেন।

মানুষ আকাঙ্ক্ষা লইয়া। বালক যুবা, নবীন প্রবীণ, স্ত্রী পুরুষ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই আকাঙ্ক্ষার দাস। ফরাসিরাজ প্রবল প্রতাপ নেপোলিয়ান বল, আর সেই কর্সিকার পর্ণকুটীরশায়ী মেষপালকপুত্র নেপালিয়ান বল; ধ্যানস্তিমিতলোচন মহর্ষি বাল্মীকি বল, আর সেই নরহন্তা দস্যুপতি রত্নাকর বল—কে কবে আকাঙ্ক্ষার পূজা না করে? প্রভুর আকাঙ্ক্ষা আছে, ভৃত্যের আকাঙ্ক্ষা আছে, দাতার আকাঙ্ক্ষা আছে, গৃহীতার আকাঙ্ক্ষা আছে, তোমার আমার সকলের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে রাজত্ব করিতেছে। মানুষ আকাঙ্ক্ষা লইয়া। আকাঙ্ক্ষা অভাব পূরণেচ্ছার নামান্তর মাত্র। মানুষ সহস্র ধনী হউক, সহস্র জ্ঞানী হউক, সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই অভাব তাহার চরণের দুশ্ছেদ্য নিগড়। কে কবে বলিতে পারিয়াছে, আমার কিছুরই অভাব নাই? মানুষ সেই যে জন্মের আদি দিন হইতে অভাবের খরস্রোতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এখনও তাহার অনন্ত তরঙ্গাভিঘাতে সহিয়া চলিয়াছে। মানুষের অভাবের শেষ নাই। সুতরাং আকাঙ্ক্ষারও শেষ নাই। সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে হইলে—অভাব সংপূরণ করিতে হইলে, তদনুযায়ী কার্য্যব্রত আবশ্যক। এ ভিক্ষুকের কথায় উপহাস করিও না, আমি বলি—সে কার্য্যব্রতের নাম ভিক্ষা। তোমার ধনের অভাব হইয়াছে? সে অভাব পূরণে ইচ্ছা থাকে—ধন ভিক্ষা কর, অভাব পূরণ হইবে। তোমার প্রেমের অভাব? আকাঙ্ক্ষা থাকে, তদনুযায়ী কার্য্যব্রত অবলম্বন কর—প্রেম ভিক্ষা কর, অভাব থাকিবে না। মানের অভাব কি যশের অভাব কি জ্ঞানের অভাব—যার যাহা অভাব আছে, যদি তাহা পুরাইতে ইচ্ছা থাকে, তদনুযায়ী ভিক্ষাব্রতের সাধনা কর, অভাব—একদিনে না হয়, দুইদিন বা পাঁচদিন পরে ঘুচিয়া যাইবে। মানুষ অভাবের শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ, সে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে; ভিক্ষাব্রত সাধনায় সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়—তাহার অভাব পূর্ণ হয়। তবে, ভিক্ষা কি মন্দ?

ভিক্ষা যে মন্দ নয়, ভিক্ষুক যে লঘু বা অসার নহে, তাহা বুঝি মানুষ পূর্ব্বে জানিত। মানুষ জানিত, ভিক্ষার ন্যায় উচ্চব্রত আর নাই; জানিত, ভিক্ষুকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীব এ সংসারে আর হইতে পারে না। মানুষ ইহা

জানিত বলিয়া সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী বল্কলভূষণ ভিক্ষাপাত্রধৃৎ সেই ভিখারী-শ্রেষ্ঠকে দেবদেব মহাদেব বলিয়া পূজা করিত। কোথায় রহিল সংসার, কোথায় রহিল স্ত্রীপুত্রকন্যা, কোথায় রহিল তোমার জগতের সুখসম্পদ্, এক অভাব পূরণেচ্ছার কার্য্যে সকল ঢালিয়া দিয়া—ঈশ্বর-প্রেম-ভিক্ষায় বিভোর হইয়া—পার্থিব রূপরসগন্ধসৌন্দর্য্যাদি বিস্মৃত হইয়া—নিমীলিতনয়নে রুদ্ধেন্দ্রিয়ে সেই ব্রতসাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন। এমন ভিক্ষা কয়জনে করিতে পারে? পৃথিবীর ক্ষুদ্র নর সে অপূর্ব্ব ভিক্ষাব্রত সাধনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, মনে মনে সেই ভিখারীকে মহাদেব বলিয়া নমস্কার করিল। বুঝি, সেই দিন হইতে তাহার মতি ফিরিল—পুত্রকে আর সংসারধর্ম্ম, শাস্ত্রালাপ শিখাইল না, তাহার মস্তক মুড়াইয়া দিল, গৈরিকবাসে নবীন দেহ সাজাইল, স্কন্ধে ভিক্ষাপাত্র, করে আষাড়দণ্ড ধরাইল, তখন প্রেমভরে পুত্রকে ভিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। সংসারের অন্য সাধনা ভুলিয়া গিয়া নবীনযোগী ভিক্ষার মন্দিরে মায়া মমতা সমস্ত আহুতি ঢালিয়া দিয়া অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে বলিল—"ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।" সে অবস্থা—সে ভিখারীর রূপ কি প্রিয়দর্শন! তাহা দেখিলে কেমন প্রীতির উৎস, পবিত্রতার উৎস উথলিয়া উঠে! মানুষ তখন ভিক্ষার মর্ম্ম জানিত, তাই সে সংসারের সমস্ত প্রিয়বস্তু ছাড়িয়া ভিক্ষার উপাসনায় দীক্ষিত হইত। ভিক্ষুকের নিন্দা করিও না। ভিক্ষা মন্দ—এ কথা কে বলিল?

ভিক্ষা মন্দ নহে, ভাল। ভিক্ষায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়—অভাব পূরে—ভিক্ষা মানুষের অতি শ্রেষ্ঠতম ব্রত। জগতের এ অশেষ কার্য্যাড়ম্বর আর থাকিত না, ধনোপার্জ্জন ও দানধ্যানের সকল ব্যাপার বিলুপ্ত হইত, মানুষের উন্নতির স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইত, আকাঙ্ক্ষা পূরণের উৎসাহ ও উদ্যম নির্ব্বাণ হইয়া যাইত, যদি ঈশ্বর করুণা করিয়া মানুষকে এই উচ্চব্রত প্রদান না করিতেন। কোথায় থাকিত জ্ঞান, কোথায় থাকিত পৃথিবীর এই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ; আর কোথায়ই বা থাকিত ঈশ্বরতত্ত্ব, মানুষ যদি ভিখারী বনিয়া ভিক্ষাব্রত সাধনায় প্রাণ পণ না করিত। কে জানিত তোমার কালিদাসকে, কে শুনিত শিবজী প্রতাপের নাম, কে গাহিত ঈশা মুসা নান-

কের গুণগাথা, যদি তাঁহারা ভিক্ষাব্রত সাধিয়া আপনাদের অভাব চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে স্মরণীয় করিতে না পারিতেন। মানুষ অভাবের তীব্রদহনে অহরহঃ বিদগ্ধ হইতেছে, আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড বায়ু সে অভাবের আগুন বেড়িয়া বেড়িয়া তাহাকে আরও প্রবল করিয়া দিতেছে, এ সময়ে বিধাতা যদি দয়া করিয়া ভিক্ষার স্নিগ্ধ সলিল প্রক্ষেপ না করিতেন, মানুষ বাঁচিত না, অভাবের দাহে ভস্মীভূত হইয়া যাইত, মৃত্যু আসিয়া তাহার নিশ্চেষ্ট অসাড় দেহকে অধিকার করিয়া ফেলিত। তাই বলিতেছিলাম— ভিক্ষা মন্দ নহে, ভাল। যদি এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের আবশ্যকতা থাকে, ভিক্ষাব্রতের আবশ্যকতা আছে।

ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পৃথিবীর অনন্ত ভিক্ষাব্রতের মধ্যে সেই ভিক্ষাব্রতের সাধনা করেন, যাহাতে প্রেমের অভাব ঘুচে আত্মার উন্নতি হয়, মনের অন্ধকার ও পাপ তাপ দূরে যায়। ধন্য সেই যোগীঋষিগণ, যাঁহারা সংসারের ধনের ভিক্ষা, মানের ভিক্ষা, প্রণয়ের ভিক্ষা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া উদাসীনবেশে পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া অহোরাত্র ঈশ্বর-প্রেমের ভিক্ষা সাধনা করেন। সাধুপুরুষ সার্থকজন্মা তাঁহারা, যাঁহারা ভিক্ষা করিতে শিখিয়াছেন—যাঁহারা ভিক্ষা করিতে জানেন। এ পৃথিবীর অধম জীব—ক্ষুদ্র কীটাণু আমি—আমার অভাবের শেষ নাই—আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই—আমি কেমন করিয়া আপনাকে রাখিব? ধনের ভিক্ষা, মানের ভিক্ষা, পত্নীর প্রণয়ের ভিক্ষা—কিছুই সাধনা করিতে পারি নাই; ভিক্ষার ঝুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হাতের দণ্ড ক্ষয়িত হইয়াছে, হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায়ে ব্যথা জন্মিয়াছে; কিন্তু কৈ, কিছুইতো সাধনা করিতে পারিলাম না! হে দেব, তবে, তোমার সুধাময় প্রেমের ভিক্ষা কেমন করিয়া সাধনা করিব? ভিক্ষাব্রত কখন শিখিনাই, ভিক্ষার মন্ত্র জানি না, ভিক্ষা করিতে হয় যে ভাষায় তাহাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ— আমার এ জঘন্য অভাবপীড়িত দেহের গতি কি হইবে, দয়াময়! এ অভাবের ঘোর দুর্দ্দিনে—এ নৈরাশ্যের অন্ধকারপূর্ণ কাল মেঘাড়ম্বরে দীনহীনকে ভিক্ষার মন্ত্র কে শিখাইবে? আকাঙ্ক্ষার ভীষণ আগুন জ্বলিতেছে—ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছারখার হইল—গতি নাই, উপায় নাই, নিস্তারের পথ দেখি না, এ সময়ে এ অগ্নি নিভাইবার জন্য ভিক্ষার মন্ত্র কে শিখাইয়া দিবে, ঠাকুর?

অভাবের তরঙ্গে পড়িয়া এসামান্য জীর্ণ ভেলা যায় যায় হইয়াছে, অন্ধকার—প্রভো! চারিদিকে অন্ধকার—তোমার অধম সন্তানকে রক্ষা কর, এ প্রবল স্রোতের গতি যাহাতে ফিরে তাহার উপদেশ দাও, দয়া করিয়া প্রেম-ভিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত কর। ভিক্ষা ভিন্ন মানুষের অন্য গতি নাই।

আর্য্যচিকিৎসা।

(১৬১ পৃষ্ঠার পর)

বয়োবিভাগ।

বাল্যকালে প্রথম এক বৎসর, বালক কেবল, দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দুগ্ধ ব্যতীত আর কোন পদার্থদ্বারা তখন তাহার জীবন রক্ষা হয় না। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকের দুগ্ধ না হইলেও অন্যান্য খাদ্য দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে পারে।

যৌবন কালে ২০ বৎসর বয়ক্রম হইলে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে আর উহাদের বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ধাতু সমূহ, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য ও উৎসাহ ইত্যাদির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। প্রৌঢ়াবস্থায় এই সকলের ঈষৎ ক্ষীণতা জন্মে। বার্দ্ধক্যে ইহাদের এককালে অবসন্ন দশা উপস্থিত হয়; দেহ দিন দিন ক্ষীণ, শ্রীহীন, আলস্য-পরবশ ও বলীগ্রস্ত হয়, কেশ সকল শুভ্র আকার ধারণ করে, টাকদোষ, শ্বাস, কাস ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে। বুদ্ধিবৃত্তি বিচলিত ও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদয় হীনপ্রভ ও অস্তমিত-প্রায় হয়। এবং অন্তঃকরণ তেজোহীন, নিরুৎসাহ ও ম্লান হইয়া উঠে, এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া মনুষ্য পরমায়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে এককালে নিষ্কৃতি লাভ করে।

পূর্ব্বকালে এদেশের অধিবাসীগণ অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইহার

ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরাই বালককালে যেরূপ বৃদ্ধের সংখ্যা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এ দেশবাসী মহাত্মাগণ ৪০ বৎসরের পরেই বৃদ্ধ হইয়া উঠেন। এবং অনেক ভাগ্যধর বাল্যকালেই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যুবাদলভুক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

আমাদের প্রাচীন কালের শাস্ত্রানুমোদিত উপরি-লিখিত বয়োবিভাগের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন না করিলে আর এখনকার বয়সের লক্ষণের ঐক্য হইতে পারে না। এখন ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল। ১৩ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন। ৩১ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা। এবং ৪১ হইতে তৎপরবর্ত্তী জীবন সময় বার্দ্ধক্য কাল। আমরা বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান চিত্র দেখিয়া এইরূপ বয়োবিভাগ স্থির করিয়া দিলাম। ভরসা করি, পাঠকগণ আমাদিগের স্বেচ্ছাকৃত এই বিধানে কোনরূপ দোষারোপ করিবেন না।

সপ্তম অধ্যায়।

তত্ত্ব নিরূপণ।

তত্ত্ব পাঁচটী। যথা—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী। এই পঞ্চ তত্ত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; এবং এই পঞ্চ তত্ত্বেই সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জীব, এই পঞ্চ তত্ত্বর অধীন। প্রত্যেক দেহে এই পঞ্চ তত্ত্ব স্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আবার পৃথিবী জলে, জল সূর্য্যে, সূর্য্য বায়ুতে, এবং বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়।

পৃথ্বীতত্ত্বের প্রভাবে অস্থি, মাংস, চর্ম্ম, নাড়ী ও রোম উৎপন্ন হয়। জলতত্ত্বের প্রভাবে শুক্র, রক্ত, মজ্জা, লালা ও মূত্র জন্মে। অগ্নি তত্ত্বের প্রভাবে ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, শ্রান্তি ও আলস্যের উদ্রেক হয়। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও বিস্তারিতকরণ ইত্যাদি বায়ু তত্ত্বের প্রভাবে হয়। আকাশতত্ত্বের প্রভাবে ক্রোধ, হিংসা, লজ্জা, ভয় ও মোহ জন্মে।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ।

অগ্নির গুণ যে রূপ—তাহা চক্ষু দ্বারা, পৃথিবীর গুণ গন্ধ—তাহা নাসিকা দ্বারা, জলের গুণ রস—তাহা জিহ্বা দ্বারা, বায়ুর গুণ স্পর্শ তাহা চর্ম্ম দ্বারাও আকাশের গুণ শব্দ তাহা কর্ণ দ্বারা গ্রাহ্য হয়। অথবা স্থূল কথায় বলিতে হইলে, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা দ্রব্যের শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া সমস্ত বাহ্য জগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি।

পৃথী তত্ত্বের প্রধান স্থান নাভির উপবদেশ। জল তত্ত্বের প্রধান স্থান মস্তিষ্ক। অগ্নি তত্ত্বের প্রধান স্থান পিত্ত। বায়ুতত্ত্বের প্রধান স্থান নাভি-দেশ। আকাশ তত্ত্বের প্রধান স্থান মস্তক।

সহজে নিঃসন্দিগ্ধরূপে তত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে, কেহ কেহ বলেন, পৃথী তত্ত্বে ভয়, জলে লোভ, অগ্নিতে লজ্জা, বায়ুতে সন্তোষ, ও আকাশে দুঃখের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ শরীরে এই কয়েকটীর কোন একটী উৎকটরূপে উদিত হইবামাত্র, সেই সময় কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে তাহা উল্লিখিত চিহ্নে দৃষ্টি রাখিলে অক্লেশে অবগত হওয়া যায়।

রোগ জ্ঞানের উপায়।

রোগ জ্ঞানের উপায় তিন প্রকারে।—দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন। দেহের ক্ষীণতা, বল, বর্ণ, স্থূলতা, পরমায়ুর লক্ষণ, জিহ্বা, মূত্র ও নেত্র প্রভৃতির অবস্থা দর্শনের দ্বারা জানা যায়। নাড়ীর গতি, দেহের শীতলতা, উষ্ণতা, স্ফীতত্তা কোমলতা, কঠিনতা ইত্যাদি স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। দেশ, কাল, জাতি, মল মূত্রাদির সরলতা, অগ্নির দীপ্তি, যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ কাল বিশেষে ব্যাধির হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া এবং অপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। অতঃপর নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা প্রণালী ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

পাগলের প্রলাপ।

প্রলাপ নং ৩।

——(০০)——

বাঙ্গালির বিবাহ।

এ পাগলের চক্ষে বাঙ্গালির মরুময় জীবনের বিবাহই একটি ক্ষুদ্র ওয়েসিস্। এই শুভ দিনে বাঙ্গালিশিশু তাহার গুরুজন ও শিক্ষকের তাড়না ভুলিয়া ভাবী জীবনের সুখ স্বপ্ন দেখে। বাঙ্গালি যুবা এই দিনে সংসারের সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ভাবী সুখে মুগ্ধ হয়, বাঙ্গালি বৃদ্ধ এই দিনে লোক লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া যুবা সাজিয়া বসেন। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই এই মরুময় জীবনের ওয়েসিস্ অনুসন্ধানে ব্যগ্র। কিন্তু হরি! হরি! হরি! একি! এ ওয়েসিসে আসিয়া যখন বাঙ্গালি এক দিন বাস করিয়া একবার সম্মুখে চায়, তখন কি ভয়ানক দৃশ্য দেখে! এই সংসার উত্তাপে উত্তপ্ত সম্মুখজীবনমরুভূমি (?) কি রোমহর্ষণ! কি ভয়ঙ্কর! সম্মুখে অগ্রসর হইলেই চারিদিকে অভাব ঝড় প্রচণ্ডবেগে বহিয়া সংসার মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা উড়াইয়া হৃদয় দগ্ধ করে—সংসার অন্ধকার করিয়া ফেলে। বোম্‌ভোলানাথ! পশ্চাতের মরুভূমি ইহা অপেক্ষা যে সহস্রগুণে ভাল। তবে এ ওয়েসিসের জন্যে এত আগ্রহ কেন? এত সুখস্বপ্ন কেন? এত উন্মত্ততা কেন? ফল কথা বাঙ্গালির আবার বিবাহ কেন? বাঙ্গালির বিবাহ কেন—শুনিবে? বাঙ্গালির সর্ব্বনাশের জন্য!——এ পাগলের কথায় বিশ্বাস হয় কি? বিশ্বাস না হয়, একবার ভাবিয়া দেখ বাঙ্গালির বিবাহ জিনিষটা কি?

প্রভো! একি! এ তোমার কোন্ লীলা? কেন তুমি বিবাহ পদ্ধতি সমাজে প্রবেশ করাইলে? এ বিবাহ অপেক্ষা অসভ্যতার সর্ব্বনিম্নাবস্থাও যে ভাল, প্রভু। কি অশুভক্ষণে এ সভ্যতা বঙ্গসমাজে প্রবেশ করিয়াছে! বাঙ্গালির বিবাহের নাম ছ্যাড়াং ভ্যাড়াং ভ্যাং। এ যজ্ঞে দেশহিতৈষিতা'

উচ্চমন, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুতা জীবনের উচ্চ প্রকৃতি সমস্তই বলি হইয়া থাকে। আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু দূর হউক, এ পাগলের মন স্থির নহে,—ঐ যা, কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম।

হাঁ,—এই বাঙ্গালির বিবাহ বেদিতে অনেক সময়ে একটি বার বৎসরের বালকের এবং আট বৎসরের বালিকার ছ্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং হইয়া থাকে। হরি হরি! এ অবার কি? এইরূপ নিষ্ঠুর বলিদানে আত্মীয় স্বজনের এত আমোদ, এত উৎসব কেন? আবার একি! কৃতবিদ্যা যুবাপুরুষের ও আপনার জীবনের সুখ দুঃখের উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই; তাহাকেও নীরবে হাড়কাটে মাথা দিতে হইবে! এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে হইবে সকলি তাহার পিতা কিম্বা অভিভাবক করিবে। কিন্তু এস্থলে পিতা কিম্বা অভিভাবকের কার্য্য কি? বোম্ ভলানাথ! কার্য্য আবার কি—বাজার বুঝিয়া পাত্রের দর নিরূপণ করা। এখানেও আবার কন্যাকর্ত্তার ছ্যাডাং ডেডাং ড্যাং! ইহার উপর আবার বল্লাল সেনের শ্রাদ্ধ আছে। প্রভো, তোমার শুভ বিবাহের ফল কি বঙ্গদেশে এই হলো? এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য যে আর দেখা যায় না। তুমি অনন্ত দয়ার আধার, এই দয়ার কণামাত্র দান করিয়া এই পাগলকে অন্ধ করিলে না কেন প্রভো? স্বচক্ষে সমাজের এই সকল দৃশ্য দেখা অপেক্ষা যে অন্ধ হওয়া সহস্র গুণে ভাল।

তাহার পর, পাগলের বিবাহ সভার বৃত্তান্তটী কেহ শুনিবে কি? আ মরি মরি! কি অপরূপ দৃশ্য! কোথায় বাঙ্গালার শিরোভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আপনাপন আর্কফলা নাড়িয়া বাক্‌যুদ্ধে একবারে উন্মত্ত। বাঙ্গালার আশা ভরসাস্বরূপ যুবকেরা কোথায় বারোয়ারি ঢেলামারা প্রভৃতি করাদায়ের জন্য বিপক্ষদলকে সম্মুখ যুদ্ধে ঘন ঘন আহ্বান করিতেছে। কোথায় আবার বাঙ্গালার শান্ত, সুবোধ ও সুশীল বালকেরা কলহ যুদ্ধে আপনাদের রণনৈপুণ্য দেখাইতেছে। হরি হরি! একি শুভ বিবাহসভা, না রণভূমি? এই রণভূমির স্থানে স্থানে আবার ক্ষুধার তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত পেটুক ব্রাহ্মণগণ রণস্থলের পরাজিত সৈন্যের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া কত হাসি হাসিয়াছি, কত কান্না কাঁদিয়াছি। হাসিয়াছি—ঘৃণায়, কাঁদিয়াছি—মর্ম্মবেদনায়, হৃদয়ের জ্বালায়।

ইহার পর বাঙ্গালির সম্প্রদান কার্য্য কাহারও দেখিবার ইচ্ছা আছে কি? কাহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক এ পাগলের সে ইচ্ছা ছিল। অনেক দিনও হইল সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, সেই অবধি কি জানি কেন প্রাণের ভিতর জ্বালা করিতেছে, সেই দিন হইতে হৃদয়কে শশ্মান করিয়াছি। হৃদয়কে বলিদান করা অপেক্ষা শশ্মান করা ভাল নয় কি? শরীরের যে অর্দ্ধাঙ্গ, সুখ দুঃখের যে সহভোগী সংসারের যে আশা ভরসা, বিপদের যে সহায়, পরামর্শে যে বন্ধু, জীবনের যে জীবন, প্রাণের যে প্রাণ সেই শুভ সম্মিলনের দৃশ্য সকলে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। হরি হরি! এ কি—অবগুণ্ঠনবতী একটি ক্ষুদ্র বালিকা কম্পিত-কলেবরে কেবল অলঙ্কারলোভে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপবিষ্টা। অল্পবয়স্ক বালকই হউক আর অধিক বয়স্ক যুবকই হউক কেহই অদ্যকার আপনার মস্তকের ভারের গুরুত্ব বিষয় অনুভব করিতে পারিতেছে না। সকলেরই মন বাসরঘরের যুবতীদিগের পদ প্রান্তে পড়িয়া আছাড় পাছাড় খাইতেছে। আর পুরোহিত ঠাকুর! তোমার কি এই কাজ! তুমি অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় মাথামুণ্ড ছাই ভস্ম বকিয়া আপনার কার্য্য শেষ করিলে? তোমারও মাথা-মুণ্ডু বর বুঝিল না, কন্যার ত কথা নাই, কন্যাকর্ত্তা পর্য্যন্ত বুঝিল না। প্রভো! পুরোহিতদিগের এ প্রবঞ্চনা কেন? এখন আর এই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ বঙ্গসমাজে সংস্কৃতে মন্ত্র কেন? কয়জন সে সরল-সংস্কৃত ও বুঝিবে? ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালায় মন্ত্র করিলে চলে না কি? না, না, না, আমার ভুল হইয়াছে, এখন বরং ইংরাজীতে করিলে ভাল হয়। ঐ যা, কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম যে।

তাহার পর, বাসরঘরের ব্যাপার কোন ভদ্র লোকের দেখিবার ইচ্ছা আছে কি? ঘৃণা, লজ্জা, তোমরা অতল জলে নিমগ্ন হও—বাঙ্গালির স্ত্রীলোকের হৃদয়ে (অন্ততঃ বিবাহের রাত্রে) তোমাদের স্থান হইবে না। কে বলে এ দেশীয় স্ত্রীলোকে লজ্জাবতী? লজ্জা থাকিলে একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে এরূপ ঘৃণিত নির্লজ্জ অভিনয় হইত না। প্রভো! কতকাল সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা যে দেখিতে হইবে তাহা তুমিই জান।

এইস্থলে বঙ্গবিধবার কথা কিছু বলিব কি?—না, সে কথায় আর কাজ

নাই;—জগতের কাহাকেও সে নিদারুণ কথা জানাইবার আবশ্যক করে না, বঙ্গবিধবা নীরবে রোদন করুক, নীরবে তাহাদের দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত হউক—সে পবিত্র রোদনধ্বনি যেন বাঙ্গালির পাপ কর্ণে প্রবেশ না করে? প্রভো! আর কেন? এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না, এ জীবন পুষ্প বৃন্তচ্যুত কর। এ বৈধব্যপূর্ণ-পাপ বঙ্গভূমিতে এ পাগলকে কেন পাঠালে প্রভো? বঙ্গসমাজ ছারখার হইয়া যাউক, পৃথিবী হইতে বাঙ্গালির নাম লোপ হউক, জগতের তাহাতে কাহার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, বরং অত্যাচারের হ্রাস হইবে।

সুহাসিনী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুদ্-বীরত্ব।

"Heaven help him !——
And bring him safe to shore ;
For such a gallant feat of arms,
Was never seen before."

Macaulay.

তখন সেই দুই দলের বর্শায় বর্শায়, খড়্গে খড়্গে, অসিতে অসিতে যে ভীষণ ঝন্ঝনা শব্দ উত্থিত হইল তাহা অতি রোমহর্ষণ। সে শব্দ সেই পরিখার জলে প্রহত হইয়া দূর গ্রামান্তর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। কৃষী লাঙ্গল ফেলিয়া সভয়ে ক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল, ব্রাহ্মণ কোষা-কুষি হস্তে জপ করিতে করিতে ভয়ে মন্ত্র ভুলিয়া গেল, পুরসুন্দরীরা যে যাহার গৃহে খিল আঁটিয়া রোরুদ্যমান সন্তানদিগকে শান্ত করিতে মন দিল, দল বাঁধিয়া বহুতর পাখী গাছের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। পোর্ত্তুগীজসেনা সুশিক্ষিত, অস্ত্রচালনে ক্ষিপ্রহস্ত, কিছুতেই হটি

বার নয়, মোগলসেনাও কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহারাও সমান শিক্ষিত, সমান ক্ষিপ্রহস্ত, সমান অটল, অক্ষুণ্ণ, অজেয়। দুই দলের অধিনায়কও সমান বীরধর্ম্মা—রডরিগ এনায়েৎউল্লা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, এনায়েৎ-উল্লাও রডরিগ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধ অতি বিচিত্র ব্যাপার। সে দিনকার সেই যুদ্ধ যে দেখিত, সেই ভাবিত তাহা অতি বিচিত্র! শ্রাবণের ধারার ন্যায় দুই দল হইতে অজস্র শাণিত অস্ত্র দুই দলের গাত্রে আসিয়া পড়িতেছে—ক্ষতি নাই, ব্যাঘ্র যেমন ব্যাঘ্রের উপর লম্ফ দিয়া আক্রমণ করে, সেইরূপ দুই দল দুই দলকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কেহই হটে না, কেহই পশ্চাৎ চাহিয়া দেখে না—চক্ষে বুঝি পলক পর্য্যন্তও পড়িতেছিল না—আস্ফালনে অবিশ্রান্ত অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। রডরিগ একবার আপনার সৈন্য-দিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অসংখ্য সেনার অচির-ছিন্ন মুণ্ড রক্তাক্ত হইয়া ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, মুহূর্ত্তের জন্য সেই বীরের হৃদয়ে শোকের ছায়া দেখা দিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আবার উচ্চে রণভেরী নিনাদিত করিলেন। পোর্ত্তুগীজ সেনা দ্বিগুন উৎসাহে দ্বিগুণ বলে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। সে প্রচণ্ড আক্রমণ মোগলেরা সহিতে পারিল না,—তখন তাহাদিগের অনেক সেনা নিহত হইয়া ভূতল আশ্রয় লইয়াছিল—মোগলেরা কিছু হটিল। এনায়েতউল্লা আপনার অবস্থা বুঝিলেন; তিনি যে সময়ে সেতু পার হইয়া আসেন, তাঁহার আশা ছিল তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাদের সকল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে আশা ফলিল না। রণচতুর রডরিগের আদেশে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে কয়েক জন পোর্ত্তুগীজ অশ্বারোহী সে সেতু রক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিল। এনায়েৎউল্লা আপনার অবস্থা বুঝিলেন; কিন্তু আর চিন্তার অবসর নাই। বহুক্ষণ এক বিষয় লইয়া চিন্তা করাও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এনায়েৎউল্লা সম্মুখস্থ সৈন্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"আর যুদ্ধ করা সাজে না, যুদ্ধ করিলে যে কয় প্রাণী বাঁচিয়া আছি তাহাও দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইব; কিন্তু একেবারে পলায়ন করাও সহজ নয়,

ধূর্ত্ত পোর্ত্তুগীজ তাহা হইলে আরো অক্লেশে আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; এখন উচিত, কতকগুলি সৈন্য এখানে রাখিয়া অবশিষ্ট সকলের ধীরে ধীরে পলায়ন করা; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না, অন্য উপায় নাই। অতএব, এই সকল সেনার মধ্যে কে আছ যে এই মুষ্টিমাত্র সৈন্য লইয়া পোর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবে? বীর কে আছ যে দিল্লীশ্বরের এই কঠোর কার্য্য সাধন করিতে পারিবে?"—এনায়েতের স্বর স্থির, অকম্পিত, স্পষ্টশ্রুত।

সে কথায় বড় বড় সকল সেনাপতি মনে মনে আশঙ্কা গণিল, কেহই সাহস করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া এনায়েতেব চক্ষুঃ জ্বলিল; রোষভরে বলিয়া উঠিলেন—"ধিক্! বাদসাহের সেনাপতিরা কি কেবল কাষ্ঠপুত্তলিকা মাত্র।" এনায়েত দন্তে দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিলেন; আবার বলিলেন "ভাল, কাহারও সাহস না হয়, সকলে মিলিয়া সেতু পার হইয়া যাও, আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব।" সে কথা শুনিয়া সেনাপতিরা মনে মনে লজ্জা পাইল, কিন্তু কেহই ভরসা করিয়া সে অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে একটী সামান্য সৈনিক আসিয়া এনায়েতের অগ্রে দাঁড়াইল। সৈনিক তিনবার ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিল। বলিল "জাহাঁপনা! যদি অনুমতি হয়, এ দাস বাদসাহের এ কার্য্য করিতে প্রাণ পণ করিব।" সৈনিকের বেশ অতি সামান্য, এনায়েত সে সামান্য সৈনিকের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য স্মৃতি যেন তাঁহার হৃদয়পটে কিসের ছায়া আনিয়া উপস্থিত করিল। এনায়েত কিছুক্ষণ লুপ্ত জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু সময় যাইতেছে, আর বিলম্ব সাজে না; তৎক্ষণাৎ এনায়েত অতি সাদরে সেই সৈনিক পুরুষকে যুদ্ধকার্য্যের ভার দিয়া পশ্চাতের দল লইয়া সেতুর নিকট প্রস্থান করিলেন। মোগলের সম্মুখের শ্রেণী পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত অতুল পরাক্রমে যুঝিতেছিল, পোর্ত্তুগীজেরা তাহাতেই ব্যাপৃত ছিল; কিছুই জানিতে পারিল না।

সেতুর নিকট একদল পোর্ত্তুগীজ অশ্বারোহী রক্ষিত ছিল; তাহারা সম্মুখ ভাগে চাহিয়াই সেতু রক্ষা করিতেছিল, তাহাদের উপর ভার ছিল

যেন অপর পার হইতে কোন মোগল সেনা আসিতে না পারে। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে দলবল সহিত এনায়েতউল্লা আসিয়া আক্রমণ করাতে সে অশ্বারোহীদল বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। পশ্চাতের আক্রমণের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, সে প্রচণ্ড আক্রমণ তাহারা সহিতে পারিল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্বারোহীদল ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। এনায়েত-প্রমুখ মোগল সেনা সেতু অতিক্রম করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইল।

এ দিকে মোগলসেনা ক্রমেই হীনবল হইয়া আসিতে লাগিল। যুদ্ধ-বিদ্যায় পোর্ত্তুগীজদিগের নৈপুণ্য অতি অসাধারণ, তাহারা অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে যুঝিতে লাগিল। মোগলসেনা অতি অল্প মাত্রই ছিল—সে অল্পমাত্র সেনা লইয়া কোনও সেনাপতিই সাহস করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে না। কিন্তু অদ্যকার সেনাপতি অসমসাহসিক, সেই সামান্য সৈন্য লইয়াই অযুত বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রডরিগ সেই নূতন সেনাপতির অদ্ভূত রণকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে হস্ত কখন যে বর্শা ধরিতেছে তাহা লক্ষ্য হইতেছে না, অথচ অজস্র বর্শা আসিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ আঘাত করিতেছে, বায়ু যেন তাহাকে পৃষ্ঠে চড়াইয়া লইয়া রণভূমির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে—এই বামে, এই দক্ষিণে, আবার তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ভাগে—সৈনিক অদ্ভুত-গতিতে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পর পার হইতে এনায়েতও সে অদ্ভুত বীরত্ব দেখিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা নবীন সেনাপতি লাভ করিয়া নবীন উৎসাহে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে মূহুর্ত্তে উভয় দলে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল তাহা বর্ণনার অতীত। কিন্তু অসংখ্য সেনার সহিত মুষ্টিমিত সৈন্যের যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? মোগলসৈন্য এক এক করিয়া ভূতলশায়ী হইতে আরম্ভ করিল। সেনাপতি আপনার অবস্থা বুঝিলেন; একবার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, আর পঞ্চবিংশতি মাত্র সেনা অবশিষ্ট আছে, তাহাও আর অধিকক্ষন থাকে না। সে অমানুষ বীরহৃদয়ও কিছুক্ষণের জন্য আশঙ্কিত হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রড়রিগ অল্পক্ষণ মধ্যেই মোগলদিগের কার্য্য বুঝিলেন, একজন পলায়িত অশ্বারোহীও ইতি-মধ্যে তাঁহাকে সংবাদ আনিয়া দিল। তখন সাগরবারিবৎ সমস্ত পোর্ত্ত-

গীজ সেনা সেই পঞ্চবিংশতি মোগলের উপর চাপিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে একটী মোগলও সে ক্ষেত্রে জীবিত রহিল না। সেনাপতি আপনার অবস্থা বুঝিলেন, আর কৌশল সাজে না, সহস্র সহস্র শাণিত কৃপাণ শোণিতলিপ্সু হইয়া তাঁহার মাথার উপর উত্তোলিত হইয়াছে—চিন্তার অবসর নাই—তৎক্ষণাৎ একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া একবার নিম্নে মাতৃভূমির প্রতি চাহিয়া বীরসৈনিক সেই পরিখার অগাধ জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন।

এনায়েত পর পার হইতে সেই অদ্ভুত বীরসৈনিকের আসন্ন বিপদ্ জানিয়া আকুলিত হইতেছিলেন, হঠাৎ জলে লম্ফ দিয়া পড়াতে উচ্চে আনন্দের শব্দ উচ্চারণ করিলেন। পোর্ত্তুগীজ লক্ষ্য করিয়া সেই জলের উপর বন্দুক চালাইতে লাগিল। একে সর্ব্বশরীর অস্ত্রশস্ত্রে আবৃত, তায় ভয়ানক রণক্লেশ—সে অবস্থায় সন্তরণ করা সহজ নহে—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্লান্তি বোধ নাই—বীরসৈনিক সন্তরণ করিয়া চলিলেন। আবার পোর্ত্তুগীজবন্দুক ছুটিল। সৈনিক জলমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন; অনেকক্ষণ দেখা গেল না, দূর হইতে এনায়েত তাহার মৃত্যু ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য রক্ষরিগের বীর হৃদয়ও সেই অদ্ভুত বীরের পরিণাম ভাবিয়া বিষাদিত হইল। দেখিতে দেখিতে জলের উপর আবার সৈনিকের মাথা জাগিয়া উঠিল। এনায়েত তাহা দেখিয়া হর্ষে চীৎকার ছাড়িয়া উঠিলেন, পোর্ত্তুগীজবন্দুকের গুলি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে প্রধাবিত হইল। সৈনিক আবার ডুবিলেন। প্রায় এক দণ্ড অতীত হইয়া গেল; আর কেহই সে বীর-অঙ্গ সেই পরিখার জলে দেখিতে পাইল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মের লিখন।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগর সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি!——

জ্ঞানদাস।

করতোয়ার জলে গাত্র ধৌত করিয়া ধীর, বায়ু তখনও বকুল পত্র

করিতে২ প্রবাহিত হইতেছিল; আকাশের চাঁদ সেই হরিৎ দূর্ব্বাক্ষেত্রের উপর তখনও আপনার রজতকিরণ ঢালিয়া দিতেছিল; দূরস্থ করতোয়ার মৃদু-মধুর কলধ্বনিতে মজিয়া বকুল-বৃক্ষ সহস্র নেত্র বিস্ফারিত করিয়া তখনও তলস্থ সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। পূর্ব্বের ন্যায় সবই তখন সেইরূপ ছিল; কিন্তু সে দৃশ্য তখন সেরূপ ছিল না! সুহাসিনী আর বিনোদের পদতলে নাই, অকস্মাৎ বজ্রাহত হইলে লোকে যেমন স্থির, নিশ্চল এবং নিষ্কম্প ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সুহাসিনী বিনোদের নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সেইরূপে দাঁড়াইয়া— সেইরূপ স্থির, নিশ্চল, নিষ্কম্প। মুখ ফুটিবার চেষ্টা হইতেছে অথচ ফুটিতেছে না, চক্ষু ফাটিবার উপক্রম হইতেছে অথচ ফাটিতেছে না, উদাস-দৃষ্টে কি-জানি-কি-মনে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। বিনোদও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সুহাসিনীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল। বিস্ময়-বিহ্বল বিনোদও স্থির, নিশ্চল, নিষ্কম্প। সে রাত্রে সেই সময় সেই দুই মূর্ত্তি যে দেখিত, সেই ভাবিত কোন চিত্রকর দুটি আরম্ভের মূর্ত্তি চিত্রার্পিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাহা দেখিতে সে সময় সেস্থানে কেহই ছিল না।

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বিনোদ বলিল—"তুমি অমন করিতেছ কেন—তোমার কি হইয়াছে?"

সুহাসিনী কথা কহিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে২ বলিল—"তিনি কোথায়?"

বিনোদ বলিল—"কৈ দেখিতেছি না। বুঝি, চলিয়া গিয়াছেন।"

"চলিয়া গিয়াছেন!" মর্ম্মের নিভৃত স্থান হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া সুহাসিনী একবার শূন্যদৃষ্টে শূন্যপানে চাহিল। "তিনি কি" সুহাসিনী ধীরে২ আবার বলিল—"তিনি কি আমাদের দেখিয়াছিলেন?"

বিনোদ বলিল—"দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি?"

সুহাসিনী কোনও উত্তর করিল না। মনে মনে বলিল—"দেখিয়াছিলেন! দেখিয়াছিলেন অথচ চলিয়া গিয়াছেন!" সুহাসিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। একবার চন্দ্রের প্রতি চাহিল—আকাশের চাঁদ চলিয়া চলিয়া কত উপহাসের হাসি হাসিল; বকুল

বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বকুল বৃক্ষ যেন সহস্র নেত্রে ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল। "গিরিবালা? দিদি গিরিবালা কোথায়?"—ব্যগ্রতার সহিত সুহাসিনী একবার গিরিবালার জন্য চরিদিকে চাহিল। গিরিবালা নাই! সুহাসিনী আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। দৌড়িয়া গিরিবালার অনুসন্ধানে চলিল।

অদূরে যেখানে একটী মাধবীলতা একটী সহকার তরুকে বেষ্টন করিয়া আপনার নবীন পত্রে তাহার অঙ্গ আবরিত করিয়াছিল, গিরিবালা সেই খানে দাঁড়াইয়া কে জানে কত কি চিন্তা করিতেছিল। সুহাসিনী দৌড়িয়া গিয়া ডাকিল—"দিদি"—সুহাসিনীর স্বর অস্পষ্ট, বাষ্পবিকৃত। গিরিবালা সে স্বর শুনিয়া চমকিত হইল। চমকিত হইয়া দেখিল, সুহাসিনী নীরবে কাঁদিতেছে। প্রেমিকের হৃদয় প্রেমিকের হৃদয় বুঝিল। বলিল—"দিদি, তুমি কাঁদিবে কেন? তোমার কিসের দুঃখ?" গিরিবালা তখনও জানিত না সুহাসিনীর প্রকৃত দুঃখের কারণ কি, সে ভাবিয়াছিল, বুঝি তাহারই জন্য সুহাস কাঁদিতেছে; তাই গিরিবালা আবার বলিল—"আমি অভাগিনী; আমার অদৃষ্টে সুখ নাই; তুমি কি করিবে?"

সুহাসিনী আর দাঁড়াইতে পারিল না; গিরিবালার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে২ বলিল—"দিদি আমার কপালে কি ছিল—কি হইল?"

সুহাসের কথা শুনিয়া গিরিবালার কি যেন মনে পড়িল; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বদনমণ্ডলে কালিমার ছায়া দেখা দিল; গোপনে গিরিবালা এক বিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিল। সুহাসিনী বালিকা; বালিকার ন্যায় আবার বলিল—"কি হইবে দিদি? দিদি, তুমি কি তাঁকে দেখিয়াছ? তোমার পায়ে পড়ি, বল, তিনি কি রাগ করিয়া গেলেন?"

গিরিবালা তখন অন্য উপায় না দেখিয়া স্বান্তনায় মন দিল। গিরিবালা চারুকে দেখিয়াছিল; কিন্তু চারুকে সে চিনিত না। চারু মনের যন্ত্রণায় যে সকল কথা বলিয়াছিল গোপনে থাকিয়া গিরিবালা তাহা শুনিয়াছিল। শুনিয়া বুঝিয়াছিল, চারু কে। গিরিবালা বলিল—"তাঁকে দেখিয়াছি। কিন্তু রাগ করিবেন কেন?"

"না, দিদি, তিনি রাগ করেছেন। তা নইলে এতদিনের পর দেখা—" সুহাসিনী আর বলিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল।

গিরিবালা বলিল—"তা কাঁদ কেন, দিদি? তুমিই তো আমাকে বলিয়াছিলে—কাঁদিলে কি হইবে?"

"আমি কাঁদিতাম না; কিন্তু তিনি কি মনে ভাবিলেন? আমার কি করিতে কি হইল?"

এইবার গিরিবালা বড়ই মর্ম্মে আঘাত পাইল। সে আপনার জন্য সহস্র প্রকার কষ্ট অবহেলায় সহ্য করিতে পারে,—অবহেলায় তাহা সহ্য করিতেছে; কিন্তু তাহার জন্য অন্যের কষ্ট! তাহার জন্য সুহাসিনীর এই ঘোর দুঃখ! গিরিবালা যখনই তাহা ভাবিল, তখনই তাহার প্রাণ যেন দুঃখে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিল। "হায় আমি অভাগী কেন মরিলাম না? আমার জন্য তোমার এই কষ্ট!" গিরিবালা আর বলিতে পারিল না; মনের আবেগে অশ্রুর প্রবল ধারায় তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। নিঃশব্দে গিরিবালা কাঁদিল।

বালিকা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল; বলিল—"দিদি, তুমি কাঁদিও না। তুমি কাঁদিলে আমি কাহার কাছে যাইব?"

সুহাসিনী জমিদারের কন্যা, আর গিরিবালা অনাথিনী। গিরিবালা সুহাসের কথা শুনিয়া আপনা বিস্মৃত হইল। একবার সম্মুখের সেই সরলতার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। বলিল—"ভাবনা কি, দিদি? তিনি যেখানে গিয়াছেন তাহা আমি জানিয়াছি।"

মুহূর্ত্তের জন্য বালিকা স্বর্গ দেখিল; বলিল—"সত্যি—সত্যি—কোথায় দিদি?"

"সে অনেক দূর, আমি যাইতে পারি। তোমার জন্য আমি যাইব। কিন্তু তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না।"

"আমি যাব না—তুমি যাবে—আমি যাব না—কেন, দিদি?" বালিকার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিয়াছিল।

গিরিবালা বলিল—"ছিঃ ইহাতেও চক্ষের জল! এই বয়সে এত ভালবাসা তোমার?"

সুহাসিনী কথা কহিল না, নীরবে মাটিপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীরবে গণ্ডঃস্থল বহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

গিরিবালা বলিল—“বুঝিয়াছি, এখন চল, বাড়ী যাই; কাল প্রাতেই যাইবার উদ্যোগ করিব।”

সুহাস কথা কহিল না। গিরিবালা আবার বাড়ী যাইবার কথা পাড়িল। সুহাস রাগিল। গিরিবালার উপর সুহাস এই প্রথম রাগ করিল। বলিল—“আমি জানিতাম, তোমারও হৃদয় ভালবাসায় গলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছিঃ এত কঠিনতা তোমার?”

গিরিবালা অপ্রতিভ হইল। বলিল—“তবে এখন উপায়?”

সু। অন্য উপায় দেখিনা। চল যাই।

গি। এখনই?

সু। এখনই।

হিংস্রক সম্মিলনী।

আমাদের কোন স্পেসিয়েল পত্র-প্রেরক নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ৪ ঘটিকা ৩৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের সময় চম্প-কারণ্যে শার্দ্দুল-শ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত লম্বোদর সি, আই, ইর গৃহে মহাসমা-রোহের সহিত হিংস্রক সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার কার্য্য বিবরণ অদ্যকার মেলে ডেস্‌প্যাচ করিলাম।

বেলা ১টা বাজিতে না বাজিতে প্রকাণ্ড সভাগৃহ বহুবিধ হিংস্রক জন্তুর সমাগমে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সত্যের অনুরোধে এইখানে বলিতে হইল যে, ভল্লুককুলতিলক দীর্ঘনখা পুলিস কমিসনার অতি দক্ষতার সহিত শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা সময়ে সকল সভ্য সমাগত হইলে ক্ষীপ্রপদ বরাহ স্কয়ার এই সভার সেক্রেটারী এবং লম্বোদর সি, আই, ই সভাপতি মনোনীত হইলেন। পরে, সভাপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেক্রে-

টারী অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য সকল সভ্যের নিকট নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিলেন,—"মিষ্টার সভাপতি, স্ত্রী এবং পুরুষসভ্যগণ! অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য আপনারা শ্রবণ করুন। আপনারা সকলেই জানেন যে, ইংরাজ আমাদের চিরশত্রু, তাহাদের শত্রুতায় তাহাদের সীমা—লোকালয়ে যাইবার আমাদের অধিকার নাই, অধিক কি আমাদের সীমায় থাকিয়াও আমরা নিরাপদ নই। অনেক সময় তাহারা কেবল আমোদ করিবার জন্য আমাদিগকে বধ করে, এবং আমাদের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া সেই স্থান আপন সীমাভুক্ত করিয়া লয়। কিন্তু আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। "অস্ত্র শাসন" নামে এক আইন দ্বারা এই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন আমরা সচ্ছন্দে তাহাদের সীমায় যাইয়া আপনাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিতে পারি। এইজন্য আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি, সভ্যজাতির নিয়মানুসারে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের উচিত। এখন কি উপায়ে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, সে বিষয় সভ্যগণ আপনাপন মত প্রকাশ করুন।"

এই বলিয়া চড়্ চড়্ শব্দের মধ্যে সেক্রেটারী আপন আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সভাপতি উঠিয়া রুধিরপ্রিয় নামা কোন যুবা ব্যাঘ্রকে প্রথম প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন রুধিরপ্রিয় গাত্রোত্থান করিবা মাত্র চারিদিকে লাঙ্গুলের চটাচট্ শব্দ হইল, সকলেই আগ্রহের সহিত এই নবীন বক্তার দিকে চাহিল। বক্তা নিম্নলিখিতরূপে ঘাড় ও লাঙ্গুল নাড়িয়া আপনার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।—

"সভ্যগণ! আমি অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। এপ্রস্তাব বোধ হয় আপনারা সকলেই অনুমোদন করিবেন। আপনাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণার জেনারেলের পূর্ব্বে মান্যবর লর্ড লিটন নামে একজন সুযোগ্য, বিচক্ষণ, সর্ব্বকর্ম্মপারদর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিই আমাদের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া এই "অস্ত্র শাসন" আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনার জন্য আপনি ও যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পরিচয়ের বিষয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনিই আফ্‌গান যুদ্ধের অধিনায়ক। এই যুদ্ধের জন্য আমরা না হই, কিন্তু আমাদের পরমাত্মীয় ভ্রাতৃসম আফ্‌গাণ অরণ্যবাসীরা তাঁহার নিকট বিশেষরূপ ঋণী আছেন, সেই মহাত্মার অনুগ্রহে তিন বৎসর তাঁহাদের আহারের জন্য আর ভাবিতে হয় নাই; তিনি আরো কয়েকটি ভারতের মঙ্গলকর কার্য্য করিয়াছেন।" এই সময় চারিদিক হইতে "শুন, শুন" শব্দ হইতে

লাগিল। সভাপতি উঠিয়া "নিয়ম নিয়ম" করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইল। বক্তা পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"কিন্তু সে সকল কার্য্যের সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকায় এখানে তাহা উল্লেখ করা হইল না। এখন তিনি ইংলণ্ডে বসিয়া আপনার যশোগান শুনিতেছেন। আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে সেই মাহাত্মাকে এই সভার ধন্যবাদ দেওয়া হউক। অদ্যাই তাড়িত বার্ত্তা সেই ধন্যবাদ বহন করিয়া লইয়া যাউক।"

এই বলিয়া বক্তা আপন আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিক হইতে আবার ভীমরবে চট্ চট্ শব্দ হইল। তাহার পর দীর্ঘলাঙ্গুল নামে জনৈক নেকৃড়ে এই প্রস্তাব দ্বিতীয় করিয়া বলিলেন—"যদি ও আমি আমাদের উচ্চবংশীয় মাহাত্মাদিগের ন্যায় এই আইনের সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হই নাই; কারণ, মনুষ্য রক্ত আমাদের অদৃষ্টে এখন ও দুর্লভ রহিয়াছে; কিন্তু সে আইনকর্ত্তাদিগের দোষে নহে, সে আমাদের নিজের দোষে। আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, এই আইন প্রচার হওয়া অবধি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে, ছাগ ও মেষ রক্ত ভক্ষণ করিতেছি এবং সময় সময় গৃহস্থের বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া ছোট ছোট শিশুগুলিকে ধরিয়া আনিয়া খাইতেছি। অতএব আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম বক্তার সুন্দর প্রস্তাব দ্বিতীয় করিলাম।"

এই বলিয়া তিনি আপনার ল্যাজ সামালাইয়া লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সভাপতি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"এই প্রস্তাবের যাহারা পক্ষ তাহারা আপনাপন লাঙ্গুল উত্তোলন করুন। তখন সকলেই একবাক্যে "সকল, সকল" বলিয়া আপনাপন লাঙ্গুল উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া সভাপতি হৃষ্টমনে লম্ফনকুশল রায় বাহাদুরকে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবকারী একলম্ফে গাত্রোত্থান করিয়া লম্ফ ঝম্প সহিত বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।—

"সভাপতি এবং সভ্যগণ! এই প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝিয়া দেখিলাম, যে আমি সে ভার পৃষ্ঠে কখনই বহন করিবার উপযুক্ত নহি। এই প্রস্তাবের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেই সর্ব্ব শরীরের লোম সকল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, এবং শীরায় শীরায় সতেজ, জীবন্ত হিংস্রক রক্ত ধাবিত হয়, সমাগত সভ্যদিগের মধ্যে বোধ হয়, সকলি জানেন যে আমাদের হিংস্রক-হিতৈষী লর্ড লিটন বাহাদুরের পর লর্ড রিপণ নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একজন শাসনকর্ত্তা এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমাদের মধ্যে বড়ই ভয় হইয়াছে, তিনি যেরূপ প্রজাহিতৈষী তাহাতে আমাদের সে সন্ধি ভঙ্গ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে; আমার অদ্যকার প্রস্তাব এই, যাহাতে এই সন্ধি ভঙ্গ না হয়, তাহার কোন বিশেষ উপায়

করিতে হইবে। কারণ, এই সন্ধির উপর আমাদের সুখসাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে। অতএব আমি প্রস্তাব করি আমাদের মধ্য হইতে সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ লইয়া একটি সব্ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং তাঁহারা বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালী সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সময়ানুসারে কার্য্য আরম্ভ করিতে থাকুন। আমাদের সহায় অনেকেই আছেন—সুযোগ্য অনেক দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় ইংরাজ সম্পাদকগণ আমাদের কার্য্যের অনুমোদন করিবেন। ইহা ব্যতীত অশেষগুণালঙ্কৃত হিংস্রক প্রাণীহিতৈষী মহামতি লর্ড লিটন এবং তাঁহার ভারত ও ইংলণ্ডস্থ গোঁড়া আর সহযোগীরা আমাদের কার্য্যে সাহায্য করিবেন। এই সকল উচ্চদরের সাহায্যকারী থাকিতে যদি আমরা লর্ড রিপণের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে না পারি, তবে আমাদের পশু জন্মই বৃথা!"

এই বলিয়া তিনি আপন আসন গ্রহণ করিলেন, চারিদিকে তাঁহার প্রশংসাসূচক ধ্বনি হইল। এই প্রস্তাব দ্বিতীয় করিতে এক দীর্ঘাকার বন্যমহিষ হেলিয়া দুলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু তিনি উঠিয়া ভালরূপ কিছুই বক্তৃতা করিতে পারিলেন না; এক পাৎ করিয়া শীঘ্রই বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর এই প্রস্তাবে সকলের অভিমতি লইয়া সভা ভঙ্গ করিবার যখন উপক্রম হইয়াছে তখন এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র দুর্ব্বলতার পরিচয় দিবার জন্য আপনা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"সভাপতি মহাশয়, ও সভ্যগণ! আমার আর এক নূতন প্রস্তাব আছে, সে প্রস্তাব বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেরই অনুমোদিত হইবে, আমার প্রস্তাব এই যে কেবল "অস্ত্রশাসন আইন" দ্বারা আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ সুবিধা হইতেছে না; সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করা হউক যে, যদি তাহারা আমাদের সহিত বন্ধুতা রাখিতে চায়, তবে আহারের জন্য আর যেন আমাদের কষ্ট স্বীকার করিতে না হয়, অতঃপর আমাদের আবাসে তাহারা যদি তাহাদের প্রজা সকল আমাদের আহারের জন্য প্রেরণ করে, তবে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হই।"

বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের এই প্রস্তাব শুনিয়া সকল সভ্যের মুখে লাল পড়িতে আরম্ভ হইল, সকলই যেন তাহা অনুমোদন কবিত উৎসুক হইল। তখন সভাপতি উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লিটনরাজ্যে এ প্রস্তাব করিলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এ রিপণ রাজ্যে এ প্রস্তাবের কোন ফলই হইবে না।"

তাহার পর সভাপতির অনুমতি অনুসারে সভা ভঙ্গ হইল।

জোনাকি।

—oSo—

আঁধার বড়ই ভাল লাগে।
বনটির লতায় লতায়,
গাছটির পাতায় পাতায়
আঁধার ছড়াই অনুরাগে।

ছোট আমি, ছোট মত থাকি,
রবির নিকটে নাহি যাই,
বড় তেজ!—দেখিলে ডরাই,
পাতার আড়ালে দেহ ঢাকি।

চাঁদে হাসে—হাসি পরিপাটি!
দূর হ'তে লুকাইয়ে দেখি,
ক্ষুদ্র আলো চাপা দিয়ে রাখি.
আঁধারেই করি মিটিমিটি।

সাঁঝের বেলায় দেখি চেয়ে,
আধ-আধ ঘোমটা খুলিয়ে।
ফুলবধূ আঁধারে ফুটিয়ে—
আমোদে অমনি যাই ধেয়ে।

আঁধারে কি তারকার হাসি!
ধরিবারে যাই শূন্যে ছুটে,
চ'খেতে আঁধার-কণা ফুটে;
সে হাসি তবুও ভালবাসি।

গেল সন্ধ্যা, আসিবেক রাতি,
প্রণয়ীর ভাবনায় মরি,
কোথা যাব—কোথা সে—কি করি?
যথাসাধ্য খুঁজি আতি পাতি।

জ্বালিয়ে প্রেমের মধুবাতি—
প্রাণ যায় তবু সে স্বীকার—
খুঁজে খুঁজে ফিরি চারি ধার,
এম্নি মোর প্রেমের ব্যাসাতি।

অতি ক্ষুদ্র দেহ আপনার,
উড়ে যাই বাতাসের ভরে,
ক্ষুদ্রাশয়ে থাকি একধারে,
সংসারের নাহি ধারি ধার।

নিভি, জ্বলি,—জ্বলি, নিভি ক্ষণে,
কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,
প্রত্যাশায় কিছু নাহি চাই,
নিভি, জ্বলি আপনার মনে।

আকাশে মেঘের বড় ঘটা!
পান্থ পথভ্রান্ত অন্ধকারে,
যথাশক্তি গিয়ে ধীরে ধীরে
জ্বেলে দেই কিরণের ছটা।

ক্ষুদ্র আমি,—ক্ষুদ্র উপকার,
মানুষের নাহি ধরে মনে,
ক্ষীণ অঙ্গ চাপিয়ে চরণে
সেরে দেয় জীবন-ব্যাপার।

মরি, কিন্তু সেও মোর ভাল;
ক্ষুদ্র হ'য়ে জন্মেছি যখন,
ক্ষুদ্র কাজে ত্যজিব জীবন,
(তাই) মরিয়াও তবু দিই আলো।

বাঙ্গালায় চিনির কারবার।

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—এ কথাটি বহুদিনের। বহুদিন হইল, আমরা এ কথাটি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালা হইতে বাণিজ্যের পাট একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে বাণিজ্য ব্যবসা বাঙ্গালীর পক্ষে নষ্টচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালায় বাণিজ্যের চালনা আর নাই, সুতরাং বাঙ্গালায় লক্ষ্মীর দৃষ্টিও আর নাই। বাঙ্গালী এখন গোলামি করে, পরের জুতা বয়, মাস কাবারে টাকা আনে, মাস কাবার না হইতেই তাহা ফুরাইয়া দিয়া বসে। এই চাকুরিগত জীবনে যদি কোনও বাঙ্গালী ব্যবসা করিতে শিখে, কারবারী হয় তাহা বড় সুখের কথা। প্রত্যক্ষে না হউক, পরোক্ষে বাঙ্গালী এখন অনেকটা বাণিজ্যের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। বাঙ্গালী এখন প্রেস চালায়, ষ্টেশনারির দোকান খুলে, কখন বা বড় বড় ব্যবসায়ও হাত দেয়। ইহার ফল যাহাই হউক, ইহা দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, কতকটা আপনাদেরও ভাল বটে। কিন্তু ইহাদিগকে রীতিমত বাণিজ্য বলে না। রীতিমত বাণিজ্যের জন্য অনেক সামগ্রী আছে। অনেকে সে সকল সামগ্রী লইয়া রীতিমত বাণিজ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের চেষ্টা, উদ্যম এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, মনে ভরসা হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সেই বাণিজ্যের কোনও বিঘ্ন-আশঙ্কা দেখিলে আমরা ভীত হই, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠে। আজ সেই জন্যই আমরা এই উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। সেই জন্যই বাঙ্গালায় চিনির কারবার সম্বন্ধে দুই একটি বিশেষ কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালায় চিনির কারবার চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এত বহুলবিস্তৃত ছিল না; এখন চিনির খরচ বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহার কারবার ও বহুলবিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখন রেল খুলিয়াছে, খাল কাটা হইয়াছে, রপ্তানির সুবিধা ঘটিয়াছে; কাজেই

বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখন চিনির কারবার বাড়িয়াছে। কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী সুখচর গ্রামে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ২।৪ খানি মাত্র ভাল কারখানা ছিল, এখন সেখানে তাহার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, গুড়ের ভাঁড় ভাঙ্গা খোলার জন্য তথাকার রাস্তাঘাটে পা পাতা যায় না। গোবরডাঙ্গা অঞ্চলেও কম নহে। বাঙ্গালার কোটচাঁদপুর প্রদেশে এ কারবার আরও বিস্তৃত। কলিকাতার বড়বাজারের চিনিপটি একরূপ এই সকল গ্রামের রপ্তানি হইতেই জোর আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে গ্রামে কত শত লোক যে ছোট খাট কারখানা খুলিয়া রহিয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? বাস্তবিক, ইহা বড় শুভ লক্ষণ। কিন্তু এ শুভ ভাব বুঝি বেশি দিন থাকে না। বাঙ্গালায় চিনির কারখানাগুলি বুঝি এক একটি করিয়া ক্রমে উঠিতে বসে।

তাল, আখ ও খেজুর এই তিন গাছ হইতে গুড় জন্মায়। বাঙ্গালায় তালের গুড়ের বড় একটা প্রথা নাই। আখের চাস বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এখন যে আখ জন্মে, তাহার মধ্যে শামশাড়াই অধিক। পূর্ব্বে বোম্বাই আখের চলন ছিল, কিন্তু এখন আর বোম্বাই আখ বড় দেখা যায় না। আগে আগে কাজলা আখেরও চাস মাঝে মাঝে সেখানে সেখানে দেখা যাইত; কিন্তু এখন আর মেদিনীপুর ভিন্ন তাহার চাস অন্যত্র হয় না। সেখানেও পূর্ব্বের মত তত অধিক ইহার চাস এখন নাই। পুঁড়ি আখের নাম পর্য্যন্ত এখন আর শোনা যায় না। খেজুরে গুড়েই এখন দেশ রাখিয়াছে। বাঙ্গালার পূর্ব্ব অঞ্চলে ইহার বড় ফ্যালাও কারবার। আমরা উপরে যে সকল চিনির কারখানার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রায় সকলই খেজুরে গুড় হইতে চলিতেছে। কিন্তু দিন দিন চিনির যেরূপ খরচ বাড়িতেছে, তাহা এক খেজুরে গুড় হইতে কুলান হয় না, কুলান হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালায় আখের চাসের প্রয়োজন। আখের চাস বাঙ্গালায় যাহা আছে, তাহা অতি যৎসামান্য মাত্র। মার্কিন দেশে আখ হইতেই চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেখানে যাহাদের আখের চাস আছে তাহারা এক একজন এক একটী ধনকুবের। মরীসু দ্বীপে আজকাল আখের চাসের

বড়ই প্রাদুর্ভাব। মরীস্ দ্বীপ তাহার এখো চিনি লইয়া, বোম্বাই হইয়া, দিনে দিনে যেরূপ ভারতের সমগ্র প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় বাঙ্গালার চিনির পক্ষে অনিষ্ট ঘটিবে। বাঙ্গালা তাহার সহিত সমানে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, বাঙ্গালায় অত চিনি জন্মে না। যাহা জন্মে, তাহা প্রায় বাঙ্গালাতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, বাহিরে বড় যাইতে পায় না। আরো অধিক দিন এইরূপে চলিলে মরীস্ দ্বীপের চিনিই ভারতে অধিক ব্যবহৃত হইবে; প্রয়োজনমত যোগাইতে পারিলে তাহারই আদর বাড়িবে। যাহা ভারতের সকল স্থানে হইবে ক্রমে বাঙ্গালায়ও তাহা হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালী যে দিকে দু পয়সা সস্তা দেখিবে, সেই দিকেই ঝুঁকিবে। যাহা অল্প পরিমাণে জন্মে তাহা অপেক্ষা যাহা বেশি পরিমাণে জন্মে তাহার মূল্য কম। সুতরাং বাঙ্গালার চিনির কারবারের পরিণাম কি দাঁড়ায় তাহা ভাবিয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে।

এ আশঙ্কা থাকে না, যদি বাঙ্গালা প্রতিযোগিতা করিতে পারে, যদি বাঙ্গালায় আখের চাস হয়। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গালায় ৫৫২৭৭৩ বিঘা জমিতে আখ জন্মায়। কিন্তু ইহা অনুমান, ঠিক্ হিসাব নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধারণা, ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভূমিতে শর্করা উৎপাদক উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, ফল কথা, আখের চাস বাঙ্গালায় প্রয়োজনমত হইতেছে না। নেনো জমিতে আখ হয় না সত্য, কিন্তু ডাঙ্গা জমিতে হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় তেমন অনেক জমি পতিত পড়িয়া থাকে, অনেক জমিতে কেবল বাঁশ বাবলা জন্মায়। সে সব জমি পাট করিয়া আখের চাস করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা—লাভ নিশ্চিত। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যেমন কেন জমি হউক না, আখের চাসে বিঘা করা ২৷৷০ মণ গুড়ের কম জন্মে না। বাঙ্গালার জমিতে সোণা ফলে, তাহা ভাল করিয়া চাস দিলে বিঘা প্রতি ১২৷১৩ মণ পর্য্যন্ত গুড় জন্মিতে পারে। যদি মণ করা ৪ টাকা দর ধর, তাহা হইলেও এক বিঘা ভূমিতে লাভ কত! আমরা যে মরীস্ দ্বীপের আশঙ্কা করিতেছিলাম, বাঙ্গালা যদি উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তাহা হইলে মরীস্ দ্বীপ কখনই তাহার সহিত পারিবে না। মরীস্ দ্বীপ অপেক্ষা বাঙ্গালার জমিতে যে

অধিক পরিমাণে আখ জন্মিতে পারে, তাহা সেদিনকার এগ্রিকল্চরিষ্ট পত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ সকল কথা বাঙ্গালার কেহ বুঝে না।

বাঙ্গালার কেহ এ সকল কথা বুঝে না, কিন্তু বিলাতের লোকে বুঝে। বিলাতের লোকে বুঝে বলিয়াই ইহার রিপোর্ট রিজোলিউশন প্রভৃতি প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের ইহার উপর লোভ পড়িয়াছে। বাঙ্গালা আরো যদি দিনকতক এরূপ গা ঢিলা দিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে পরে পস্তাইতে হইবে। তাহার চিনির কারবার টেকিবে না। দু দিন না যাইতেই সাহেবেরা তাহা একচেটিয়া করিয়া নীলকর চা-করদিগের ন্যায় চিনিকর হইয়া বসিবে। বাঙ্গালীদিগকে তখন কারখানা বেচিয়া তাহাদিগের অধীনে খাটিতে হইবে। সে ভবিষ্যৎ দৃশ্য মনে ভাবিতেও আমাদের বড় কষ্ট হয়। অতএব এই বেলা ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য। চাসাদের উপর সকল নির্ভর করিয়া থাকা অন্যায়। তাহাদের পয়সা নাই, তাহাদের দ্বারা সে ফ্যাশাও চাস হওয়া অসম্ভব। গ্রামে যাঁহারা লোক রাখিয়া চাস আবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ও উপর তটা আশা করা যায় না; তাঁহাদের তেমন মূলধন নাই। এখন উচিত যাঁহারা কারবারী,—যাঁহারা চিনির ব্যবসা খুলিয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজে মূলধন যোগাইয়া এই চাসে প্রবৃত্ত হন। আমাদের এখানে যাঁহারা চিনির কারবার করেন, তাঁহারা প্রায় কেহই খেজুর বা আখের চাস করেন না, চালানে গুড় কিনিয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি গাঁয়ে গুড় না জন্মিল, তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। আসল বস্তুতে এত পর-প্রত্যাশী হইলে বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, বিঘ্ন ঘটিবার উপক্রমও হইয়াছে। এ বিঘ্ন অতিক্রম করা আশু প্রয়োজন। যাঁহাদের একটু ভাল রকম চিনির কারবার আছে, তাঁহারা আরো কিছু মূলধন খাটাইয়া যদি এই বেলা হইতে আখের চাসে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এ বিঘ্ন দূর হইতে পারে। নচেৎ ইহার অন্য উপায় দেখি না।

ইহা ছাড়া, আরো একটি অন্তরায় জুটিয়াছে। বাঙ্গালায় কলের চিনির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। এখনও তবু ইহা তত বেশি প্রচলিত হয় নাই,

তথাপি দেশী চিনির বাজার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ভাল লক্ষণ নহে। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রচলন যে বৃদ্ধি পাইবে না, তাহা কে বলিবে? বাঙ্গালার প্রাচীনেরা বা বিধবারা না হয় আজ কাল জাতিভ্রংশের ভয়ে তাহা ব্যবহার না করিতে পারেন, না হয় পাড়াগাঁয়ের ধর্ম্মভীতু ব্যক্তিরা ইহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে চিনির খরচ কত? সে অতি যৎসামান্য মাত্র, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। অথবা দুই দিন পরে লবণ-আস্বাদনের ন্যায় তাঁহারাও যে পশ্চাতে এ চিনির স্বাদ গ্রহণ করিবেন না তাহাই বা কে বলিবে? বিলাসীদিগের মধ্যেই চিনির খরচ অধিক; বিলাসীরা ধর্ম্ম মানেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের অনুগ্রহে অচিরাৎ কলের চিনির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইবে। ইহার মধ্যেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক মহাজন দেশী চিনি লইয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছেন; অনেক ব্যবসাদার মনোদুঃখে কারখানা উঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হাতে অপেক্ষা কলে অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পরিষ্কার ও হয়। হাতের চিনি অপেক্ষা কলের চিনি অধিক পরিষ্কার, অথচ তাহার দর কম। যে রকম দোবরার দর ১৪।১৫ টাকা, ঠিক সেই রকম অথবা ততোধিক উৎকৃষ্ট কলের চিনির দর ১০ টাকার অধিক নহে। ১০ টাকায় পাইলে লোকে কেন সে জিনিষ ১৫ টাকায় কিনিবে? সুতরাং দেশী কারখানার একটী মহৎ বিঘ্ন জুটিয়াছে। কলে কারিগরদিগের ডাইন হাত কাটিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, কারবারীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আরও এইরূপ করিয়া দিন কাটাইলে ইহার পর আর সময় পাওয়া যাইবে না, এইবেলা এ বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য উপায় করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এক কল ভিন্ন ইহার অন্য উপায় আর দেখা যায় না। কল ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে না। আমরা সেবারে কলের কাপড় লিখিতে গিয়া কলের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এবারও তাহাই বলিতেছি। কলের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা অনেক। বাঙ্গালী যত দিন না কল চালাইতে শিখিতেছে, ততদিন তাহার উন্নতি দেখি না। কলে চিনি তৈয়ার করিতে পারিলে যে চিনির কারবারে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী

তাহা সাহেবদের কলগুলায় বেশ পরিচয় দিতেছে। কলিকাতার নিকট কাশীপুরে সাহেবদের চিনির কল চলিতেছে, সাহাবাদে ও কোটচাঁদপুরে আজ কাল সাহেবেরাই কল চালাইয়া চিনির কারবারে বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। এক সাজাহানপুরের কলের চিনিতে সমস্ত কমিসরিয়েট বিভাগ রাখিয়াছে। সাহেবদের যখন একবার লোভ পড়িয়াছে তখন আরও কল বাড়িবে; দিন কতকের মধ্যে কলের কাপড়ের ন্যায় কলের চিনিতে বাঙ্গালা ছাইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম, কল ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে না। ব্যবসা চালাইতে হইলে আজকাল সাহেবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। উভয়ে সমান অস্ত্রে সজ্জিত না হইলে প্রতিযোগিতা সাধন অসম্ভব। ইংরাজ অস্ত্রসম্পন্ন, বাঙ্গালী নিরস্ত্র; ইংরাজের কল আছে বাঙ্গালীর কল নাই—এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। সুতরাং ব্যবসা ও চলিতে পারে না। অতএব এখন হইতে বাঙ্গালায় রীতিমত চিনির কারবার চালাইতে হইলে চিনির কল আবশ্যক।

বাঙ্গালায় চিনির কারবার সম্বন্ধে আমাদের কেন যে এত আশঙ্কা হইয়াছে, আমরা সকল খুলিয়া বলিলাম। আমাদের এ আশঙ্কা থাকে না, যদি কারবারীরা এখন হইতেও বুঝিয়া চলেন, যদি এখন হইতেও তাঁহারা আমাদের প্রস্তাবিত দুটী উপায় অবলম্বন করিতে যত্নপর হন। কল কিছু সকলে চালাইতে পারিবে না, সকলের তাহা চালান সাধ্য নয়। আজ কাল যাঁহারা চিনির কারবার চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক বড় বড় মহাজনও আছেন। আমরা জানি, এই বড়বাজারে শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর কোঁচ নামে একজন বিখ্যাত ধনী মহাজন অনেক দিন হইতে ইহার বিস্তৃত কারবার চালাইতেছেন। অনুসন্ধান করিলে, তাঁহার ন্যায় আরো অনেক মহাজন মিলিবার সম্ভাবনা। ইঁহারা একাকীই এক একটা কল চালাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, যে সকল ছোট খাট আড়তদার আছেন, তাঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া সেয়ার খুলিলে স্বচ্ছন্দে অনেক কল চলিতে পারে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যাঁহারা চিনির কারবার করিতেছেন, সেই কারবারে উন্নতি করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে এবং সেই ইচ্ছার অনুরূপ যাঁহাদের অর্থও যথেষ্ট রহিয়াছে, তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া, একজনে না পারেন দশজনে

মিলিয়া, চিনির কল চালাইতে প্রবৃত্ত হউন। আর, গ্রামে গ্রামে যাঁহারা ছোট খাট চিনির কারখানা খুলিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা কারখানা ছাড়িয়া অতঃপর আখের চাসে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা আখের চাসে প্রবৃত্ত হইলে আখের যথেষ্ট উন্নতি হইবে; তাঁহারা সেই আখ কলে চালান দিবেন, কলে প্রয়োজনমত আখ আসিয়া যুটিলে ব্যবসার বিলক্ষণ সুবিধা ঘটিবে; সুতরাং পরস্পরের সহায়ে পরস্পরের যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা—লাভ নিশ্চিত কথা। কিন্তু, যাহা কর, এই বেলা। ইতস্ততঃ করিবার আর অবসর নাই। লোলায়িতদৃষ্টি সাহেবেরা উঁকি মারিতেছেন, এখনও বিলম্ব করিলে পরে পস্তাইতে হইবে, চিনির কারবার ছাড়িয়া সাহেবদের চিনির কলে খাটিয়া খাইতে হইবে।

—ঃ—

প্রসাদমল্ল।

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্মুখভাগে সুশ্যামল শষ্পাবৃত যে বৃহৎ প্রান্তর পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভ বোধ করি পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইংরাজি ভাষায় আমরা উহাকে মনুমেণ্ট শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। কোন সুপ্রসিদ্ধ লোকের মহতী কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত যে স্মরণ-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় ইংরাজেরা তাহাকে মনুমেণ্ট নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর কিশোরাবস্থায় সার ডেবিড অকটর্লনি নামে একজন মহা ধুরন্ধর বৃটীশবীর বিদ্রোহি পিণ্ডারি-দিগের মহাসমরে স্বজাতির স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ যে প্রভূত বীরত্ব, অমিত সাহস এবং অনন্য-সাধারণ বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবী বংশীয়দিগের নিকট অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে প্রতিভাত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় পুরুষদিগের ব্যয়ে ও আনুকূল্যে প্রোক্ত স্তম্ভ বৃটিশ রাজধানীর মধ্য দেশে স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চার্লশ নোলেজ রবিনসন্ এবং জন পার্কার এই দুই জন প্রসিদ্ধ স্থপতি-

বিদ্যা বিশারদের প্রযত্নে ঐ মনুমেণ্ট বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। অক্টের্লণি বঙ্গ দেশীয় সৈন্য শ্রেণীর অন্যতম প্রধান অধ্যক্ষ (মেজর জেনেরল) পদে বৃণীত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং বিদ্রোহপ্লাবিত স্থাননিচয়ে স্বজাতির শাসন এবং সুখময়ী শান্তি স্থাপন করিয়া মিরট নগরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের পঞ্চদশ দিবসে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত গত বৈশাখ মাসের নিদাঘ নিশিতে একবার আমরা দুর্গ-প্রান্তরে পদচালনা করিতে২ অক্টল´নির স্মরণ-স্তম্ভের নিকট গিয়াছিলাম, তখন গগনে পূর্ণিমার পূর্ণশশী হাসিতেছিল, অদূরে অমর-কানন-বিনিন্দিত ইডেনউদ্যানে এবং গঙ্গা-বক্ষোপরিস্থিত বৃটীশ বানিজ্য-তরণী সমূহে শত সহস্র আলোকমালা কিরণ বিস্তার করিতেছিল এবং প্রান্তর পার্শ্বস্থ বৃটীশ বীরগণের প্রস্তরমূর্ত্তিতে নিপতিত পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল রশ্মিজাল যেন মূর্ত্তি-গুলিকে হাসাইয়া আবার তাহাদের সজীবতা সম্পাদন করিতেছিল। অকটল´নির স্তম্ভের সম্মুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রস্তর খণ্ডের উপরে ইংরাজি ভাষায় যাহা খোদিত ছিল তাহা শীশক-লেখনী সাহায্যে দৈনিককার্য্য-বিবৃতি পুস্তিকায় (ডায়েরি বুকে) উদ্ধৃত করিয়া লইলাম। এই সময়ে সভ্যতম ঊনবিংশ শতাব্দীর কিশোরাবস্থায় ভারত ইতিহাসের কথা আমাদের স্মৃতিপথে একবার উদিত হইল। আমরা বিল্লোর বিদ্রোহ, পিণ্ডারি বিদ্রোহ, নেপাল সমর, ভারতপুর অবরোধ প্রভৃতি অশান্তিপ্রদ মহাব্যাপার সমূহ ভাবিতে লাগিলাম। পূর্ব্ব স্মৃতি আমার হৃদয়কে যতই আলোড়িত করিতে লাগিল, আমি ততই পরিস্ফুট ভাবে সেই সুবৃহৎ প্রান্তরে অক্টল´নির স্তম্ভ পার্শ্বে পূর্ণিমার পূর্ণশশীর দিব্য সুশীতল আলোকে আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে অকটর্ল´ণীর সহযোগী একজন প্রকৃত হিন্দুবীরের জীবন্ত ও জ্বলন্তমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যদি ভারতের নিরপেক্ষ ইতিহাস থাকিত; যদি ভারত-ইতিবৃত্ত-ক্ষেত্রে জিনোফন্ কিম্বা হিরোদোতাসের ন্যায় কোনও প্রাজ্ঞপ্রবর স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইতেন, যদি বৃটীসের শাণিত তরবারী এ দেশীয় সপ্তবিংশতি কোটি লোকের চতুর্পঞ্চাশত হস্তের ধ´ম্বিত তেজ বিধ্বংস না করিত, তাহা হইলে অর্দ্ধ শতাব্দীকাল মধ্যে আমরা একজন প্রকৃত হিন্দুবীরের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া

যাইতাম না। জগদ্বিখ্যাত ওয়াটালু রণক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রুসিয় জেনেরল ব্লুচার ওয়েলিংটনের পক্ষে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, বৃটীশ জাতির পক্ষে এই রাজভক্ত হিন্দু বীর সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়। ভারতের ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, কেহবা নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এই হিন্দুবীরের নাম প্রসাদমল্ল। আমি অদ্য মিরটের শ্মশানক্ষেত্রস্থ ভস্ম রাশি হইতে প্রসাদমল্লকে উত্থিত করিয়া "কল্পনার" পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অনেকে বলেন, প্রসাদমল্ল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। প্রসাদমল্ল (ইনি প্রসাদ মল্ নামে খ্যাত) শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত, তাঁহার পিতার নাম বিরাজমল্ল, জননীর নাম ইতিহাসে রক্ষিত হয় নাই। তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা তাঁহার মিরটনগরে সম্পাদিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের বিবৃতি পাঠ করিলেই পরিষ্কার রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। প্রসাদ দরিদ্রসন্তান, সুতরাং শৈশবাবস্থা হইতেই কঠোরতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছিলেন। নবজাত শ্যামল শষ্পের আঘাতে তাঁহার মূর্চ্ছা হইত না, এবং বর্ত্মমধ্যে কণ্টক দেখিলে পথ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে দূরবর্ত্তী বর্ত্মে গমন করিতেন না। কঠোরতা, বিপদ এবং দরিদ্রতার সহিত তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-ভাবে দ্বন্দ্ব করিয়া ছিলেন। পথে অনাথ শিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, সিন্ধিয়ার তৎকালীন মহারাজা তাঁহাকে লইয়া যান এবং একজন দয়ালু সেনাপতির উপরে তাঁহার লালন পালনের ভার ন্যস্ত করেন। প্রসাদ সেই স্থানে প্রতিপালিত হইয়া সপ্তদশ বৎসর বয়সে মহারাজার নবম গণিত সেনাদলের হাবিলদারের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে 'বীরভীল' নামক অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয় জাতিকে দমন করিয়া তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পর্য্যন্ত তাঁহার বীরত্ব-কস্তুরীর সৌরভ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়া-ছিল; এই সময়ে সিন্ধিয়ার মহারাজা জীবলীলা সম্বরণ করিলেন এবং

প্রসাদের গ্রহদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন। অতঃপর প্রসাদের ভাগ্যপরিবর্ত্ত আরম্ভ হইল।

সার ডেবিড অক্টর্লনি যখন দিল্লী নগরে গমন করেন, প্রসাদমল্ল তখন সেইখানে অবস্থান করিতেছিলেন। শুভক্ষণে পরস্পরে সাক্ষাৎ হইল। অচিরাৎ বৃটীশ জেনেরল তাহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইলেন। সে অনন্য-সাধারণ গুণ দর্শনে বীরহৃদয়ে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল, আনন্দের সহিত তিনি প্রসাদকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাজার মন্ত্রীদিগের সহিত নানা কারণে প্রসাদমল্লের কিছু মনোবিবাদ চলিতেছিল, তিনি মনে মনে সে বিবাদের স্থল পরিত্যাগ করিতে কয়েক দিন হইতে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, সুতরাং সে ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব বড়ই হৃদ্য বলিয়া বোধ হইল। প্রসাদমল্ল অক্টর্লনির অনুরোধে অনুমোদন প্রদান করিলেন এবং দ্বাদশগণিত ও অষ্টাদশগণিত সৈন্যদলদ্বয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

ইংরাজ সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইলে পর উপযুক্ত অবসর পাইয়া তাঁহার সেই বীর্য্য-বহ্নির প্রস্ফুরণ আরম্ভ হইল। যে সমস্ত অলৌকিক গুণরাশি এত দিন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিভৃত ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহা সময় ও ক্ষেত্র পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। এক দিন নয়—কত দিন পাশ্চাত্য বীরত্বাভিমানী যুনানী সৈনিকমণ্ডলী সে অসামান্য বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের নিজের ইতিহাস নাই, ইংরাজদের যে কয়খানা আছে, তাহা সকলি পক্ষপাতদুষ্ট; ভারতের ভবিষ্য বংশাবলীর নিকট সে কীর্ত্তিকলাপ দেখাইবার জন্য কোনও নিদর্শন খুঁজিয়া মিলে না। ইংরাজের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রভুভক্ত প্রসাদ যে সকল দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় ইংরাজ-ইতিহাসে সবিস্তারে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত স্থির জানি যে, তিনি সহায় না হইলে বিল্লোরের বিদ্রোহ, পঞ্জাবের শিখ-উপদ্রব; শতদ্রু নদীতে নৌ-সৈনিকদিগের অমানুষিক দৌরাত্ম্য, গুরখা জাতির অত্যাচার, পিণ্ডারিদিগের মহাসমর, ভরতপুরের দুর্গাবরোধ এবং প্রবল প্রতাপান্বিত আমির খাঁর দমন হইত না। এ কথা আজ আমরা

একা বলিতেছি না, ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন তাঁহারা ইহা মুক্তকণ্ঠে এবং একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রসাদমল্ল যে সময়ে বৃটীশ জাতির মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ ব্যস্ত ছিলেন, তখন মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস ভারতসিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাহা দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মহত্ত্ব দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সে মহত্ত্বের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যাহাই হউক, আপনার কার্য্যের জন্য বৃটীশ জাতির নিকট হইতে প্রসাদ কখনই উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারেন নাই; বরং অনেক সময়ে তাঁহার ভাগ্যে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। সেই কারণেই বোধ হয় শেষ দশায় তাঁহার বড় মনোভঙ্গ হয়। যক্ষ্মাকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া মিরট নগরে আসিয়া শেষ-শয্যা গ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে প্রসাদ জীবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে মার্কুইস অব হেষ্টিংশ বসিয়াছিলেন, সেই মুমূর্ষু কালে—মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মুখ হইতে যে কয়টি কথা বাহির হইয়াছিল, তাহা মহান্ অর্থে পূর্ণ। সে কথা এই—"ভরতপুরের দুর্গ অবরোধকালে যে সকল বৃটীশ বীর প্রভূত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই শঠচূড়ামণি। যাহা হউক, লর্ড লেক মহাত্মার হস্ত হইতে আমি তথায় যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য আমি বৃটীশ জাতির উপরে কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারি না। কিন্তু আমি তাহাতে বিরক্ত হই নাই, ইংরাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম!" আজ অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দ্বিজচূড়ামণি প্রসাদের মুখ হইতে শেষকালে যে ব্রহ্মবাক্য বাহির হইয়াছিল তাহা কখনই কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

প্রসাদের শেষ কথা শুনিয়া মার্কুইস্ অব হেষ্টীংশ কি মনে ভাবিয়াছিলেন জানি না, প্রসাদের মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত দেহ দেখিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে একবিন্দুও অশ্রু দেখা দিয়াছিল কি না কেহ তাহা জানে না; কিন্তু সকলে যদি তাঁহার ন্যায় যথার্থ হৃদয়বান্ হইত তাহা হইলে জানিতে পারিত, সেই দিন বৃটীশ সৈনিক-বিভাগ একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। আমরা এ কথা

বলিলাম, কেন না, প্রসাদ যে অসামান্য গুণসমষ্টিতে ভূষিত ছিলেন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহা পারিয়াছিলেন বলিয়াই অনেক সময়ে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। একদিন তিনি প্রসাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে সম্মাননীয় লিপি লিখিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।—"প্রসাদ মল্ল! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অন্যথায় অধর্ম্ম জানিয়া আজি আমি পুলকিতচিত্তে সমগ্র বৃটীশ জাতির নামে আপনাকে প্রকৃত বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিতেছি। আপনি গত দুই বৎসর কাল ব্যাপিয়া যেরূপ কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি, রাজ-ভক্তি, সাহস এবং বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সভ্য জগতের আদর্শ-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। উপর্য্যুপরি ৫ দিন অনাহারে জীবন ধারণ করিয়া কেবল সাত শত মাত্র সৈন্যের সহায়ে প্রায় দুই সহস্র প্রবল সেনাকে মহাযুদ্ধে পরাজয়ের কথা বোধ হয় আমার জীবনে আমি এই প্রথম কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।" ইংরাজরাজের নিকট যিনি একদিন এ প্রকার প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন, তিনি সামান্য পুরুষ ছিলেন না। ভারতের যদি নিজের ইতিহাস থাকিত, এই অসামান্য পুরুষের কত গুণকথা শুনি-তাম; দুঃখের বিষয়, ভারতের সে ইতিহাস নাই, এ অসামান্য পুরুষের নাম পর্য্যন্ত অনেকের নিকট অপরিশ্রুত রহিয়া গিয়াছে। অকটর্লনি ইঁহা অপেক্ষা কত বড় কি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না, সেই অকটর্লনির স্মরণের জন্য রাজধানীবক্ষে অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট-স্তম্ভ আজও উন্নতমস্তকে শোভা পাইতেছে; কিন্তু হায়! সেই অসামান্য পুরুষ প্রসাদমল্লের অসামান্য কীর্ত্তিরাজি স্মরণীয় করিবার জন্য একটি পর্ণকুটীরও নির্ম্মিত হয় নাই!

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

—— ঃ ——

জ্বলে কেন ?

বিজ্ঞান-কথা।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বলিতে পার, জিনিষ জ্বলে কেন? কেহ বলিবে, এ প্রশ্ন আর বিশেষ গুরুতর কি? ইহার উত্তর তো অতি সহজ—জিনিষে যখন আগুণ লাগে তখনই তাহা জ্বলিয়া উঠে। বেশ কথা, কিন্তু আগুণ-লাগা ব্যতীত তাহা জ্বলিবার আর কি কোন কারণ নাই? আর কি কিছুতে জিনিষ জ্বলে না? অন্ধকার ঘরে তোমার শিয়রের বালিশের নীচে হইতে দেশলাই একটি লইয়া যখন তাহার বাক্সের গায়ে ঘষিতে থাক, তখন সে জিনিষটা জ্বলে কেন? বারুদপোরা বন্দুকে ক্যাপ চড়াইয়া দিয়া যখন ঘোড়াটি টিপিয়া ফেলিয়া দাও, তখন সে ক্যাপ ফাটিয়া স্ফুলিঙ্গ ছুটে কেন? আবার আরও আশ্চর্য্যের কথা, যে জল অল্প পরিমাণেও কোন জিনিষের গায়ে লাগিলে তাহাকে সহস্র কষ্টেও জ্বালান যায় না, সেই জলের ফোয়ারার কাছে খানিকটা পোটাসিয়ম ধরিলে তখনই জল লাগিয়া তাহা জ্বলিয়া উঠে কিসের জন্য? জিনিষ যে মাত্র আগুন লাগিলেই জ্বলে, নহিলে জ্বলে না, তাহা নহে। কিন্তু তাহা জ্বলে কেন—এ কথার উত্তর কি?

উত্তর আছে। কিন্তু সে উত্তর কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়? বিজ্ঞানবিদেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন? জানিবার এক উপায় আছে, তাহা পরীক্ষা। দৃষ্টান্ত দেখিয়া পরীক্ষা করিয়াই এ সকল বিষয়ের উত্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা মনে রাখা আবশ্যক, রসায়নশাস্ত্রে এক সময়ে এক বস্তু হইতে যে ঘটনা ঘটে, অন্য সময়ে সেই অবস্থায় পড়িলে সেই বস্তু হইতে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটিবে। দেশলাই ঠিক্ সেই রকমে যখন তাহার বাক্সের গায়ে ঘষিবে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিবে, ক্যাপের উপর অবিকল সেই ভাবে যখন তুমি ঘোড়াটি টিপিয়া ফেলিবে তৎক্ষণাৎ স্ফুলিঙ্গ ছুটিবে; আবার পোটা-সিয়ম ঐ রকমে যে মূহুর্ত্তে তুমি জলের ফোয়ারার কাছে ধরিবে সেই মূহুর্ত্তেই

অমনি করিয়া তাহা জ্বলিতে থাকিবে। রসায়ন শাস্ত্রের এই, মূলসূত্রটি মনে রাখিয়া সকল সময়ে দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাহাই বিজ্ঞান-সম্মত। আমরা সকলেই সকল অবস্থায় এক একজন ছোট খাট বৈজ্ঞানিক। তুমি একটি বাঁশি কিনিবে, বাঁশি বাজে কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া কি তাহা কিনিয়া থাক? আমার গাড়ী টানিবার জন্য একটি ঘোড়ার দরকার, ঘোড়া গাড়ী টানিতে পারিবে কি না পরীক্ষা করিয়া তাহা না দেখিয়া শুনিয়া কি আমি বিক্রেতার হাতে তাহার মূল্য গুঁজিয়া দিব? আমরা রোজ যে সকল ছোটখাট কাজ করি, আমরা সেই সকল কাজেই এক একজন ছোট খাট পরীক্ষানুসারী দৃষ্টান্তবাদী বৈজ্ঞানিক।

তবে, এস, একবার বৈজ্ঞানিকের ন্যায় পরীক্ষা করিয়া বুঝা যাউক, জিনিষ জ্বলে কেন। একজন বন্ধু বলিলেন, তোমরা যে পোটাসিয়মের কথা বলিতেছিলে, তাহাতে একটি বিষয় বুঝিবার তোমাদের ভুল হইয়াছে। পোটাসিয়মে জল লাগায় জ্বলিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহা যখন জ্বলিল তখন তাহা বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া ছিল। বায়ুর সঙ্গে না মিশিলে পোটাসিয়ম কখনই জ্বলিত না। তাহার সাক্ষ্য, একটা গেলাসে জল পূরিয়া খানিকটা পোটাসিয়ম সেই জলের ভিতর ডুবাইয়া ধর,—পোটাসিয়ম কখনই আর জ্বলিবে না। জ্বলিবে না, কেন না, পোটাসিয়ম জলের ভিতর ডুবিয়া থাকায় আর বায়ুর সঙ্গ পাইল না বলিয়া। বায়ুর সঙ্গ না পাইলে জিনিষ জ্বলে না তাহার আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখ। ঐ যে সেজে বাতিটি জ্বলিতেছে, উহার উপর একখানা বহি কিম্বা একটা কিছু কঠিন আবরণ দিয়া বেশ করিয়া চাপা দাও দেখি। কি হইল? ধীরে ধীরে ধীরে শিখার তেজ কমিয়া আসিয়া বাতি নিভিয়া গেল। বাতি নিভিল কেন? আবরণদ্বারা সেজের মুখ বন্ধ থাকাতে বাতির শিখার গায়ে বায়ু লাগিতে পারিল না, সেই জন্য। জিনিষ বায়ুর অভাবে জ্বলে না। তবে জ্বলে কেন—দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা দ্বারা এপ্রশ্নের একটি সদুত্তর পাওয়া গেল, যাহা জ্বলে তাহাতে বায়ু সংলগ্ন থাকে বলিয়া।

উত্তম। কিন্তু একটা কথা মনে থাকে যেন, যখন দৃষ্টান্ত দ্বারা কোনও বিষয় পরীক্ষা করিবে, তখন বিশেষ সাবধানের সহিত তাহা করা উচিত।

তুমি দুটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমায় বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, জিনিষ বায়ুর আঁচ না পাইলে কোনমতেই জ্বলিতে পারে না। বুঝিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বায়ুর সম্পর্কশূন্য হইলেও কি কোন জিনিষ জ্বলে না? রামায়ণ মহাভারতে পাতালভেদী বাণের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই; বাণ জ্বলিতে জ্বলিতে কেমন করিয়া বায়ুরহিত পাতালপুরী ভেদ করিত? রামায়ণ মহাভারতে এ কথার উত্তর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সব ব্যাপার এখন প্রত্যক্ষ ও ঘটেনা, সুতরাং সে বিষয় লইয়া একটা কোন নূতন কারণ নির্দ্দেশ করিলে, তোমাদের বিশ্বাস না হইবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, আজকাল উৎসব উপলক্ষে লোকে যে সকল বাজি পোড়াইয়া থাকে, তাহার মধ্যে 'কুমীরে' বাজি কি দেখিয়াছ? জলের ভিতর ছাড়িয়া দিলে, জলের ভিতরে থাকিয়াও কেমন আশ্চর্য্য রূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া জলের মধ্যে কুমীরের ন্যায় ঘুরিতে থাকে তাহা কি দেখ নাই? ভাল তাই না হয় হউক, জলযুদ্ধের সময় কেমন করিয়া বিপক্ষদিগের জাহাজ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলে ইতিহাসে তাহা তো অনেক পড়িয়াছ। 'টরপিডো' নামে আজকাল আবার এজন্য এক ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল আগ্নেয় গোলা জলের অত নীচে থাকিয়া—বায়ুর কোন ধার না ধারিয়াও—জ্বলিয়া উঠে কি প্রকারে? তবে? তবে এখন আর গোটাকতক দৃষ্টান্তে দেখা গেল, কোন কোন জিনিষ বায়ু না পাইলেও জ্বলিয়া উঠে।

সুধু কি তাই? এই সকল পরীক্ষায় আমরা আরও একটি নূতন বিষয় শিখিলাম। বায়ুতে এমন কি পদার্থ আছে যাহাতে জিনিষ জ্বলিয়া উঠে? বন্ধু যে বাতির কথা বলিয়াছিলেন, স্বীকার করি, সেজের উপর আবরণ বদ্ধ থাকাতে বাতিটি নিভিয়া গেল; কিন্তু নিভিয়া গেল কি কেবল বায়ুর অভাবের জন্য? তা ত নয়। যদি বেশ সূক্ষ্মরূপে দেখ, দেখিতে পাইবে, আবরণ বদ্ধ হইলেও সেজের ভিতর বায়ু ছিল। তবে নিভিল কেন? নিভিল এই জন্য যে আর নূতন নির্ম্মল বায়ু পাইল না বলিয়া। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। একটা বেশ বড় প্রশস্ত বাটীর ভিতর জল পূরিয়া তাহার মধ্যে ঐ জ্বলন্ত বাতিটি বসাইয়া দাও, তার পর একটি গেলাস তার উপর ঢাকিয়া দাও দেখি। দেখিতে দেখিতে ঐ সেই বাতিটি নিভিয়া গেল;

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের ভিতর খানিকটা দূর পর্য্যন্ত জল ঠেলিয়া উঠিল কেন? জল ঠেলিয়া উঠিল, সেখানটা খালি হইল বলিয়া, সেখানকার খানিকটা বায়ু পুড়িয়া গেল বলিয়া। বায়ু যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। ইহার অপেক্ষা আরও একটা পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখ। একটা জলপূর্ণ টবে এক খানা টিনের রেকাব ভাসাইয়া তার উপর খানিকটা ফস্ফরস্ জ্বালাইয়া দিয়া তার উপর একটা হাল্‌কা গেলাস চাপা দাও। খানিকক্ষণ জ্বলিয়াই ফস্ফরস্ নিভিয়া যাইবে, এবং দেখিবে তার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ⅕ ভাগ পরিমাণে ফুলিয়া উঠিবে, অর্থাৎ তাহার বাহিরের বায়ু ⅕ পুড়িয়া যাইবে, সুতরাং ⅘ ভাগ পড়িয়া থাকিবে। সে অবশিষ্ট ⅘ ভাগ শিখার তেজ রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। সমর্থ নয় বলিয়াই বাতি নিভিয়া গেল। কিন্তু বাতি জ্বলিবার সময় যে সেখানে বায়ু ছিল, একথা সম্পূর্ণ সত্য।

উপরে উহা যেমন আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিলাম, তেমনি ইহাও সম্পূর্ণ সত্য, বায়ুর অধিকাংশ বাদ দিয়া অতি অল্প অংশ মাত্রই জ্বলন্ত পদার্থের জ্বলনশক্তি রক্ষা করিতে সক্ষম। সেই অল্প অংশটুকু পুড়িয়া গেলেই, যদি গেলাস বা তদ্রূপ কোন কিছু একটা আবরণের ব্যাঘাতে আর তৎস্থানে নতন বায়ু না পায়, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণগত হইয়া যায়। কিন্তু, কথা হইতেছে যে টুকু বায়ু পুড়িয়া গেল তাহা কি হইল? মনে কর, ঐ যে ফস্ফরস্ জ্বলিতে জ্বলিতে গেলাসের যে বায়ু টুকু পুড়াইয়া ফেলিল সে বায়ুর চরমগতি কি দাঁড়াইল? ইহা নিশ্চয়, বায়ু কোনও মতে উড়িয়া যাইতে পারে নাই, গেলাস তাহাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তবে তাহার কি হইল? কি হইল, শুনিবে? সে বায়ু পুড়িয়া আর কোথাও যায় নাই, ঐ ফস্ফরসের সঙ্গে মিশিয়াই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। ফস্ফরস্ জ্বলিবার পূর্ব্বে কেমন বর্ণ ছিল, কিন্তু এখন দগ্ধবায়ু উহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াতে বিবর্ণ হইয়া একটা ডেলা পাকাইয়া গিয়াছে।

এখন বুঝা গেল, বায়ুর অন্ততঃ এক ভাগও জমিয়া কঠিন পদার্থ হইতে পারে, অথবা সেই বায়ু অদৃশ্যভাবে কোন কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকিতে পারে। এইবার দেখা যাউক জলের ভিতরে থাকিলেও যে সকল জিনিষ জ্বলে তাহার মধ্যে কোন প্রকার কঠিন আকার ধারণ করিয়া বায়ু

নিভৃতভাবে অবস্থান করিতেছে কি না। ইতিপূর্ব্বে 'কুমীরে' বাজি বা জলযুদ্ধের জন্য যে সকল আগ্নেয় অস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের ভিতরে যে বারুদ পোরা থাকে, সেই বারুদের গুণাগুণটা পরীক্ষা করিলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। বারুদে যথেষ্ট পরিমাণে সোরা আছে। এই সোরাতেই কঠিনভাবে বায়ু মিশ্রিত আছে বলিয়া জলের মধ্যেও তাহার জ্বলনশক্তি নষ্ট হয় না, তাই জলের ভিতরে থাকিয়াও জ্বলিয়া উঠে। সোরায় যে বায়ু আছে, একথা কেন বলিলাম, তাহারও প্রমাণ দিতেছি। একখানি কাগজ একটা আলোর উপরে ধর, এখনি জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাগজ-খানি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। কিন্তু একখানি কাগজে সোরা মাখাইয়া তেমনি করিয়া ঐ আলোর উপর ধর দেখি। যদি জ্বালাইতে ইচ্ছা কর, ইহা অন্যান্য কাগজের ন্যায় জ্বলিবে; কিন্তু খানিক জ্বালাইয়া নিভাইয়া দাও তখনও দেখিতে পাইবে, পূর্ব্বের ন্যায় তেমন দাউ দাউ করিয়া না জ্বলুক ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে, ধীরে ধীরে তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তাহাই বলিতেছিলাম, সোরার কঠিন ভাবে বায়ু মিশ্রিত আছে। সোরার ন্যায় ক্লোরেট অব্ পটাস নামক ক্ষার-পদার্থেও বায়ু ঐ ভাবে সংমিশ্রিত আছে। সুতরাং বায়ুর যে ভাগ জ্বলন শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ তাহা যে সোরা এবং ক্লোরেট অব পটাসে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা স্থির কথা।

এখন, আর একটা পরীক্ষা দেখ। একখানা জলপূর্ণ গামলার তলায় দুটী ইটের ঢেলা পাতিয়া একটা জলপূর্ণ বোতল সেই দুটি ঢেলার উপর মুখটি বসাইয়া, উপুড় করিয়া রাখিয়া দাও। আসল কথা, গামলার তলা ও বোতলের মুখের মাঝখানে যেন একটু খালি জায়গা থাকে। সেই জায়গার ভিতর, বোতলের ঠিক্ মুখের কাছে, রিটর্ট (অগ্নির উত্তাপে রসায়ন দ্রব্যবিশেষের রূপান্তরীকরণ যন্ত্র) নামক একটী কাচনির্ম্মিত নলের ভিতর এক চামচ আন্দাজ ক্লোরেট অব পটাস পূরিয়া, তাহার এক সরুমুখটি লাগাইয়া দাও। তার পর সেই নলের বক্রাকৃতি অপর মুখটীতে ধীরে ধীরে একটা পাত্রে করিয়া খানিকটা জ্বলন্ত আগুনের আঁচ লাগাও। দেখিতে দেখিতে সেই নলের ভিতর হইতে খানিকটা বায়ু বা গ্যাস বাহির

হইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ সেই বোতলের ভিতরে প্রবেশ করিবে। ধীরে ধীরে একখানি সমান পাত্র ঐ বোতলের মুখে আবরণ দিয়া সাবধানে বোতলটি উল্‌টাইয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখ। এখন দেখ কেমন কৌশলে ক্লোরেট অব্ পটাস্ হইতে আমরা গ্যাস বাহির করিয়া বোতলে পুরিলাম। কিন্তু এই গ্যাস কি রকম? ইহার গুণ কি? চুলা হইতে একখানি আদপোড়া কাঠ লইয়া, তার উজ্জ্বল শিখাটা নিভাইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে ঐ বোতলস্থ গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। এখন, দেখ, কেমন সেই গ্যাস লাগিয়া শিখার তেজ বাড়িয়া উঠিল, কেমন সেই কাঠ-খানা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এখন বুঝিলে, এগ্যাসের গুণ কি? এ গ্যাস টা কি? এ গ্যাস তাহাই, যাহার জন্য আমরা এই দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিতেছি। এ গ্যাস বায়ুর সেই অল্প অংশ যাহাতে জিনিষের জ্বলনশক্তি সংরক্ষিত হয়। জ্বলে কেন? —এই গ্যাসই তাহার উত্তর, এই গ্যাসই তাহার কারণ। এ গ্যাসের কি তবে কিছু স্বতন্ত্র নাম নাই? আছে বৈ কি; ইহার নাম—অক্সিজেন। কিন্তু সে সব কথা আজ আর নয়, আর একদিন বলিব।

—:—

সদ্বিচার।

১। কথিত আছে একদা ভগবান প্রহ্লাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মনোমত বর লইতে বলেন। নারায়ণের ইহাও ইচ্ছা ছিল যে দেখেন্, প্রহ্লাদ কি জিনিষ বর মাগিয়া লয়। কিন্তু সরল চিত্ত প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন "ঠাকুর! আমি তো আমার কি ভাল, কি মন্দ, কিছুই জানি না, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই দিবে, আমি আর কি চাহিব?" এই বলিয়া তিনি তাঁহাতেই (ঈশ্বরেতেই) সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। স্বয়ং কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের একমাত্র

মূলীভূত কারণ সেই মহান্ জ্ঞানময়পুরুষ, তাঁহাকে কি বর প্রদান করিলেন? "তুমি ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ কর" কিম্বা "সসাগরা পৃথিবীর রাজা হও"—এই বর কি দিলেন? না—তাহা নহে। তিনি প্রহ্লাদকে বলিলেন, "আমি এই বর দিতেছি যে তুমি সদ্বিচারক হও!" হরি! হরি! এই বর! শেষে প্রহ্লাদের কপালে কি এই ছিল? ইহা আবার একটা বেশী কি? উহা তো আমার মনে লাগিল না! আমি ধন চাই—মান চাই—পৃথিবীর বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর চাই—উচ্চপদ চাই—আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া আমি উহাদিগকে আমারদিগে সতত আকৃষ্ট করিতে চাই, আমার উহা ভাল লাগিবে কেন? হায়! শুদ্ধ বিচার লইয়া কি ধুইয়া খাইব? ইহাতে তো স্ত্রীপুত্র প্রতিপালিত হইবে না; পেটের ক্ষুধা কি ইহাতে নিবারিত হয়?

২। ভাই! এই 'সদ্বিচারই' মনুষ্যজীবনের প্রাণ—মনুষ্যজীবনের জীবন—মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। এই সদ্বিচারের অন্যতম নাম 'জ্ঞান' 'প্রজ্ঞা' 'বিদ্যা' 'সত্য' 'দিব্যজ্ঞান' ইত্যাদি। এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য 'মনুষ্যত্ব' প্রাপ্ত হয়, ও সমস্ত কামনা-শূন্য হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে। তাহার আর কখন কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয় না; কিন্তু সার সত্যটী জানিতে পারে। সত্য প্রতিভাত হইলে হৃদয়ে নানা প্রকারের—কি সাংসারিক—কি পারিবারিক—কি বিজ্ঞান ও দর্শন—কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ ও অজ্ঞানতা দূর হয়; যদি সন্দেহ দূর হইল তবে আর অসুখ কি? যখন এতগুলি বিষয়ের সন্দেহ নিমেষের মধ্যে (দিব্যজ্ঞান প্রভাবে) দূর হইয়া যায়, তখন তাহার হৃদয় তো 'স্বর্গধাম' হইয়া উঠে। তাহার আর উদ্বেগ কোথায়? স্থূলবুদ্ধি বশতঃ আমরা সূক্ষ্ম২ বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া কি আর অস্থির হইয়া বেড়াই? কই ভাই! আমরা তো সুখে খাইতেছি, পরিতেছি, বেড়াইতেছি—কোনও অভাব নাই, তবে কেন সময় সময় মনে সুখ পাই না? ইহার উত্তর কি এই নহে যে আমরা সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে অনেক বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া কত সময় আত্মাতে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করি? কেন করি, নিজেকে কি অন্যকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাই না।

এই নিমিত্ত কত সময় বিষাদিত থাকি। যদি তাহার একটীরও সদুত্তর পাই, তবে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না, বোধ হয় যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইলাম। তখন কোথায় বা থাকে ক্ষুধা কোথায় বা থাকে অন্য চিন্তা? অতুল পরাক্রমশালী সম্রাটকেও তখন তুচ্ছ জ্ঞান করি যদি একটী সত্য (চিন্তা করিয়া) আবিষ্কার করিতে পারি। এই সদ্বিচার— এই জ্ঞান—এই সত্য অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিরা জনপদের সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরি গুহা আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সদ্বিচার লভ্যের ফল 'উপনিষৎ' ইত্যাদি মহান সার সত্যসম্বলিত গ্রন্থ, তাঁহার প্রসাদাৎ আজও আমাদিগের চক্ষের উপর কত শত ব্যক্তি অতীব বিক্রমসহকারে বিজ্ঞান ও দর্শন প্রদেশে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং আধ্যাত্মীক জগতে বিচরণ করিতেছেন।

৩। এই যে ঈশ্বর প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন "তুমি সদ্বিচারক হও!" এই কথাটীতেই সমস্ত মনুষ্য-জীবন। এই সদ্বিচারক পৃথিবীতে আসিয়া যিনি যে পরিমাণে লইতে পারিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে সংসার ধর্ম্ম আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রতিপালন সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক করিতেছেন। এই ভয়াবহ ঈর্ষাপূর্ণ পরশ্রীকাতরতাপূর্ণ পদেহ দুঃখ বিপদ ও শোক বিষাদ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে পড়িয়া শারিরীক মানসিক যন্ত্রণা ও নানাবিধ লোকের অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করত, শুদ্ধ একমাত্র সদ্বিচারের গুণে ধৈর্য্য ও তিতীক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য সমভাবে সর্ব্বাবস্থায়, সুখ ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, লোকের আত্মীয়তালাভে কি তাহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতা উন্মত্তবৎ অস্থিরতার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও উৎকৃষ্ট শান্তিলাভ করিয়াছেন। নবীন হাস্যপ্রিয় যুবক! তোমাকে বলিতেছি। ভাই! এ বড় কঠিন সংসার। যত বয়স বাড়িতে চলিবে, ততই জানিতে পারিবে, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে আসিয়া তোমার নিকট কত আপন পর হইবে, কত পর আপন হইবে। নিস্বার্থভাব অতি অল্পই মিলিবে। মনোমত লোকের উপর, বন্ধুভাবে, প্রীতি ও স্নেহের সহিত সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া, তাহাকে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িবে; যেরূপ প্রবল ঝটীকায় সমুদ্রে পতিত অর্ণবতরী কিছুতেই স্থির

থাকিতে পারে না সেইরূপ এক একটী লোকের অকারণ কঠোরাঘাতে তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ইহা সত্য কথা ইহা অবশ্যম্ভাবী অকারণে ঘটিবে। তুমি লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে—অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব দেখাইবে—তবু তাহাদের মধ্যে কতজন ঈর্ষাপরবশ হইয়া তোমাকে বিদ্রূপ করিবে—অসাক্ষাতে তোমার গ্লানি করিবে ও তোমার গ্লানিতে সুখানুভব করিবে। বোধ হয়, অকারণেও যখন সংঘটীত হয় তখন ঈশ্বর সৎপ্রকৃতির লোককে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এইরূপ বিষাদময় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। যাহা তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা অবশ্যই শুভ। কিন্তু এই সদ্বিচারের বলেই সব জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মনুষ্য একমাত্র আরামের স্থল ঈশ্বরেতেই শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে।

৪। এখন দেখা যাউক, এই যে "যথার্থ বিচার কিম্বা জ্ঞান" অর্থাৎ সৎকে অসৎ ও সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করিবার যে শক্তি তাহা কি রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে? ঈশ্বর বলিবামাত্রই কি প্রহ্লাদ একেবারে দিব্যজ্ঞানশালী হইলেন? তাহা নহে। ইহা পাইতে হইলে মনুষ্যকে চিন্তাশীল হইতে হইবে। বালককাল হইতেই (বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে) অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইবে, বহুবিধ সমাজে মিলিতে হইবে, বহু প্রকার সজ্জন ও বিদ্বান সমাগম করিতে হইবে—তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতে হইবে। কিন্তু ভাই! বলিতেছি, বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে অনেক বিষয়ের মনোমত উত্তর পাইবে না। বহুবিধ সমাজেও মতের বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য দেখিতে ও উপদেশ শুনিতে পাইবে। বিজ্ঞ লোকদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়াও কত স্থলে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয় না! পুস্তকে—সমাজে—ও মনুষ্যের মধ্যে "জেদ্ বজায় রাখ্‌বার" কথা অনেক দেখা ও শুনা যায়!—একদেশদর্শী হইয়া সত্য হইতে বিচ্যুত হয়—আবার অনেক সময় বিদ্যাভিমানের স্রোতে ভাসিয়া ও প্রগল্‌ভতার তরঙ্গে গ্রীবা উন্নত করিয়া চলিয়া যায়—ন্যায় সঙ্গত কথা শুনিয়াও শোনে না। এইরূপ অবস্থায়, নানাবিধ শাস্ত্র, নানাবিধ সমাজ ও নানাবিধ লোকের মত সংগ্রহপূর্ব্বক, নিরপেক্ষভাবে, স্থিরচিত্তে স্বয়ং নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, আলোচ্য বিষয়, অনুধ্যান করতঃ বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে; তোমার

মনের সঙ্গে যতক্ষণ সেইটী না মিলিবে ততক্ষণ ছাড়িবে কেন? ঈশ্বর আত্মাকে এমনি সৃষ্টি করিয়াছেন যে চিন্তা করিতে করিতে সত্য আপনিই অধিকাংশ সময় আবিষ্কার হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন মতের কি ব্যক্তি বিশেষের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলে হৃদয়ে জড়তা জন্মায়, আর চিন্তা করিতে ক্লেশানুভব করিয়া পরের কথার উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিলে অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। কাজে কাজেই কুসংস্কার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘেরিতে থাকে। সত্যচ্যুত হইয়া মানুষ পশু হইয়া পড়ে! সেই জন্যই আমরা "প্রহ্লাদ চরিত্রে" এই মহান্ উপদেশ পাইয়াছি যে, ভগবান প্রহ্লাদকে আর কিছু বর দেন নাই—হাতী ঘোড়া দিতে চাহেন নাই—রাজ্য বিস্তার করিয়া দেন নাই—শুদ্ধ 'সদ্বিচারক' হইতে বলিয়াছিলেন। 'ভগবান আসিয়া প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন'—এইটী রূপকমাত্র। কিন্তু রূপক হইলেও ইহার সারমর্ম্ম গাঢ় সত্যে পূর্ণ। প্রহ্লাদ যথার্থই এই চিন্তাশীলতার গতিকে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া সত্যস্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ—অনন্তস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া জীবনের সার্থক্য করিয়াছিলেন।

৫। মনুষ্য যে কেবল ধর্ম্ম বিষয়েই সদ্বিচারক হয় এমন ভাবিও না। সর্ব্ববিষয়েই হইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৎ অর্থাৎ যথার্থ বিচার চিন্তাশীলতার ফল। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়াই প্রস্তাবটী শেষ করিব। যেমন চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশা, সক্রেটীস্, গুরুনানক, বুদ্ধ, থিয়োডর পার্কার, চ্যানীং ইত্যাদি মহাত্মারা ধর্ম্মজগতে, চিন্তাশীলতার গতিতে অনেক সত্য প্রকাশ করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়াছেন, তেমনি নিউটন, লাপ্লাস, আর্য্যভট্ট, খনা, লীলাবতী ইত্যাদি২ জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়ে,—তেমনি গ্যালিলীও, তেমনি কলম্বস। সমস্ত লোক বলিল "সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে,"—গ্যালিলীও সদ্বিচারের দ্বারা সত্য বাহির করিয়াছেন 'পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু সূর্য্য নহে; সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেকাংশে বৃহৎ, ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুকে কি রূপে পরিচালিত করিবে?' লোকের কথা, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কথা মানিবেন কেন? তাহা শুনিলেন না। সত্যের আস্বাদ পাইয়া প্রাণকে

প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিলেন,—আত্মজীবন সত্যের জন্য অকাতরে দান করিলেন।

৬। জগতশুদ্ধ লোক বলিয়াছিল যে 'আসিয়া আফ্রিকা, ও ইউরোপ ব্যতিত আর পৃথিবীতে স্থলভাগ নাই।' কলম্বস্ চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া সত্য আবিষ্কার এই করিলেন যে "আসিয়া. আফ্রিকা, ও ইউরোপ একদিগে পড়িয়াছে, এবং সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় অত্যল্প স্থল মাত্র, অপরদিগ কথনই শুদ্ধ জলে পরিপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে জল ভাগ এত বেশী হইয়া পড়িত যে এই তিন মহাদেশকে অনায়াসে গ্রাস ও প্লাবিত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু জল ও স্থলের সামঞ্জস্য হওয়া চাই। অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে জলরাশি যে পরিমাণ স্থল রাশিকে বেষ্টন করিয়া আছে পশ্চিমভাগেও ঠিক সেই মত থাকা চাই। যখন থাকা চাই—তখন ঈশ্বর অবশ্যই করিয়া রাখিয়াছেন। এই বলিয়া কাহারো প্রতিবাদের উপর নির্ভর না করিয়া, সমুদ্রে ভাসিলেন। লোকে বাতুল বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। যে যুক্তি সদ্বিচার বলে পাইয়াছেন তাহা ফলিবেই ফলিবে, তাঁহার তো অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তিস্থাপন হয় নাই—আপনার সদ্বিচারের উপর; যেমন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন, অমনি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া আসিলেন। সমস্ত লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সদ্বিচারের মাহাত্ম্য এমনি!

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ।

আর্য্যচিকিৎসা।

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

প্রথমতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইলে চিকিৎসক সুখোপবিষ্ট হইয়া বাম হস্তে রোগীর কনুই ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলিত্রয়, তাহার অঙ্গুষ্ঠ মূলের অধোভাগ, মনি বন্ধন স্থানে যোজিত করিয়া

নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। বায়ুর নাড়ী চিকিৎসকের প্রথম অঙ্গুলি যাপিত স্থানে, পিত্তের নাড়ী মধ্যমাঙ্গুলির নিম্নে এবং শ্লেষ্মার নাড়ী শেষাঙ্গুলির নিম্নে বুঝিতে হইবে।

বায়ুকুপিত নাড়ীর গতি জলৌকা ও সর্পের ন্যায় কুটিলা ও ত্বরান্বিতা হইয়া থাকে। পিত্ত কুপিত নাড়ী কাক ও ভেকের ন্যায় লম্ফমান হয়, শ্লেষ্মা কুপিত নাড়ীর গতি রাজহংস ও পারাবতের ন্যায় ঈষৎ হেলায়মান ও মন্দ হইয়া থাকে।

স্থূলতঃ নাড়ী বায়ুতে বক্রগতি, পিত্তে অত্যন্ত চঞ্চলা এবং কফে স্থিরা ও মন্দগামিনী হয়। মিলিত দোষ কুপিত নাড়ীর গতি মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ত্রিদোষ কুপিত নাড়ীকে সান্নিপাতিক নাড়ী কহে। ইহার গতির স্থিরতা নাই। ইহা কখন অত্যন্ত স্থির ভাবে, কখন বা অত্যন্ত দ্রুত ভাবে গমন করে। এই রূপ গতির অবস্থান্তর না হইলে সপ্তাহ মধ্যে সান্নিপাত গ্রস্ত রোগীর জীবন নাশ হয়।

বিকার প্রাপ্ত নাড়ী কখন বেগবতী, কখন মন্দগতি কখন ব্যাকুলগতি, কখন সূক্ষ্মগতি, এবং কখন বা রুদ্ধগতি হয়। এই রূপ নাড়ী মনিবন্ধন স্থান হইতে স্খলিত হইয়া পুনর্ব্বার যদি তর্জ্জনিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহা মৃত্যু লক্ষণ জানিবে।

সুস্থাবস্থায় নাড়ী পরিষ্কার, জড়তাবিহীন ও সর্পের ন্যায় বক্রগতি বিশিষ্ট থাকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম, উৎকট চিন্তা, মনস্তাপ, অধিক ভ্রমণ ও ব্যায়াম ইত্যাদি নানা কারণে সুস্থাবস্থাতেও নাড়ী বিবিধ গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়ংকালে দ্রুতগতি যুক্ত, ও রাত্রিতে বেগবিহীন থাকে। এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে অত্যন্ত স্থূলা ও মন্দগামিনী হয়। লঙ্কা মরিচাদি দ্রব্য ভোজনে সরলা ও বেগবতী এবং মিষ্টরস দ্রব্য ভোজনে শীতল ও চাঞ্চল্য রহিত হইয়া থাকে।

জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী তাপযুক্ত ও বেগবতী হয়। জ্বরকালে মৈথুন করিলে নাড়ী দুর্ব্বল ও মন্দগতি যুক্ত হয়।

মৈথুনান্তে নাড়ী ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উষ্ণ ও চঞ্চল থাকে। কামবেগ

প্রবল হইলে ও ক্রোধোদয়ে উহা অত্যন্ত বেগবান ও ইতস্ততঃ গতিবিশিষ্ট হয়।

নাড়ীর গতি বিপরীত দিকে হইলে, ঐ রূপ হইবার সময় হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর জীবন নাশ হয়। রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যক হইলে এই রূপ নাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যাহার নাড়ী মূল স্থান হইতে কিয়দ্দূর বেগের সহিত গমন করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে এবং তথা হইতে যেন পুনর্ব্বার গমন করিতেছে, এরূপ বোধ হয়, তাহার মৃত্যু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত।

যাহার নাড়ী কখন বেগবতী, এবং কখন মৃদুগতিবিশিষ্ট, অথচ অঙ্গে শোথের কোন রূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তাহার সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু স্থির।

যাহার নাড়ী অত্যন্ত শীতল, কিন্তু শরীর অতিশয় দাহযুক্ত, এবং যাহার নাড়ী বহুবিধ গতি ও বিকৃতি সম্পন্ন তাহার মৃত্যু অতি নিকট।

যাহার নাড়ী মূল স্থান হইতে অল্প মাত্রও স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহার মৃত্যু তিনদিনের মধ্যে এবং যাহার নাড়ী মূল স্থানের অগ্রভাগে একইবার বিদ্যুতের জ্যোতির ন্যায় অনুভূত হয়, তাহার মৃত্যু দুই দিবসের মধ্যে উপস্থিত হয়।

যাহার হস্ত পদাঙ্গুলির অগ্রাংশের প্রথম দুই পর্ব্ব অত্যন্ত শীতল, শেষ পর্ব্ব ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে, তাহার মৃত্যু ১২ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় হইয়া থাকে।

যাহার নাড়ী প্রথম অঙ্গুলিস্থাপিত স্থানে অনুভূত হয় না, অর্থাৎ যাহার কেবল পিত্ত ও শ্লেষ্মার নাড়ী অনুভূত হয়, তাহার আসন্ন কাল অতি নিকট। যাহার কেবল শ্লেষ্মার নাড়ীর শেষার্দ্ধভাগ অনুভূত হয়, তাহার ও মৃত্যু অতি নিকট। এমন কি তিন ঘণ্টার মধ্যেই উহা উপস্থিত হইতে পারে।

যাহার নাড়ী মূল স্থানে সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় না, এবং অঙ্গুলিতে সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থাকে, তাহার দেড় দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়।

যাহার নাড়ী মূল স্থান হইতে বিচ্যুত হয়, এবং হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা বিদ্যমান থাকে, তাহার ঐ জ্বালার স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত জীবন কাল। অর্থাৎ জ্বালা যেমন নিবৃত্তি হয়, মৃত্যুও তেমনি উপস্থিত হয়।

উচ্চ স্থান হইতে পতন, ভার বহন, মূর্চ্ছা, ভয়, শোক, অত্যন্ত মলভেদ ও শুক্রস্রাব ইত্যাদি কারণে নাড়ী ক্ষীণা ও নিশ্চলা হইয়া থাকে। সুচিকিৎসা হইলে তদ্বারা কোন প্রকার অশুভ সংঘটন হয় না। নাড়ী পরীক্ষা কালে এই রূপ কারণ বিশেষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে মহা ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

ভোজনের পরক্ষণে, স্নানের পর, ভ্রমণ, মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র সেবা, ক্রন্দন ও তৈলাদি মর্দ্দনের পর, নিদ্রাবস্থায়, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধ হইলে নাড়ী প্রকৃতিস্থ থাকে না। ঐ কালে নাড়ী পরীক্ষা করা যশাভিলাষী বৈদ্যের কদাচ বিধেয় নহে। রোগী সুস্থির হইলে, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাহার নাড়ীর পরীক্ষা করিতে হয়।

পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষণীয়। যাহার নাড়ীর গতি একবারে সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় না, তাহার নাড়ী পুনঃ২ দেখা উচিত। অভাবে দুইবার দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শরীরের অভ্যন্তরে অসংখ্য২ অনেক প্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। নাভির নিম্নে ও মূলাধারের ঊর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশটী নাড়ী হইতে দশ প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ দশটীর মধ্যে তিনটী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তিনটীর নাম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। অপর সাতটীর নাম গান্ধারী, হস্তীজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ এবং শঙ্খিনী। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যদেশে সুষুম্না। বামচক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ-লোচনে হস্তীজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহূ এবং মলাধারে শঙ্খিনী। এই দশটী নাড়ী এইরূপে দেহের দশটী দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে।

শিবসংহিতামতে মনুষ্যের শরীরে প্রধানভূতা সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটী প্রধান। পূর্ব্বোল্লিখিত দশটী, এবং আরো সরস্বতী, পয়স্বিনী, বারুণী ও বিশ্বোদরী, এই চারিটী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না শ্রেষ্ঠ। এই তিনটীর মধ্যে আবার সুষুম্না

সর্ব্বপ্রধান। এই নাড়ী যোগীদিগের অতি প্রিয়। অন্যান্য নাড়ী সকল ইহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করে।

আমরা এই সকল দুর্বোধ নাড়ী-তত্ত্ব ছাড়িয়া, কেবল বায়ু পিত্ত ও কফ-বোধক নাড়ীত্রয়ের পরীক্ষা বিধি লিখিলাম। ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়াও নিতান্ত সহজ নহে। ইহারা নীরোগ অবস্থায় যে রূপ থাকে, পীড়াকালে সে রূপ থাকে না। এবং বাল্যে একরূপ, যৌবনে অন্যরূপ ও বার্দ্ধক্যে আর এক প্রকার হয়। এমন কি, প্রাতে যে রূপ থাকে মধ্যাহ্নে সে রূপ দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন২ রোগে, ভিন্ন২ বয়সে ও ভিন্ন২ সময়ে নাড়ী ভিন্ন২ ভাবাপন্ন হয়। এবং উহার স্পন্দন সংখ্যাও ভিন্ন২ বয়সে ভিন্ন২ রূপ। এক পল সময়ে সদ্যপ্রসূত শিশুর নাড়ী স্পন্দন সংখ্যা ৫৬ বার, বালকের ৪০।৫০ বার, যুবার ৩৬, প্রৌঢ়ের ২৯ ও বৃদ্ধের ২৮ বার। অতি বৃদ্ধের আবার কিছু অধিক, ৩০।৩১ বার।

আজকালের ডাক্তার বাবুরা প্রায় এ সকল ভিতর ধার ধারেন না। হাত ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া রোগ নির্ণয় করা বড় একটা কাহারও অভ্যাস নাই। ইংরাজী বিদ্যায় তাঁহারা সুশিক্ষিত, সুতরাং ইংরাজী চালে চলিয়া থাকেন। তাপমান যন্ত্র রোগীর সন্ধিস্থলে সংস্থাপন করিয়া রোগ পরীক্ষা করেন। ডাক্তার বাবু যেখানে যান, শ্যামের করে মোহনবংশীর ন্যায় হাতে হাতে যন্ত্রটি ফিরিতেছে। আমরা ঐ বাঁশীর কি গুণ জানি না, কিন্তু ঐ বংশীধারীদিগের অনেকেই যে তদ্দ্বারা রোগতত্ত্ব ভাল বুঝিতে পারেন না, ইহা অনেক স্থলে দেখিতে পাইয়া থাকি।

যাঁহারা উত্তমরূপে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহাদের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠে। তাঁহাদিগকে কোথাও হতমান বা নিন্দাভাজন হইতে হয় না। কারণ, তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষাদ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফজনিত রোগ সমূহের দোষ বিশেষ ও সাধ্যাসাধ্য অবস্থা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা করা যে অতীব কঠিন কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

(ক্রমশঃ)

সুহাসিনী।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব মিলন।

Oh ! to what—fortune am I to ascribe this strange meeting ?

Goldsmith.

দ্বিপ্রহর রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতায় গা ঢালিয়া দিয়া কলনাদিনী ভাগীরথী ধীর প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। সারি সারি নৌকাশ্রেণী তটলগ্ন হইয়া নিস্তব্ধভাবে আপন আপন দেহ জাগাইয়া ভাসিয়া রহিয়াছে। নৌকা-রোহীদিগের মধ্যে কচিৎ কেহ কথা কহিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ মৃদুভাবে গান ধরিয়াছে, কেহ বা নৌকা মধ্যে রসুইয়ের বন্দোবস্ত দেখিতেছে; তদ্ভিন্ন অধিকাংশ লোক সুপ্ত, অধিকাংশই নিস্তব্ধ। সেই দ্বিপ্রহর রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাহ্নবী-বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী জোরে বাহিয়া চলিয়াছে। ঘোর অন্ধকার দূর করিবার জন্য আকাশের গায় অনন্ত নক্ষত্রমালা ফুটিয়া রহিয়াছিল, ক্ষেপণীবিতাড়িত গঙ্গাজলে প্রতিভাসিত হইয়া সে নক্ষত্রমালা আরও অনন্ত দেখাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুই পার্শ্বের বহু গ্রাম, জনপদ অতিক্রম করিয়া সে তরিখানি হুগলীর নিকটবর্ত্তী হইল। দূরে কি একটা পদার্থ ভাসিতেছিল, তাহা সেই নৌকার গায়ে লাগিল। মাঝিরা "তোবা তোবা" করিয়া উঠিল। নৌকার ভিতর হইতে কে প্রশ্ন করিল—"কি গা ?" পশ্চাতের দাঁড়ি বলিল "একটা মুদ্দোর, বাবু।" মাঝিরা সে পদার্থটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঝিকা মারিয়া নৌকা জোরে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কে জানে কেন, নৌকার খড়খড়ি খুলিয়া সে সময়ে একজন যুবা কি দেখিতেছিল, হঠাৎ তাহার চক্ষু সেই পদার্থের উপর পড়িল। দেখিল, তাহা মৃত শরীর নয়, কোনও হতভাগ্য জলমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে; আশ্বাসে ভর করিয়া

নৌকায় উঠিবার জন্য দাঁড় ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, দাঁড়ি তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সঙ্গীকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা ফিরাইয়া তাহাকে তুলিবার জন্য মাঝিদিগকে অনেক বলিলেন। মাঝিরা প্রথমতঃ স্বীকার পাইল না, তাঁহারা তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন, বলিলেন। তখন নৌকা ফিরাইয়া সকলে সে পদার্থ নৌকায় তুলিল। সেই দ্বিপ্রহর নিশায় নিস্তব্ধ জাহ্নবীবক্ষে নৌকার ভিতরে ক্ষীণ আলোকে তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এক জন আর এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি, এ কি ?" অন্য ব্যক্তি কথা কহিল না, ভ্রুভঙ্গী করিয়া প্রশ্নকারীকে কি ইঙ্গিত করিল। যাহাকে ইঙ্গিত করিল, সে সেই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিল। ব্যাকুল অন্তরে আবার বলিল—"সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত, রক্তের ধারা বহিতেছে, কি হবে ভাই ? পোড়া কপালে এত দিনের পর এ কি দেখা !"

"ভয় কি ?" এই বলিয়া অন্য ব্যক্তি তাহা কাণে কাণে কি বলিল।

প্রশ্নকারী আর দ্বিরুক্তি করিল না। আহত ব্যক্তির সে সময় সংজ্ঞা ছিল না, ধীরে ধীরে তাহার মস্তক টানিয়া লইয়া আপনার ক্রোড়ের উপর রাখিলেন। অনেক দিনের পর আজ মুহূর্ত্তের জন্য সুহাসিনী স্বর্গ দেখিল। বালিকা যাহা আর কখন পাইবে না ভাবিয়াছিল, আজ তাহা পাইল। সুহাসিনীর ক্রোড়ে চারুচন্দ্র !

—:—

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

Portia—When we are both accoutred like young men,
I'll prove the prettier fellow of the two—
Merchant of Venice.

গঙ্গাতীরে একখানি জীর্ণ কুটীর মধ্যে চারুচন্দ্র শুইয়া রহিয়াছেন। নিকটে তাঁহার উদ্ধারকারী যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন বসিয়া আছেন। নানা প্রসঙ্গের নানা কথা হইতেছে। আজ আট দিন হইল, চারু বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কথায় ২ চারু বলিল "আপনারা আর জন্মে আমার কে

ছিলেন জানি না, কিন্তু এজন্মে যে উপকার করিয়াছেন, সে ঋণ কখনই শোধিতে পারিব না. আপনারা আমার জীবন দাতা।”

যুবক উত্তর করিল—“আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, যে কিছু আপনার উপকার, আমার সেই বন্ধু হইতেই হইয়াছে। কিন্তু সে সব কথা কেন ?”

চারু বলিল—“আপনার বন্ধুর গুণ এ জীবনে ভুলিব না। এ জীবন তাঁহার দেওয়া, তাঁহার দেওয়া এজীবন দিয়া যদি তাঁহার কোন কার্য্য সাধিতে পারি, আপনাকে ধন্য মনে করিব।”

যুবক বলিলেন—“আমার বন্ধুর স্বভাবই এইরূপ, তিনি কখন কোন উপকারের জন্য প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করেন না। উপকৃত ব্যক্তি যদি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে তাহাতেই তিনি চরিতার্থ হন।”

মূহুর্ত্তের জন্য চারু কি চিন্তা করিল, তার পর বলিল—“ভালবাসা ! কি বলিলেন—ভালবাসা ! ভালবাসার নামে এ হৃদয় তো শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ হৃদয়ের প্রতি রক্ত বিন্দুর সহিত প্রতি শিরায় শিরায় আজও যে ভালবাসা সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিব।”

যুবক মনে মনে বলিল—সখীর জন্য তাহাই আমি চাই, দেখিও, যেন প্রতিজ্ঞা ভুলিও না।

গ্রন্থকার বলেন, কৌশলময় বাক্যের বাগুরা পাতিয়া, দূতি, চারুচন্দ্রকে আজ যে রূপ পাশবদ্ধ করিলে, সাধ্য কি, আর কখন সে জাল ছিঁড়িয়া চারু উন্মুক্ত হইবে। ধন্য রমণীর বাক্ চাতুরী !

চারু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ধীরে ধীরে সেইখানে অপর যুবক আসিলেন। আসিয়া তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন—“কি কথা হইতেছিল ?”

“এই তোমারই কথা।”

“আমার কথা ?”

চারু বলিল—হাঁ আপনার সেই অসামান্য গুণের কথাই হইতেছিল।

দ্বিতীয় যুবা অন্য কথা পাড়িল। বলিল—“এখন তো আর শরীর তেমন দুর্ব্বল নাই ?”

চারু বলিল—"না, এখন বেশ বল পাইয়াছি। এক্ষণে দিন কতকের জন্য আমাকে বিদায় দিন। আমি যেখানে থাকি, আপনাদের এ উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না।"

কথা শুনিয়া দ্বিতীয় যুবা শীহরিল। প্রথম যুবক বলিল—"এই শরীর, এখন কোথায় যাইবেন?"

"মোগল পোর্ত্তুগীজে আবার নাকি ইহার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবে। আপনাদের প্রসাদে যখন আবার জীবন পাইয়াছি, তখন তাহা জানিয়াও কেমন করিয়া গৃহে থাকিব?"

"আপনি কি তবে এই শরীর লইয়া যুদ্ধে যাইবেন?" ধীরে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় যুবক এই কয়টী কথা বলিল। সে কথা কয়টী কাতরতাপূর্ণ।

সে কথা শুনিয়া চারু বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটী জলে পূরিয়া আসিয়াছে। তাহা দেখিয়া চারুর মনে বড়ই কষ্ট হইল, যাইবে কি না অনেক ভাবিল। কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ দেহের ভিতর হইতে প্রাণ যেন কি করিয়া উঠিল। একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিল, পার্শ্বে অন্য যুবা বসিয়াছিল, একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল। কোথা হইতে তরঙ্গের ন্যায় চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া মনকে আকুলিত করিয়া তুলিল। স্থির হইয়া ক্ষণেকের জন্য দুই জনের দেহশোভা দেখিতে লাগিল। দেখিল, দুইজনেই সুরূপ, সে লাবণ্য দেহে ধরে না। কিন্তু এ দুজনের মধ্যেও মাধুরী-গরিমায় যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতভাবে শোভা পাইতেছে, এ দ্বিতীয় যুবক কে? চিন্তা করিতে করিতে চারু আবার একবার সেই প্রশ্নকারীর মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিল, সে মুখ দেখিয়া—সেই সজল প্রেমভিক্ষাপরিপূর্ণ নয়ন দুটী যে মুখে স্থির হইয়া শোভা পাইতেছিল, সেই মুখ দেখিয়া, কে জানে কেন, সুহাসিনীর কথা মনে পড়িল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া চারু অন্য চিন্তায় মন দিল। তখন সেই দুইজন যুবক চারুকে যুদ্ধে যাইতে অনেক নিষেধ করিতেছিল; চারু বলিল—"আপনাদের কথায় অমত করা আমার শোভা পায় না, কিন্তু মাপ করিবেন, আমি ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে কয়েক দিনের জন্য বিদায় দিন।"

যুবকেরা চারুর স্থির সংকল্প বুঝিল। বলিল—"ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রক্ষা করুন। তবে আবার কবে আসিবেন?"

চারু বলিল—"যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আর যে কথন ফিরিব এমন ইচ্ছা ছিল না। একদিন এ লক্ষ্যশূন্য জীবন মাতৃভূমির জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে অন্য লক্ষ্য মিলিয়াছে। মাতৃভূমির জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহা যদি মাতৃভূমির কার্য্য সাধিয়া ফিরে, আপনাদের কার্য্যে উৎসর্গ করিব। আপনারা না থাকিলে আমি এজীবন পাইতাম না।"

গিরিবালা কাতরদৃষ্টে সুহাসিনীর প্রতি চাহিল। দেখিল, নীরবে ফোটা ফোটা করিয়া চক্ষের জলে বালিকার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

—:—

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মোগল-পর্ত্তুগীজে।

মহাপ্রলয়মারুতক্ষুভিত পুষ্করাবর্ত্তক
প্রচণ্ডঘনগর্জ্জিত প্রতিরবানুকারী মুহুঃ।
রবঃ শ্রবণভৈরবঃ স্থলিত রোদসীকন্দরঃ
কুতো হদ্য সমরোদধেরয়ঃ ভূতপূর্ব্বপ্লবম্॥

বেণীসংহারম্।

প্রাতঃকালের উজ্জল সূর্য্যালোকে পোর্ত্তুগীজদুর্গবেষ্টনী পরিখার জল তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, সহসা দুই পার্শ্ব হইতে সেই জলে সৈন্যসারির কালরেখা প্রতিভাসিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রবণভৈরব রণবাদ্যে, কামানের ঘোর গর্জ্জনে এবং সৈন্যদিগের ভীষণ হুহুঙ্কার ধ্বনির বিরাট মিশ্রণে সে স্থান সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল। সেই ভীষণ শব্দ পরিখার জল গড়াইতে গড়াইতে দূর ভাগীরথীর হৃদয়ে প্রহত হইয়া দিঙ্মণ্ডল বিদারিত করিয়া তুলিল। আজ মোগলেরা পূর্ব্ব হইতেই সেতু অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদিগের অসীম সাহস, অজেয় বল, অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। রণবাদ্যের ঝর ঝর তালের সহিত অশ্বের হ্রেষাস্বর মিলাইয়া মোগল-বাহিনী সেতু অতিক্রম করিয়া সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতেছে। সেতুর অন্য পারে রড্রিগ পরিচালিত পোর্ত্তুগীজসেনা বর্শা উত্তোলন করিয়া নিঃশব্দে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষা

করিতেছে। সে দৃশ্য অতি রোমহর্ষণ, অথচ অতি চমৎকার। বীরের হৃদয় সে দৃশ্য দেখিয়া মাতিয়া উঠিল। তরঙ্গ যেমন তরঙ্গের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, মোগলসেনা সেই রূপ পোর্ত্তুগীজসেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে প্রচণ্ড আক্রমণ সামান্য সেনা সহ্য করিতে পারে না। পোর্ত্তুগীজেরা সামান্য ছিল না, পোর্ত্তুগীজসেনা অক্লেশে সে আক্রমণ সহিয়া স্থির রহিল। একটিও সেনা আপন স্থান ছাড়িল না। কিন্তু তখন যে সময় উপস্থিত, যুদ্ধের প্রকৃত নিয়ম তখন আর প্রতিপালন হয় না। সে সময় গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, পদাতিকে পদাতিকে যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। যে যাহাকে পাইল সেই তাহাকে মারিতে লাগিল। গজ অশ্বকে আক্রমণ করিল, আবার পদাতিক হয়ত গজকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার প্রতি অসি চালনা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দুই দল দুই দলকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

নিমেষ মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও মানুষের ছিন্ন হস্তপদে রণভূমি পুরিয়া উঠিল। কামানের প্রচণ্ড ধূমে সূর্য্য তখন ঢাকিয়া গিয়াছিল, কে আপন কে পর কিছুই নির্ণয় হয় না, কে বধ্য কে অবধ্য সে বিচারের সময় তখন নাই। পোর্ত্তুগীজহস্তে কত পোর্ত্তুগীজের মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূমে লুটাইতেছে, আবার মোগলের অসির অব্যর্থ অঘাতে কত মোগলের রক্তে রণভূমি প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। সে দিনকার সে যুদ্ধের কথা কে বর্ণনা করিবে? রডরিগ একবার পোর্ত্তুগালবাসিনী প্রেয়সীর মুখখানি স্মরণ করিল, নিঃশব্দে একবিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া সম্মুখের ভীষণ কার্য্যে জীবন আহুতি ঢালিয়া দিল। পোর্ত্তুগীজসেনা স্বদেশের কথা ভুলিয়া গিয়া সেনাপতির সঙ্গে সেই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। এনায়ত উল্লা, যতসাধ্য ছিল, কিছুই ক্রটি করিল না; কিন্তু পোর্ত্তুগীজেরা সে দিন নিরাশাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল, এনায়েত কোনও মতে তাহাদিগকে হটাইতে পারিলেন না। একবার শেষ আক্রমণের জন্য এনায়েত আপন ভেরী বাজাইলেন, "আল্লা হো আক্‌বার" বলিয়া মোগলেরা সে রব শুনিয়া শেষ আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে অগণিত পোর্ত্তুগীজের ছিন্নমুণ্ড ভূমে গড়াগড়ি গেল। তথাপি পোর্ত্তুগীজ হটিল না। রড্রিগ গতিক বুঝিয়া এক হুঙ্কর

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে গঞ্জালে সকল ছাড়িয়া এনায়েতের প্রতি ধাবিত হইল। মুহুর্ত্ত মধ্যে গঞ্জালের শোণিতলিপ্সু শাণিত কৃপাণ এনায়েতের মাথার উপর উত্তোলিত হইল। এনায়েত সে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, হঠাৎ তাহা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, বীরের হৃদয় শুখাইয়া গেল, ভয়ে তাঁহার হাতের তরবারি উঠিল না। অচিরাৎ সন্ সন্ বেগে একটা তীক্ষ্ণ বর্শা আসিয়া গঞ্জালের দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল। গঞ্জালে চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজাইল। আসন্ন বিপদ হইতে যে উদ্ধার করিল, তাহার জন্য এনায়েত একবার পশ্চাতে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই সৈনিক—যে এক দিন অসামান্য বীরত্বের পর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—বেগে সেই সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেছে। এনায়েতের হৃদয়ে আনন্দের সীমা রহিল না। জীবনদাতাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য এনায়েত কি বলিতে যাইতেছিলেন, যিনি আসিলেন তিনি বলিলেন —"অন্য কথার অবসর নাই, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি পশ্চাতের সমস্ত পোর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিয়া আসিয়াছি, তাহারা শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলাইয়াছে, অবশিষ্ট এই কয়টীমাত্র সেনা ভিন্ন অন্য পোর্ত্তুগীজ আর নাই। আসুন, আর একবার আক্রমণ করা যাউক, আজ নিশ্চয় দিল্লীশ্বরের জয়।"

এনায়েত তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল—"যাহারা পলাইয়াছে তাহারা কোথায় গেল?"

উত্তর হইল—'বোধ হয় নৌকা করিয়া এতক্ষণ গঙ্গায় পড়িয়াছে, আসুন, যে কয়জন অবশিষ্ট আছে ইহাদিগকেও ভাগীরথী পার করিয়া দিয়া আসি।"

এনায়েত দ্বিরুক্তি করিল না। তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহার যুদ্ধের ভেরী ঘোর রবে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ঘোর হুঙ্কারে মোগলেরা সেই পোর্ত্তুগিজদিগের উপর লম্ফ দিয়া পড়িল। রডরিগের রণচাতুরী আর রক্ষা করিতে পারিল না, পোর্ত্তুগীজসৈন্য আর যদিও একদণ্ডকাল যুঝিতে পারিত—তাহা পারিল না। সকলে একবার চাহিয়া দেখিল, সেই প্রকাণ্ড দুর্গ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আপনার প্রাণ অপেক্ষা স্ত্রীপরিবারের প্রাণ বড় প্রিয়তর সামগ্রী; অনেক সেনিকের স্ত্রীপরিবার ছিল। সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া সেই দিকে দৌড়িল।

অবসর বুঝিয়া রডরিগ নৌকা করিয়া পলায়ন করিলেন। অনেক

পোর্ত্তুগীজ সেই সঙ্গে যোগ দিল। অনেকে নৌকাযোগে প্রাণভয়ে স্বদেশের উদ্দেশে বাহির হইয়া চলিল। বিজয়ী মোগলবাহিনী সেই সকল পলায়নপর পোর্ত্তুগীজ নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অনেক নৌকা জলে ডুবাইয়া দিল, অনেক নৌকা আরোহীসহিত আগুনে জ্বালাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের পর গঙ্গার গর্ভে মাতা মেরীর পুত্রদিগের যে শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। ইতিহাস-পাঠক সে সকল কথা ইতিহাসে সবিস্তারে পাঠ করিবেন।

—:—

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ দৃশ্য।

——হেরিলা সভয়ে
ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি।

মেঘনাদবধ।

কয়েক ঘণ্টা হইল, যুদ্ধের সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মোগলদিগের বিজয় নিশান শূন্যের উপর উন্নত মস্তক উত্তোলন করিয়া পত পত রবে উড্ডীন হইতেছে। মোগল সেনা যুদ্ধ ছাড়িয়া তখন লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে সেনার সে কোলাহল শব্দ আর নাই, সে কামানের মুহুর্মুহুঃ ঘোর গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে, বীরের বিরাট চীৎকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; সে ক্ষেত্র কেবল হত আহত সৈন্যদেহে পূর্ণ। গজে, অশ্বে, মানুষে একত্রে জড়াজড়ি খাইতেছে, হত আহত এক সঙ্গে পড়িয়া ভূমে লুটাইতেছে; অনেক আহত ব্যক্তি হতব্যক্তির চাপে পড়িয়া তখনও প্রাণ হারাইতেছে। অনেকে তখনও প্রাণভয়ে কেহ চাহিতেছে—জল! কেহ বলিতেছে—গেলুম! কেহবা মুখ হা করিতেছে; কে তাহাদিগের সে কথা শুনিবে? নিঃশব্দে দেখিতে২ তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতেছে। এক অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড এক দিকে এবং দেহ শত হস্ত দূরে অন্য দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তের স্রোতে রণস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; পরিখার জল সেই রক্তে মিশ্রিত

হইয়া ঘোর লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পোর্ত্তুগীজদুর্গে যে আগুণ লাগিয়াছিল, তখনও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই; অগ্নি শত শিখা বিস্তার করিয়া ধূমময় স্ফুলিঙ্গ উড়াইয়া তখন ও তীব্রতেজে ধূধূ শব্দে জ্বলিতেছে। রণপ্রাঙ্গনের এ ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য অন্য লোক তথায় ছিল না। কেবল সেই বীরসৈনিকের হস্ত ধরিয়া এনায়েত অতি স্বল্পমাত্র শরীররক্ষকের সহিত সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গে কে আগুণ লাগাইল, ইহা জানিবার জন্য তাঁহাদিগেব অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা ধীরে ধীরে সেই প্রজ্বলিত দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সহসা সন্ সন্ বেগে এক দীর্ঘ বর্শা আসিয়া সেই বীরসৈনিকের অঙ্গে আঘাত করিল। সৈনিকের সর্ব্বাঙ্গ কঠিন বর্ম্মায় আবৃত ছিল, সে অভেদ্য বর্ম্মায় ঠেকিয়া দীর্ঘ বর্শা দূরে গিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিল। সহসা একখানা উৎক্ষিপ্ত অসি আসিয়া সেই বীরের মস্তকের উপর পড়িল; লৌহময় শিরস্ত্রাণে মস্তক আবৃত ছিল, সেই শিরস্ত্রাণে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া সে অসি পড়িয়া গেল। বীরসৈনিকের কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না।

"কুক্ষণে ইহার উপর অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিলে" এই বলিয়া এনায়েত অশ্ব চালাইয়া তাহার উপর লম্ফ দিয়া পড়িলেন। এনায়েত যে প্রচণ্ড খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল, সে খড়্গ নিপতিত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে আততায়ীর ছিন্নশির ভূমে লুটাইত, কিন্তু হঠাৎ—কে জানে কেন—বীরসৈনিক আসিয়া এনায়েতের হাত ধরিলেন। এনায়েত বিস্মিত হইল। সৈনিক বলিলেন "উহাকে বধ করিবেন না; বন্দী করিয়া রাখুন।" মুহূর্ত্তমধ্যে এনায়েতের আদেশে পশ্চাতের রক্ষকদিগের হস্তে সেই হতভাগ্য বন্দী হইল।

এনায়েত আর অগ্রসর না হইয়া, পাছে অন্য বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কায়, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। সৈনিকপুরুষ সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"ভগবান সহায় আছেন, ভয় কি, চলুন দেখিয়া আসি এ অগ্নির খেলা কে খেলিল।" এনায়েত আর কিছু বলিলেন না, ধীরে অগ্রসর হইলেন।

আর পা উঠিল না, সেই বীরহৃদয় ভয়ে বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া পড়িল। ভয়ে, বিস্ময়ে সকলে দেখিল—এক বিকটাকার উন্মাদিনী! শীর্ণকায়, উন্মুক্ত কেশ, এক হস্তে ভীষণ ত্রিশূল, অন্য হস্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড—হি হিঃ শব্দে খল খল হাসিতেছে, কখন ধেই ধেই নাচিতেছে, কখন বিকটরবে চীৎকার ছাড়িতেছে। সৈনিক সে উন্মাদিনীকে কোথায় দেখিয়াছিলেন স্মরণ করিলেন। সে উন্মাদিনী কেন এখানে আসিল তাই ভাবিয়া ভয় অপেক্ষা তাঁব বিস্ময় আরো বাড়িল। বিস্ময়ের সহিত সকলে দেখিল—এ কি? উন্মাদিনীর পদতলে এ কাহার দেহ? এনায়েত চিনিলেন, সেই বিগ্রহসচিব—সেই ভূপেন্দ্রনারায়ণ! উন্মাদিনীর কার্য্য দেখিয়া এনায়েতের বক্ষঃ শুখাইল। দেখিল, উন্মাদিনী সেই ভূপেন্দ্রের বক্ষে চড়িয়া কখন ত্রিশূ-লের তীক্ষ্ণ আঘাত বসাইতেছে, কখন জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা প্রহার করি-তেছে, আবার কখন বা বিকটশব্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই বক্ষের উপর ধেই ধেই নাচিতেছে। ভূপেন্দ্রের প্রাণ বাহির হইবার পথ দেখিতেছিল; দেহ অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া গিয়াছে, চক্ষের তারা কপালে স্থির হইয়া রহিয়াছে, ভূপেন্দ্র একবার হা করিল। উন্মাদিনী সেই মুখের ভিতর জ্বলন্ত কাষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া সকলে শীহরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপেন্দ্রের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। উন্মাদিনী তখন ত্রিশূলে সেই শবদেহ নাড়িয়া "আমার সাধের বুল্‌বুল্‌ ঘুমিয়েছে" বলিয়া আবার খল খল করিয়া বিকট হাসি হাসিল। সে হাসির রবে বীরদিগের কবচরক্ষিত হৃদয় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। উন্মাদিনী তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া "কি দেখ্‌চো, দেখে যাও আর এক মজা" বলিয়া ত্রিশূল ঘুবাইয়া তীরবেগে দৌড়া-ইয়া চলিল। ভূপেন্দ্রের জন্য দুঃখের অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া তাহার নিকট সেই সকল শরীররক্ষকদিগকে রাখিয়া এনায়েত ও সেই সৈনিকপুরুষ ভয়ে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সেই ভয়ঙ্কর উন্মাদিনীর অনুগমন করিলেন।

উন্মাদিনী দুর্গ পার হইয়া অনেক দূর ছুটিয়া চলিল, তাঁহারাও দুই জনে সেই সঙ্গে অশ্ব ছুটাইয়া চলিলেন। ক্রোশৈক পরে এক নিবিড় বন। উন্মাদিনী সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বীরপুরুষেরাও সেই বনে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সকলে কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, একটা

প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মূলে একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির। সেই মন্দিরের সম্মুখভাগে এক পরম যোগীপুরুষ বসিয়া ছিলেন, সহসা পশ্চাতে উন্মাদিনীর বিকটশব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। শিরজটা পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। উন্মাদিনী দৌড়িয়া গিয়া সেই পাদমূলে আছাড় খাইয়া পড়িল। যোগীপুরুষ বিস্মিত হইলেন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদূরে বিস্মিত হইয়া এনায়েত ও সেই সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া উন্মাদিনী বলিল— "এক মজা দেখেছ, আর এক মজা দেখ—হি হি হি" এই বলিয়া উন্মাদিনী সেই ভীষণ ত্রিশূল আপনার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। ঝর ঝর করিয়া রুধির-স্রোতঃ বহিল। যোগীপুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সেই উন্মাদিনীকে দেখিতেছিলেন, 'প্রভো স্বামিন্' বলিয়া উন্মাদিনী সেই যোগীর পদপ্রান্তে লুটাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার জীবলীলা ফুরাইল। একবার—আর একবার মাত্র সেই মৃত্যু-অধিকৃত দেহের প্রতি চাহিয়া 'হতভাগিনি!' বলিয়া যোগী-পুরুষ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

—:—

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চিতানলে।

এ দেহের এত অহঙ্কার!
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর।

রামমোহন রায়।

যোগীপুরুষের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। সম্মুখে এনায়েত উল্লার সহিত চারুচন্দ্র বসিয়াছিলেন; বৃদ্ধ অন্য চিন্তা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধের কথা কহিতে লাগিলেন। চারুচন্দ্রকে দেখিয়া অবধি তাঁহার প্রাণের ভিতর কি যেন কি করিতেছিল, তাহার বীরত্বের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় আরো আলোড়িত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ চারু চন্দ্রের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলক্ষিতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে মিশাইল। এনায়েত উল্লা বা চারুচন্দ্র এ সমস্ত

কিছুই জানিতে পারিলেন না। এনায়েত যথামত যুদ্ধের ঘটনা সকল বিবৃত করিতেছিলেন, যোগী অতি আগ্রহে সে সকল কথা শুনিতেছিলেন। এত যে অনাসক্ত উদাসীন, এত যে মনের অসুস্থতা, তথাপি সেই বৃদ্ধ সে সকল কথা শুনিতে শুনিতে যুবার ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এনায়েতের কথা শেষ হইলে, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া বৃদ্ধ যুদ্ধের কত নীতিপূর্ণ উপদেশ কথা বলিতে লাগিলেন। পুরাণের কথা, দ্রোণের সেই ব্যূহরচনা, অর্জ্জুনের সেই রণপাণ্ডিত্য, কর্ণের শরসন্ধান, তারপর রাজপুতদিগের সেই অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী—বৃদ্ধ একে একে অতি উৎসাহের সহিত সে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। বলিবার সময় তাহারা দেখিল, বৃদ্ধের ললাট-রেখা স্ফীত হইয়াছে, চক্ষু জ্বলিতেছে। দেখিয়া উভয়ে বুঝিল, কেবল যোগসাধনায় বৃদ্ধের সকল সময় অতিবাহিত হয় নাই। এক সময়ে তিনি একজন অসামান্য রণকুশল সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে তখন সাহস হইল না। তাঁহারা বলিলেন "মহাশয়ের উপদেশ সকল অতি নীতিপূর্ণ এবং মনোহর, যোগ আরাধনায় নিবিষ্ট থাকিয়া এ সকল যুদ্ধের উপদেশ দেওয়া বড় আশ্চর্য্যের কথা।"

বৃদ্ধ সে কথায় কিছু উত্তর প্রদান করিল না। একবার স্থির হইয়া কি চিন্তা করিল, চারুর প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিল। তখনও সম্মুখে সেই মৃত্যুবিবর্ণীকৃত উন্মাদিনীর দেহ পড়িয়া রহিয়াছিল, একবার সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; নিঃশব্দে একবিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে চিত্ত সংযম করিয়া যোগীপুরুষ তৎকালোচিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"অভাগীর এ মৃতদেহ সৎকার অভাবে আর কতক্ষণ পড়িয়া থাকিবে? একাকী আমার দ্বারায় এ দেহের গতি কি হইবে?"

চারু বলিল—"চিন্তা করিবেন না, আজ্ঞা হয় তো, আপনার কার্য্য সাধিতে এ দাস প্রস্তুত আছে।"

যোগী। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু এখনও দেখিতেছি আপনারা যুদ্ধের বেশ পরিত্যাগ করেন নাই। এই অসীম রণক্লেশের পর এ বেশে এ কার্য্য করা অসম্ভব। বিশেষ আপনি একাকী, সেনাপতি মহাশয় যবন। হিন্দুর শব যবনের অস্পৃশ্য।

চারু। উন্মাদিনী এই মাত্র যাহাকে মারিয়া আসিল, তাহারও দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অনুমতি হয় যদি, আমাদের যে সমস্ত লোক সেই শবের নিকট রহিয়াছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া এক সময়েই এ দুই দেহের সৎকার হইতে পারে।

কথা শুনিয়া যোগী বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"উন্মাদিনী—এই উন্মাদিনী মারিয়াছে!—কাহাকে মারিল? আপনারা কি তাহাকে জানেন? —সে কে?

এনায়েতউল্লা বলিলেন—"আমরা তাহাকে জানি, বহুদিন হইতে সে আমাদের বিগ্রহসচিব ছিল। তাহার নাম ভূপেন্দ্র নারায়ণ। কিন্তু—"

এনায়েত আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সে কথা মুখ হইতে বাহির না হইতেই "ভূপেন্দ্রনারায়ণ! ভূপেন্দ্রনারায়ণ!" বলিয়া যোগীপুরুষ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। তখন সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া আসিতেছিল; অস্তগমনোন্মুখ সেই সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ আসিয়া সেই যোগীপুরুষের মুখের উপর পড়িয়া শোভা পাইতেছিল। সেই স্বর্ণ কিরণের সঙ্গে মিশিয়া বৃদ্ধের চক্ষু হইতে তীক্ষ্ণ কিরণ ছুটিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, শীর্ণদেহের শিরাগুলি একে একে স্ফীত হইয়া উঠিল; দন্তে দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত হইল। বৃক্ষের পত্র কাঁপাইয়া ধীর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, একটি উষ্ণ নিশ্বাস সে বায়ুর সঙ্গে মিশাইল। যোগীপুরুষের সেই আশ্চর্য্য ভাবান্তর দেখিয়া এনায়েত উল্লা ও চারুচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের কৌতূহল আরো বাড়িয়া উঠিল। সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার সময় তখন ছিল না; মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, যোগীর মনের অবস্থা তখন ভাল নহে; সুতরাং প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার অবসর কোথায়? চারুচন্দ্র বলিলেন "তবে, এক্ষণে আমরা চলিলাম; সৎকারের আয়োজন করি গিয়া, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

যোগী বলিলেন—"আপনারা আজ আমার পরম বন্ধুর কার্য্য করিলেন। আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে?"

এনায়েত উল্লা উত্তর করিলেন "যদি অনুমতি করেন, কল্য সন্ধ্যার

সময় দুইজনে আসিয়া আপনার নিকট নীতি শিক্ষা করিয়া চরিতার্থ হইব।”

এনায়েত ও চারু অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তারপর, তাঁহাদের কথায় রক্ষীবর্গ উন্মাদিনীর সেই মৃত দেহ লইয়া আসিল। ভূপেন্দ্রের মৃত শরীর তখনও সেই সন্ধ্যার কৃষ্ণ ক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছিল। উভয় দেহ লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে চিতা রচনা করিল। দুই চিতায় দুই দেহ সংস্থাপিত হইল। চারুচন্দ্র অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে জগতের অনিত্যতা ঘোষণা করিয়া ধূ ধূ শব্দে উন্মাদিনীর চিতা জ্বলিয়া উঠিল। ভূপেন্দ্রের চিতা তেমন তেজে জ্বলিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে উন্মাদিনীর দেহ পুড়িয়া ছাই হইল; কিন্তু ভূপেন্দ্রের দেহ পুড়িল না। অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া তাহা বিকৃত আকার ধারণ করিল। সে বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী অন্তরে শীহরিল। পাপীর অপবিত্র দেহ বলিয়া অগ্নিদেব পরিত্যাগ করিলেন, ইহা ভাবিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। আজন্ম শত্রুর শেষ দশা দেখিয়া চারুচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইল; তাহার সদ্গতির জন্য শান্ত ভাবে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিলেন। অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিলেন, অগ্নি জ্বলিল না। ঘাটের সকল লোক মহাপাতকী বলিয়া মৃতের উদ্দেশে অনেক ঘৃণা প্রকাশ করিল। একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া অতি কষ্টে চারু চিতা আবার জ্বালাইয়া দিল। বুঝি, চারুর দুঃখ দেখিয়া অগ্নির দয়া হইল; কতক্ষণের পর ধূমাইয়া ধূমাইয়া বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কতক্ষণের পর ভূপেন্দ্রের দেহ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। জল ঢালিয়া চিতা ধুইয়া দিল। আর ভূপেন্দ্রের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না।

পৃথিবীর মানুষ! এদেহের এই তো পরিণাম, এই তো ইহার শেষ দশা! তবে ইহার জন্য এত চেষ্টা কেন? এ চেষ্টায় পুত্র পিতাকে ঠেলিয়া যাইতেছে; ভ্রাতা ভ্রাতার মুখ দেখিতেছে না; ন্যায় ও ধর্ম্মের কোমল তনু স্বার্থের তীব্র শিখায় পড়িয়া পুড়িতেছে; ইচ্ছা করিলে যে জীব স্বর্গের দেবতা হইতে পারে, এক লালসার দাস হইয়া প্রবঞ্চনা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকা, ঘাতুকতা প্রভৃতি পাপানুষ্ঠানে নরকের কীট হইয়া যাইতেছে। এ অনন্ত চেষ্টা, এ অনন্ত কর্ম্মকাণ্ড কিসের জন্য? কয়দিনের জন্য ভোগ,

কয়দিনের জন্য দেহ, কয়দিনের জন্য এ পৃথিবী? এ ভবের হাটে অসার ক্ষণ-ভঙ্গুর কাচের দোকান সাজাইয়া, লোক ঠকাইয়া, বাণিজ্য ব্যবসা কত দিন চলিবে? কার্য্য বল, চেষ্টা বল, আড়ম্বর বল, স্বার্থসাধন বল, সে তো কেবল দেহের অহঙ্কারে। কিন্তু এই তো দেহের পরিণাম! এ দেহ কয় দিনের জন্য?

—:—

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

যোগীর আত্মকথা।

Give me to ease my tortured mind,
  Lend to my woes a patient ear;
And let me—if I may not find
  A friend to help—find one to hear.

Crabbe.

সন্ধ্যা আসিয়াছে। আকাশ, নক্ষত্র, নীলিমা সকল স্তরে স্তরে অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সে বনভাগ অন্ধকারে মিশিয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে। নগরের হিংসা, দ্বেষ, আড়ম্বর, কার্য্য-কোলাহল সে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে পায় না। বনভাগ শান্ত, পবিত্র, দ্বেষবিদ্বেষশূন্য, প্রীতির পূর্ণ-আবসথ। যে সকল জীবজন্তু তথায় বিচরণ করিত, সন্ধ্যার আগমনে তাহারা নীরব হইয়াছে; আর এখন পাখী ডাকে না, গাভী চরে না, হরিণশিশু আনন্দে খেলিয়া বেড়ায় না। সমস্ত নির্জ্জন, নীরব এবং নিস্তব্ধ। কেবল স্থানে স্থানে বৃক্ষ-পত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র মালা নয়ন রঞ্জন করিতেছে, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বৃক্ষের পত্র নাড়িয়া প্রবাহিত হইতেছে। আর কেবল সেই শিবমূর্ত্তির সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগীপুরুষ সপ্তস্বর মিলাইয়া প্রেমভরে দেবদেবের অনন্ত মহিমা গান করিতেছেন, আর অদূরে বসিয়া দুইটি বালিকা সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া পবিত্র প্রেম ও উল্লাসের তরঙ্গ তুলিয়া সেই গীতের সহিত যোগ দিতেছে। গীতধ্বনি কখনও মন্দীভূত, কখন বা সতেজে উচ্চারিত হইতেছে, গায়কের মন দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে, শ্রোতাগণের মনও দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। সে বনভাগের নিস্তব্ধ পশু পক্ষী বা বৃক্ষলতা

ভিন্ন সে পবিত্র গীত শুনিবার লোক তথায় ছিল না। মানুষের স্বার্থপূর্ণ একটীও কর্ণ সে গান শুনিল না।

একেবারে কেহই যে শুনিল না, তাহাও নহে। মন্দিরপার্শ্বে তিন ব্যক্তি নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গম্ভীর গীত শ্রবণ করিতেছিল। সে তিন ব্যক্তি যে প্রকৃতিরই লোক হউক না, সকলের হৃদয় প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে একবার ঈশ্বরের মহিমা-গানের সহিত সংসারের সেই কার্য্যাড়ম্বরের কথা তুলনা করিল; ব্যাকুল অন্তরে আবার সেই গম্ভীর গীত শ্রবণ করিল। প্রীতির প্রবল অশ্রুতে দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল।

কতক্ষণ পরে গীত সাঙ্গ হইল। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর যোগীপুরুষ গাত্রোত্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া সেই অভ্যাগত তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া সাদরে যোগী তাঁহাদিগকে মন্দিরের চাতালে বসিতে আসন দিলেন। তিন জনে উপবিষ্ট হইলেন। বালিকারা মন্দিরের ভিতরেই রহিল।

যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিনীতভাবে বলিলেন 'মহাশয়, ইঁহাদিগের মুখে আপনার অলৌকিক গুণের কথা শুনিয়া দর্শন অভিলাষে আসিয়াছি। আমরা সংসারের অতি অকিঞ্চিৎকর কীটাণু; অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু উপদেশ দানে এ তৃষিত প্রাণকে পরিতৃপ্ত করুন।'

যোগীপুরুষ পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ধীরগম্ভীরকণ্ঠে ভাগবতের সেই সকল মহান্ অর্থপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। সে অমৃত-লহরীতুল্য জ্ঞান-কথায় শ্রোতৃবর্গের হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়া পড়িল। বৃদ্ধের শুষ্ক মূর্ত্তি, শীর্ণ দেহ, নিরানন্দ অবয়ব অথচ ঈশ্বরের নামানুকীর্ত্তনে নয়নদ্বয়ের সেই জ্যোতিঃপূর্ণতা দেখিয়া সকলের চিত্ত আরও দ্রবীভূত হইয়া গেল। সন্ধ্যা যাইয়া রাত্রি আসিল। কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া বৃদ্ধ ভাগবতের গভীর তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অবাক্ হইয়া সকলে তাহা শুনিতে লাগিল।

কতক্ষণের পর বৃদ্ধের সে ভাগবত ব্যাখ্যা শেষ হইলে, পূর্ব্ব প্রশ্নকারী আবার বলিলেন—"এত বয়স হইয়াছে, এমন শান্তির কথা কখন শুনি নাই।

ইচ্ছা করে, সমস্ত ছাড়িয়া এই সাধুসঙ্গ অবলম্বন করি। আপনার গুরু নিশ্চয় অসাধারণ ব্যক্তি। এ সমস্ত শিক্ষা কোথা হইতে হইল? মহাশয়, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমাদিগের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; যদি বাধা না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, সকলে চরিতার্থ হই।"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাস্য সুখের নহে, তাহাতে হৃদয়ের লুকান দুঃখের কথা পরিব্যক্ত হইল। যোগী বলিলেন—"পূর্ব্বের কথা স্মরণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। তাহা যে কখনও কাহাকে বলিতে হইবে এমন মনে ছিল না। কাহাকে বলিব? কে শুনিবে? দুঃখীর জন্য কে এক বিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিবে? জগতের বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়া নীরব হইয়া রহিয়াছি। সে সকল কথা স্মরণ করিয়া আর ফল কি?"

কথা শুনিয়া এনায়েত উল্লা ও চারুচন্দ্রের ঔৎসুক্য আরো বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা বলিলেন—"অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, মহাশয়ের ইতি-বৃত্ত শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।'

যোগী শুষ্ক মুখে আবার একটু হাসিলেন। অন্য কথা না পাড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কথা আরম্ভ করিলেন।——

"যে দেহ আজ ভস্মাচ্ছাদিত ও বল্কলভূষিত দেখিতেছেন, ইহা চিরকাল এমনই ছিল না, একদিন মহামূল্য মণিময় আভরণে ইহা শোভিত হইত। যে মস্তক আজ রুক্ষ জটাভারে আচ্ছন্ন, তাহাও একদিন মুকুটভূষিত ছিল। যে দেহ আজ কুশ-শয্যায় শুইয়া মহাসুখে নিদ্রা যায়, তাহা একদিন তুষার-ধবল কোমল শয্যায় শুইয়াও ক্লেশ অনুভব করিত। অসংখ্য দাসদাসীদ্বারা প্রতিনিয়তঃ পরিসেবিত হইয়াও মনে তৃপ্তি জন্মিত না। লালসা, ভোগাভি-লাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এক দিন এ হৃদয়কে তুষানলের ন্যায় জর্জরিত করিত। রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ক্রুর বৃত্তি সকল অনেক সময়ে জীবনমধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিত। বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেকেই ছিল। কত লোকে কত সময়ে কার্য্যসিদ্ধির জন্য অসার চাটুবাদে উপাসনা করিত। যোগী সাজিয়াই চিরদিন বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত না।

"যাহা হইত না, তাহা হইল কেন? জগতে কোন অবস্থাই চিরদিন একভাবে যায় না। পুরাণে এ সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান আছে। জগতের স্বার্থপরতার কার্য্যক্ষেত্র বড় ভয়ানক স্থান। এখানে পুত্র পিতাকে মানে না, পত্নী স্বামীর জন্য ভাবে না, ভ্রাতা ভ্রাতার মুখ দেখে না, বন্ধু বন্ধুর বিদ্বেষী হয়, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করে। আশ্চর্য্য! এই ভয়ানক স্বার্থ-পরতা যে সাধন করিতে পারে, জগতে তাহারই মান, তাহারই সম্ভ্রম, সেই সকলের পূজনীয়! স্বার্থপরতাব কঠোর আঘাতে পড়িয়া সুখ বল, ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বল, রাজ্য ধন বল, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বল, সকলেই বিনষ্ট হইল। জীবন পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। জানি না, কি ভাবিয়া ঈশ্বর এ পাপীর পাপজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সব দুঃখের কাহিনী কি বলিব?

"*কলনাদিনী সুক্ষাবতীর প্রসন্ন-সলিলসিক্ত চন্দ্রপুর নগর এক দিন* এ হতভাগ্যের রাজধানী ছিল। চন্দ্রনাথের স্তব করিয়া একদিন অনেক ব্যক্তি সেই রাজসংসারে প্রতিপালিত হইত। সে সব কথা গোপনীয় নহে, তাহা বাঙ্গালার অনেকেই বিদিত আছেন। চন্দ্রনাথের শৌর্য্য, বীরত্ব দেখিয়া একদিন অনেকে প্রশংসা করিত, অনেকে বা তাহার জন্য তাঁহাকে হিংসা করিত। প্রশংসায় বা নিন্দাবাদে কিছুতেই চন্দ্রনাথ বিচলিত হইত না। যথা সময়ে চন্দ্রনাথের এক পুত্র ও কন্যা হইল। তাহাদিগের গর্ভধারিণী কিছুদিনের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। লোকের মন্ত্রণায় পড়িয়া চন্দ্রনাথ আবার বিবাহ করিল। স্বর্গীয় মহিষী তাহা দেখিয়া বুঝি তাহার উপর কোপ প্রকাশ করিলেন। সেই দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ হইতে চন্দ্রনাথের ভাগ্য-পরিবর্ত্ত আরম্ভ হইল।

"এক দিন একটী অনাথ বালক আসিয়া চন্দ্রনাথের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। বালক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু সেই বয়সেই তীক্ষবুদ্ধি-শালী। চন্দ্রনাথ তাহাকে আপন গৃহে স্থান দিলেন। অতি সামান্য রাজপদ হইতে কালে সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। চন্দ্রনাথ তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কোন কথাই তাহার নিকট গোপন রাখিতেন না, রাজকার্য্যের অনেক ভার তাহার উপর ন্যস্ত রাখিয়াই

নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অন্তরে কি ছিল জানি না, সে প্রভুকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। চন্দ্রনাথ কালসর্প পুষিতে লাগিলেন।

"মোগল পাঠানে যুদ্ধ বাধিল। দিল্লীশ্বরের নিয়োগে মোগল সৈনের সহকারী সেনাপতি হইয়া চন্দ্রনাথ মন্ত্রীসঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সে যুদ্ধের কথা কি বলিব? তাহা বাঙ্গলার অনেকেই জানে, সে যুদ্ধে চন্দ্রনাথ না থাকিলে মোগলের জয় হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই যুদ্ধের পর চন্দ্রনাথ আর গৃহে ফিরিল না। সকলে জানিল, চন্দ্রনাথ গোপনে শিবির মধ্যে হত হইয়াছে। সে কথা ভুল। চন্দ্রনাথ হত হয় নাই। চন্দ্রনাথ আজও জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু সকল হারাইয়া, সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেন তাহার দেহে পোড়া প্রাণ রহিয়াছে তাহা ঈশ্বরই জানেন। ঈশ্বর জানেন, কেন তিনি তাহাকে সে বিশ্বাসঘাতকের খড়্গ হইতে সে সময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"সাধে বলিতেছিলাম, স্বার্থপরতা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ? যে অনাথ বালক আশ্রয় অভাবে পথে পথে বেড়াইতেছিল, তারপর যাহার কৃপায় আশ্রয় পাইয়া শেষ মন্ত্রীত্ব পর্য্যন্ত পাইল; সেই ভৃত্য গোপনে রাত্রিযোগে চন্দ্রনাথের শিবিরে গিয়া তাহার সেই প্রভুকে বধ করিতে খড়্গ আঘাত করিয়াছিল। দৈবাৎ সে শিবিরে সে রাত্রে চন্দ্রনাথ শয়ন করেন নাই, একজন সৈনিক তথায় শুইয়াছিল; হতভাগ্য দৈবযোগে প্রাণ হারাইল। বিশ্বাসঘাতক প্রভু-হত্যার পর দৌড়াইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে চন্দ্রনাথ কার্য্যান্তর হইতে শিবিরে আসিতেছিলেন, অন্ধকারে সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। চন্দ্রনাথ ও কোন কথা না বলিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তারপর যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বক্ষঃ শুখাইয়া গেল। সকল কথা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য বুঝিলেন। বুঝিলেন, সে বিশ্বাসঘাতক প্রভুহন্তা—ভূপেন্দ্রনারায়ণ।"

কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত হইলেন। এনায়েত যোগীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চারুচন্দ্রের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য জলিয়া উঠিল। অতীত কাহিনী সকল স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় আকুলিত হইতে

—লি—

যোগীপুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন—

"চন্দ্রনাথ সেই মুহূর্ত্ত হইতে সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া সেই রাত্রি-যোগেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। প্রথম কতদিন হৃদয় শান্ত হয় নাই, কতদিন বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তির ভীষণ বহ্নি চুপে চুপে দগ্ধ করিয়াছে; কতদিন সংসারের মায়া মোহ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ হৃদয়ের বলে সকল প্রলোভন কাটাইলেন। কিন্তু ছয়মাস বনে ঘুরিয়াও পুত্রকন্যার মায়া ভুলিতে পারিলেন না। একবার তাহাদিগের মুখ দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। ছদ্মবেশে এক দিন চন্দ্রপুরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। শুনিলেন, বিশ্বাসঘাতক ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে বসিয়াছে, অল্পবয়স্কা মহিষীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, পুত্রকন্যার উদ্দেশ নাই, তাহার অত্যাচারে তাহারা পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। চন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া সাধের রাজধানী হইতে চোরের ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

"তারপর চন্দ্রনাথ আর রাজ্যমুখে গমন করে নাই! তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া কাল হরণ করিতেছে। ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আর মনে স্থান পায় না। কেবল সেই পুত্রকন্যার চিন্তা দুই একবার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করে। কত অন্বেষণ করিয়া তথাপি তাহাদিগের সাক্ষাৎ মিলে নাই। কতদিনের পর দয়াময় দয়া করিয়া কন্যার দেখা মিলাইয়াছেন। হৃদয়ের ঘোর দুঃখে হতভাগিনী মহিষী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছিল; তাহারও জীবনের শেষ কার্য্য ফুরাইয়াছে। উন্মাদিনীর প্রতিহিংসানলে পড়িয়া ভূপেন্দ্রের পাপ ভার হইতে এ পৃথিবী মুক্ত হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে হতভাগ্য আর কিছুরই বাসনা রাখে না, কেবল সেই কন্যার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া-পুত্র মুখ দেখিতে দেখিতে পাপ জীবন পরিত্যাগ করে ইহাই তাহার শেষ ইচ্ছা। জগদীশ্বর এ ইচ্ছা কি পুরাইবেন না? হতভাগ্য আর কি চারুর সে মধুর মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবে না?"

যোগী আর বলিতে পারিল না। দর দর ধারায় তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া

গেল। স্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিল। দেখিতে২ ছিন্ন তরুর ন্যায় সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতর হইতে বালিকা-কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উঠিল। স্থির হইয়া চারুচন্দ্র সে স্বর শুনিল। অনেক দিন—অনেক দিনের পর আবার সেই স্বর! চারুর মাথা ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে সমস্ত জগৎ শূন্যময় বলিয়া বোধ হইল। আর চারু স্থির হইতে পারিল না, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে 'পিতঃ' বলিয়া যোগীপুরুষের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল।

—:—

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ মিলন।

TUTTI. (*con gioia*) Giunta el' ora del piacer,
Non si pensi che a goder.
MARTA—an Italian opera.

অচিরাৎ বনভূমি আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করিল। শোকের অশ্রুর পরিবর্ত্তে সকলের চক্ষু আনন্দের অশ্রুতে প্লাবিত হইতে লাগিল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যোগীবেশী চন্দ্রনাথ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহার আদরের পুত্র চারুচন্দ্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। আদরে পুত্রকে তুলিয়া শত শত বার তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, অশ্রুর প্রবল ধারায় গণ্ডস্থল ভাসিতে লাগিল। চারুর সঙ্গীদ্বয় অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্দিরের ভিতর হইতে দুইটি বালিকা এই দৃশ্য দেখিতেছিল; একজন সম্বোধন করিয়া বলিল—"বৌ—ও বৌ, ঘুমুলি নাকি?" অন্য জন উত্তর করিল—"মরণ আর কি, এ আবার কি ঠাট?"

"সত্যি, আমি যে লো তোর ননদিনী; চল্ ভাই, তুই যার জিনিষ, তার হাতে সঁপে দিয়ে আসি।" গিরিবালা আদরে একবার সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সুহাসের চক্ষুর্দ্বয় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িয়া মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে। গিরিবালা কি বলিতে

যাইতেছিল। বলা হইল না। শুনিল, চারুর দ্বিতীয় সঙ্গী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; তাঁহাকে স্বান্তনা করিবার জন্য সকলে মিলিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। স্থির হইয়া গিরিবালা সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। এ কি!—এ যে সেই জমিদার! সেই সুহাসিনীর পিতা সতীশচন্দ্র! চারুচন্দ্র পিতার নিকট, এনায়েত উল্লার নিকট সতীশচন্দ্রের অসীম স্নেহ, ভালবাসা, এবং পুত্র-বৎসলতার পরিচয় দিতেছেন; কেমন করিয়া তিনি তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, কত স্নেহ ও যত্নের সহিত পুত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, কি প্রকারে তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য বিদায় ভিক্ষা লইয়াছিলেন—একে একে চারু সে সকল কথা বিবৃত করিতেছিলেন, আর সতীশচন্দ্র ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতেছিলেন। চারু নিজের কথা শেষ হইলে, ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুহাসিনী এখন ভাল আছে তো?" সে কথায় সতীশচন্দ্রের শোকবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ছাড়িয়া উঠিলেন। চারুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি যে দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছ, সেই দিন হইতেই মা আমার দিন দিন বিষাদে মলিন হইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতাম। কত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম, কি জানি কি রোগ ধরিল, কিছুতেই সারিল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আমার আর মন ছিল না; সর্ব্বদাই সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করিতাম। এক দিন ঈশ্বর তাঁহার একটি সঙ্গিনী যুটাইয়া দিলেন। আহা! সে বালিকার কি সুন্দর রূপ, কি মধুর স্বভাব! মা আমার দিবারাত্রি তাহারই সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু, হায়! বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এখন তাই পরিতাপ করিতেছিলাম, সে কুহকিনী সর্ব্বনাশীকে কেন আশ্রয় দিয়াছিলাম? কেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম? আজ কয় মাস তাহার সঙ্গে মা আমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে, বাবা, আমার আর কে আছে? কার মুখের দিকে চাহিব? সুহাসিনী, তোর মনে এই ছিল মা? ওঃ—" বৃদ্ধ সতীশচন্দ্র আবার স্ত্রীলোকের ন্যায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গিরিবালা নিঃশব্দে এ সকল কথা শুনিতেছিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। একবার সুহাসিনীর প্রতি চাহিল; দেখিল, বালিকা উন্মত্তের ন্যায় নীরবে রোদন করিতেছে। গিরিবালার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। লজ্জাভয় থাকিল না। তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া সতীশচন্দ্রের চরণের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"পিতঃ আমি অবোধ বালিকা, না বুঝিয়া শুনিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার অন্তঃকরণে বড়ই কষ্ট দিয়াছি; ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন। আপনার কন্যার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, তিনি এই মন্দিরের মধ্যেই আপনার চরণ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। গিরিবালা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর অশ্রু প্রবাহে রুদ্ধ হইয়া আসিল। উপস্থিত সকলে সে কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া সকলে সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন—ধীরে ধীরে ধীরে একটি বালিকা সতীশচন্দ্রের চরণের উপর মাথা রাখিয়া অজস্র ধারে রোদন করিতে লাগিল। চারু চিনিলেন—সুহাসিনী!

তখনও প্রভাত হয় নাই, তখনও দোয়েল প্রথম ডাক ডাকে নাই, গিরিবালা চারুচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দাদা, আবার যে কখন এমন সুখের মিলন হইবে তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু এখনও এ সুখসম্মিলনের কিছু বাকি আছে। দাদা, আজ কয়মাস ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি, স্ত্রীলোকে যে এত ভাল বাসিতে পারে তাহা ইহার পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। সুহাসিনী বালিকা, কিন্তু সে বালিকার হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভালবাসা। এ ভালবাসার কি প্রতিদান করিবে না? তুমি দাঁড়াও, আমি সুহাসিনীকে আনিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া যে সুখের মিলনটুকু বাকি আছে তাহা পুরাইয়া চক্ষু সার্থক করি।"

অনেকক্ষণ চারু নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ মাথা টিপিয়া স্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তপ্ত রক্তের খরস্রোতঃ বহিল। কতক্ষণ পরে বিকৃত স্বরে চারু বলিল—"ভগ্নি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে, এত দিনে তোমার সহিত মিলন হইয়াছে। এ

মিলনে আমার সুখের সীমা নাই। ইহাপেক্ষা অন্য সুখের মিলন আর আমি চাহি না। সুহাসিনী আমাকে ভাল বাসেন, আমি সে জন্য অকৃতজ্ঞ নহি। ঈশ্বর তাঁহাকে সুখে রাখুন।"

চারুচন্দ্রের কথা শুনিয়া গিরিবালা স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া বলিল—"দাদা, ছোট্ট ভগ্নীর দোষ লইও না, তুমি জান না অথবা জানিলেও জানিতে চাহ না; বালিকা যে জীবন তোমার জন্য রাখিয়াছে, তুমি তাহা পায়ে ঠেলিলে সে জীবন রক্ষা পাইবে না। আমি সুহাসিনীকে লইয়া আসি; তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুখী কর।"

চারু বলিলেন—"তুমি বালিকা—তুমি জান না, সুহাসিনী পরস্ত্রী। পর-স্ত্রীকে লইয়া তুমি একথা বলিতেছ কেমন করিয়া ?

গিরিবালা চমকিয়া উঠিল। বলিল—"পরস্ত্রী !—কোথায় শুনিলে ?—কে বলিল ? সুহাসিনীর হৃদয়ে চারুচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের কথা স্থান পায় নাই। কখন স্থান পাইবে না। এ সর্ব্বনেশে ভ্রম পরিত্যাগ কর।"

চারু বলিল—"শৈলবালাকে মনে পড়ে ? আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি, বিনোদবাবুর সহিত সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

গিরিবালা মুহূর্ত্তের জন্য শীহরিল। বলিল—"যে কাহারও মুখে শুনিলেই কি তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে ?"

চারু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল—"অন্য কাহার ও কথা বিশ্বাস না করিতে পারি, কিন্তু আপনার চক্ষুকেও কি অবিশ্বাস করিতে বল ? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সুহাসিনী বিনোদের পদতলে পড়িয়া লুটাইতেছে। স্ত্রী না হইলে একজন পরপুরুষের পায়ে কে লুটাইতে পারে ?"

গিরিবালা আর কথা কহিল না। দুঃখের প্রবল বেগে বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আপনাকে মনে মনে সহস্র ধিক্কার দিল। আর কথা কহিতে পারিল না। দর্শকমণ্ডলী বালিকার নিরাশ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। সতীশচন্দ্র এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই; এক্ষণে চারুচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর জানেন, সুহাসিনী অপেক্ষা তোমায় কত স্নেহ করি। এ বৃদ্ধ বয়সে সুহাসিনীকে যদি আবার পাইয়াছি, তোমার হাতে দিতে পারিলে, সকল সাধ পূর্ণ হইবে। সে সাধে কেন বাদ সাধিতেছ ?

না জানিয়া বালিকার চরিত্রে কেন অযথা দোষারোপ করিতেছ?"

চারুচন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন তাহার হৃদয় চিন্তার তুমুল ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। চারু নির্বাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে গিরিবালা আবার কথা কহিল। বলিল—"যাহাই বল, দাদা, তুমি সুহাসিনীকে পরিত্যাগ করিতে পার না। একদিন গঙ্গার তীরে পর্ণকুটীর মধ্যে শুইয়া একটী যুবকের নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জীবনদাতাকে যে আজীবন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা কি মনে নাই? দাদা, যে যুবক সেই গঙ্গার প্রচণ্ড তরঙ্গ হইতে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল—সে সেই সুহাসিনী।"

সেই দণ্ডে যদি সেই বনভূমে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও চারু তত বিস্মিত হইত না। গিরিবালার কথা শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—"তুমি কি বলিতেছ?"

"সুহাসিনীর নিকট তুমি বিশেষ ঋণে বদ্ধ, সুহাসিনী কোনও অংশেই তোমার পরিত্যজনীয়া নহে, তাহাই বলিতেছিলাম।"

চারু একবার সেই যুবকের মুখ স্মরণ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কতবার সুহাসিনীর কথা মনে পড়িয়াছিল তাহাও স্মরণ হইল। চারু অবাক্ হইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে বলিলেন—"মানিলাম, ছদ্মবেশে সুহাসিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। মানিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সে জন্য তাঁহাকে আজীবন ভাল বাসিব। কিন্তু সুহাসিনী অন্য যুবকের সঙ্গে একত্রে এক শয্যায় বাস করিতেন। আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহাকে হৃদয়ার্দ্ধভাগিনী করিব কেমন করিয়া?"

গিরিবালার অধরে এতক্ষণ পরে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। বলিল—"সে ভ্রমও ভাঙ্গিতেছি, একটু অপেক্ষা কর—আমি সেই যুবককে ডাকিয়া আনি। সুহাসিনীর ন্যায় যুবকেরও চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" গিরিবালা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। অবাক্ হইয়া সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে সুহাসিনীকে লইয়া একটী যুবক সেইখানে আসিয়া উপ-

স্থিত হইল। চারুচন্দ্র তাহাকে চিনিলেন। যুবক আসিয়া হাসিতে হাসিতে চারুর হস্ত ও সুহাসিনীর হস্ত একত্রে ধারণ করিয়া বলিলেন—"ভাই, তোমার সকল কথা শুনিলাম। সুহাসিনী আমার ভগ্নী, আমাকে লইয়া তাহার নামে দোষ দিও না। অমন দেবীপ্রকৃতির স্ত্রীলোক আমি কখন দেখি নাই। একবার আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সুহাসিনীকে আজীবন ভাল বাসিবে; এখন আমার হস্ত হইতে সুহাসিনীর হস্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী কর।"

চারু কোনও কথা কহিল না। নীরবে মাটী-পানে চাহিয়া রহিল। তখনও সুহাসিনীর হস্ত চারুর হস্ত মধ্যে অবস্থিত ছিল; সুহাসিনী মাটী পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষে তখনও জলধারা বহিতেছিল, সেই কোমল করস্পর্শে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; ভয়ে, চিন্তায়, মনের দুঃখে এক গা ঘামিয়া ফেলিল। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া সেই যুবক আবার বলিল! "ছিঃ ভাই, এখনও তোমার অবিশ্বাস!" মুহূর্ত্তমধ্যে যুবকের বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। চমৎকৃত হইয়া সকলে দেখিল —গিরিবালা।

আর আনন্দের সীমা রহিল না। চারি দিকে আনন্দের উচ্চ কোলাহল উঠিল। তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল, বনের পাখী উচ্চ ঝঙ্কার দিয়া আনন্দের গীত গায়িল। সূর্য্য পৃথিবীময় আনন্দের রশ্মি ছড়াইয়া দিল। সেই আনন্দমিলনের মধুর প্রভাতে জগৎ বনভূমি আনন্দভূমি হইয়া উঠিল।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সুখ না দুঃখ?

অদ্য বন্ধুবান্ধব সনে আহ্লাদিত আলাপনে,
কল্য তাদের অদর্শনে শোক সন্তাপিত মন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

মানুষের সুখ! তুই কেন আসিস্—কেন যাস্? মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গে

তুলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আবার কেন হতভাগ্যকে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিস্‌? সুখের অভাবে দুঃখ আছে সত্য; কিন্তু দুঃখই যদি দুঃখের পরিণাম হইত, তাহা হইলে আর এত খেদ থাকিত না, এত জ্বালা যন্ত্রণা ভুগিতে হইত না। অন্ধকারের মাঝে যদি বিদ্যুৎ না খেলিত, তাহা হইলে বুঝি সে অন্ধকার এত ভীষণ দেখাইত না। সুখ যখন দুই দণ্ড বই থাকিবে না, তখন সুখের সৃষ্টি কেবল মানুষের যাতনার জন্য। এ যাতনা-বাড়ান সুখের সৃষ্টি কোন বিধাতা করিয়াছিল? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে অনল শিখায় পড়িয়া ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া শূন্য দিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু দেখিতে দেখিতে রবিকর-স্পর্শে শুখাইয়া যাইবে তাহার আবার হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার কেন? যে মানুষ জন্মিবার সময় আত্মীয়বর্গের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেও দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছে, আবার মরিবার সময় যে দুঃখের কান্না কাঁদে, দুঃখের জন্যই যাহার এই মনুষ্য-জন্ম, তাহার আবার ক্ষণকালের নিমিত্ত সুখভোগের চেষ্টা কিসের জন্য? দুঃখের সংসারে সুখ কেন? কে বলিবে কেন?

সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়; দেখিতে দেখিতে সে সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। এনায়েত উল্লা কি সতীশচন্দ্র কেহই কোথায়ও গমন করেন নাই। আনন্দমিলনের দিনে সকলে আনন্দে সেই একই কথা বারবার আলোচনা করিতেছেন। দিন যাইয়া কোথা দিয়া যে সন্ধ্যা আসিবার উপক্রম হইল, তৎপ্রতি কাহারও মনোযোগ ছিল না। সহসা সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া চন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। পূতশরীর হইয়া সেই আনন্দের জন্য সদানন্দের স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। সে স্তোত্রপাঠ শুনিয়া যুগপৎ সকলের হৃদয়ে প্রেম-পারাবার উথলিয়া উঠিল। ঐহিকের সকল কামনা ভুলিয়া গিয়া তখন সকলে মিলিয়া সেই বৃদ্ধের সঙ্গে প্রেমগানে যোগ দিলেন। সেই গীতশব্দে তাবৎ বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে গান যাহারা গায়িল, তাহারা স্বর্গীয় প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িল; যাহারা সে গান শুনিল, তাহাদের হৃদয়ে প্রেম ও উল্লাসের অনন্ত তরঙ্গ ছুটিল।

সহসা ঘোর চীৎকারে সে গীতধ্বনি ডুবিয়া গেল, সহসা চীৎকারের বিরাট শব্দে সে কাননখণ্ড আকুলিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া সকলে পশ্চাতের দিকে চাহিল। দেখিল—উন্মাদ! উন্মাদবেশে এ কে? যাহারা তাহাকে চিনিত, তাহারা চিনিল—বিনোদ! এনায়েত বিনোদকে বিশেষ জানিতেন না; বিনোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি শান্তিরক্ষক দৌড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহারা এনায়েতকে দেখিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"জাঁহাপনা! বন্দী পলাইয়াছে, পাগল হইয়া যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়াছে কেহই তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না। আমাদের——"

এই সময়ে এনায়েত একবার সম্মুখে চাহিলেন, চাহিবা মাত্র যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ রক্ষকদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। রক্ষকেরা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। এনায়েত দেখিলেন, সেই উন্মাদ নিস্পন্দভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহার পদতলে পড়িয়া গিরিবালা লুণ্ঠিত হইতেছে। বালিকার চক্ষের জলে সে পদতল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে, উন্মাদ একটিও কথা কহিতেছে না। স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চক্ষুঃ স্থির, তাহাতে পলক পড়িতেছে না, নিশ্বাসও বুঝি বহিতেছিল না। মস্তকের একটীও কেশপর্য্যন্ত নড়িতেছে না, সর্ব্বাঙ্গ স্থির, নিস্পন্দ, অসাড়। সে মূর্ত্তি দেখিয়া এনায়েত হৃদয় মধ্যে চমকিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় উন্মাদ ভূতলে পড়িয়া গেল। বালিকা উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদের মাথা লইয়া আপনার ক্রোড়ের উপর রাখিল। "গিরিবালা—গি-রি!" আর কথা সরিল না, জিহ্বা জড়াইয়া গেল, চক্ষের তারা কপালে উঠিল, স্থির হইয়া সেই তারা কপালের উপর জ্বলিতে লাগিল। ডাক ছাড়িয়া গিরিবালা কাঁদিয়া উঠিল। "প্রভো—স্বামিন্" এত ডাকিল, কেহই আর সে ডাকের উত্তর দিল না। সতী সাধ্বীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে বিনোদ সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সুখের পরিবর্ত্তে সে বনভূমি দুঃখের মূর্ত্তি ধারণ করিল। বালিকার করুণ বিলাপধ্বনিতে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল। সকলেই অশ্রু জলে ভাসিতে লাগিল। বালিকাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য

সকলে কত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; বালিকার হৃদয় কিছুতেই স্বান্তনা মানিল না, স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া সেই একই ভাবে চীৎকার ছাড়িতে লাগিল। গিরিবালার সহিত বিনোদের যে সম্বন্ধ তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ ঘটিল তাহা কেহই জানিল না। সুহাসিনী তাহা জানিত, গিরিবালার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছিল; সুহাসিনী কাঁদিয়া তাহা চারুচন্দ্রকে বলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চারুচন্দ্র তাহা সকলকে জানাইলেন। বালিকার অদ্ভুদ্ স্বামীভক্তির কথা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। সে কথায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ কন্যার সকল অবস্থা অবগত হইয়া বারম্বার কপালে কর হানিতে লাগিলেন। কে কাহাকে বুঝাইবে? সকলেই শোকে নিতান্ত অধীর, গিরিবালার জন্য সকলেই হাহাকার শব্দ করিতেছে। সতী সাধ্বীর জন্য শোক না করিয়া কে থাকিবে?

ক্রমশঃ রজনী গভীর হইয়া আসিল। কাঁদিয়া কাদিয়া ক্রমশঃ বালিকা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। স্বামীর মৃতদেহের উপর মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধভাবে গিরিবালা পড়িয়া রহিল। তাহা দেখিয়া অন্য সকলে অনেকটা নিরুদ্বেগ হইল। সকলে ভাবিল, কাঁদিয়া কাদিয়া বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এই আশঙ্কায় চুপে চুপে সকলে তাহার উদ্দেশে অনেক দুঃখের কথা কহিতে লাগিল। ক্রমেই রাত্রি আরও গভীর হইয়া আসিল। সকলেরই শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই খানেই কেহবা শুইয়া কেহবা বসিয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। বিরামদায়িনী নিদ্রা তাহাদিগের শোক-সন্তাপদগ্ধ দেহে পদ্ম হস্ত বুলাইয়া শীতল করিতে লাগিলেন। গম্ভীর নিশায় প্রকৃতি গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

অকস্মাৎ দূর বিলাপ সঙ্গীতে ঘুমন্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল। সে বিলাপের শব্দ শুনিয়া যুগপৎ সকলে অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত গাত্রোত্থান করিল। দেখিল—সর্ব্বনাশ! গিরিবালা সে স্থানে নাই। দূরে—দূরে যে করুণ স্বর শুনা যাইতেছে, ইহা তাহারই কণ্ঠস্বর, আর কেহ স্থির থাকিতে পারিল না, উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকে সকলে দৌড়াইয়া চলিল। দূর—দূর

—আরও দূরে সে বিলাপধ্বনি, আরও দূরে তাহারা দৌড়াইয়া চলিল। সম্মুখেই ভাগীরথী বিশালবক্ষঃ বিস্তার করিয়া নিস্তব্ধভাবে প্রবাহিত হইতেছে। একটি বালিকামূর্ত্তি নৈরাশ্যের ভীষণ চীৎকার ছাড়িতে ছাড়িতে সেই ভাগীরথী-তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র সকলে সেই দিকে দৌড়িল। আর বালিকাকে দেখা গেল না। নিস্তব্ধ জাহ্নবীবক্ষে একটী পতন-শব্দ হইল। তীরে দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টে সকলে সেই দিকে চাহিল। গঙ্গার জলে একটী বৃত্তরেখা দেখা গেল; দেখিতে দেখিতে জলের বৃত্ত জলে মিশাইয়া গেল। ভাগীরথী নিস্তব্ধভাবে আবার তেমনই বহিয়া চলিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও কণ্ঠ হইতে একটীও কথা উচ্চারিত হইল না। শোকে, দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় রুদ্ধ কণ্ঠে চারু ডাকিল—"গিরিবালা! গিরিবালা!" আর কোন গিরিবালাই সে ডাকের উত্তর দিল না।

—:—

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

To sum the whole—the close of all.

Dean Swift.

এত দিনের পর উপাখ্যান শেষ হইয়া আসিয়াছে। এ উপাখ্যানের যাহারা প্রধান নায়ক নায়িকা তাহাদিগের সকলের বিষয় বলা হইয়াছে। ভূপেন্দ্র তাহার দুষ্কৃতের প্রতিফল পাইয়াছে, রাজমহিষীর প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে, বিনোদ আপনার কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়াছে, শৈলবালার নাম আর এ জগতে কেহই শুনিতে পায় না; গিরিবালা প্রাণ দিয়া আপনার প্রেমব্রতের উদ্যাপন করিয়াছে; গঞ্জালে যে চক্ষু বুজাইয়াছিল, সে চক্ষু আর খুলিল না; রডরিগের আর কোন উদ্দেশই মিলে না; পোর্ত্তুগীজদিগের সকল হাঙ্গামা নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। সতীশচন্দ্র আপনার হারা কন্যা পাইয়াছেন, চন্দ্রনাথ পুত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র বালিকার বিষয় চিন্তা করিয়া সকলে শোকার্ত্ত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও দুঃখের কারণ আর নাই। চারুচন্দ্রেরও তাহা ভিন্ন অন্য কোন দুঃখের কারণ ছিল না; কেবল মাঝে মাঝে একটী চিন্তা হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া তাহাকে জর্জরিত

করিত। চারু এক দিন কাসিম খাঁর নিকট হইতে বিদ্রোহী বলিয়া তাড়িত হইয়াছিল, চারু কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে যে, সে বিদ্রোহী নহে। এনায়েত উল্লা চারুকে সে চিন্তা ছাড়িতে বলিলেন; তিনি তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন। চারু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

যথা সময়ে এনায়েত উল্লার সঙ্গে সকলে মিলিয়া ঢাকায় সুবাদারের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দের অশ্রু মোচন করিয়া কাসিম খাঁ বিজয়ী পুত্রকে কোল দিলেন। এনায়েত ধীরে ধীরে সকলের পরিচয় প্রদান করিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা পিতার সমক্ষে বিবৃত করিলেন। গঙ্গালের সহিত ভূপেন্দ্রের যে ষড়যন্ত্র চলিত, সাবধানে এনায়েত তাহার পত্র গুলি হস্তগত করিয়াছিলেন। যে পত্রখানি শৈলবালা প্রথম চারুকে লিখিয়াছিল, ঘটনাক্রমে যাহা রোস্তমের হাতে গিয়া পড়ে, এনায়েত সে পত্র খানিও রাজগোচরে দেখাইলেন। কাসিম খাঁ অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সমস্তই তাঁহার চক্ষে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আনন্দে চারুকে ক্রোড় প্রদান করিলেন। চন্দ্রনাথ এবং সতীশচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। সকলের হৃদয়ে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

মোগলদিগের সময়ে হিন্দু মুসলমানে বিলক্ষণ সখ্যতা ছিল। কাসিম খাঁ হিন্দুরাজাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন, তাঁহাদের সুখ দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। এই সুখের দিনে সহানুভূতির প্রণোদনায় কাসিম খাঁ পিতাপুত্রে সকলকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রপুর নগরে গমন করিলেন। সে দিন সে নগরের কি শোভা হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? চন্দ্রপুরের রাজভবনে আজ বাঙ্গালার প্রতাপান্বিত সুবাদার পিতাপুত্রে অতিথি। নিরুদ্দিষ্ট রাজা আজ পুত্র সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিয়া সেই সিংহাসনে আবার বসিয়াছেন। জমিদারশ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্রের কন্যা সুহাসিনীর সহিত আজ চারুচন্দ্রের বিবাহ। প্রজাদিগের সে আনন্দের কথা কে বর্ণনা করিবে? মহাসমারোহে শুভ বিবাহ হইয়া গেল। চারুচন্দ্র সুহাসিনীর হইল। সুহাসিনী চারুচন্দ্রের হইল। আনন্দ-তরল তরঙ্গ তুলিয়া স্বচ্ছা-বতী মঙ্গলগীত গায়িল।

কাসিম খাঁ ও এনায়েত উল্লা ঢাকায় ফিরিলেন। চন্দ্রনাথ সমস্ত প্রজাকে ডাকিয়া সকলের মত গ্রহণ করিয়া সকলের সমক্ষে চারুচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়া আবার বন-গমনে উদ্যোগী হইলেন। প্রজারা কাঁদিয়া অনেক নিষেধ করিল। চন্দ্রনাথ তাহা শুনিলেন না, পুনরায় যোগী সাজিয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সতীশচন্দ্র আপন জমিদারী জামাতাকে অর্পণ করিয়া সেই সঙ্গেই বন গমন করিলেন। কখনও দিনাজপুরে কখনও চন্দ্রপুরে এইরূপে চারুচন্দ্র ও সুহাসিনী পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই সে দুঃখিনী গিরিবালার নিদারুণ কথা ভুলিতে পারিল না।

সকলের কথাই হইল, কিন্তু বিবিজান? বিবিজান কোথায় গেল? তাহার সে 'মনোমত-ধন' রোস্তম কোথায়? যথানিয়মে এক দিন তাহাদিগের 'নিকা' হইয়া গেল। নিকার দিন বিবিজানের গলায় এক ছড়া মহামূল্য হার দেখিয়া অনেকের মতিয়া বেগমের কথা মনে পড়িয়াছিল; অনেকে তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। রোস্তম তাহার 'জানিকে' বড়ই পেয়ার করিত; বিবিজানও তাহার 'দোস্ত'কে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। সন্ধ্যা'র সময় দুইজনে দুইজনের গলা ধরাধরি করিয়া সেই সেনাপতি ও মতিয়া বেগমের গল্প করিয়া অনেক সময় কাটাইত। হাসিতে হাসিতে একদিন বিবিজান বলিয়াছিল—"কৈ, দোস্ত, হানিফের মাকে ত্যাগ করিলে না?" রোস্তম সেই দিনই তাহার প্রথমা স্ত্রীকে গৃহের বাহির করিয়া তাড়াইয়া দিতে গিয়াছিল। বিবিজান তাহা করিতে দিল না। কথায় কথায় সেই কথা উল্লেখ করিয়া বিবিজান সর্ব্বদাই বলিত—"পুরুষ-দিগকে বিশ্বাস নাই। যাহারা বিনা দোষে একজনের কথায় অন্য জনকে তাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাদিগকে কে বিশ্বাস করিবে? পুরুষজাতি বড়ই নিষ্ঠুর—বড়ই বিশ্বাসঘাতক!"

সমাপ্ত।

কালসিন্ধু।

ইটালিয়ান "সনেটের" প্রণালী-অনুক্রমে

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

অতল সাগর! বর্ষের তরঙ্গ তুলি
অবিশ্রান্ত একভাবে ধাইছ কোথায়?
শোকের উচ্ছ্বাস-বাহি ক্ষুদ্র বীচিগুলি
মানবের বুক-ভাঙা অশ্রুরাশিময়,
তাই বুঝি লবণাক্ত হেন? এত ধূলি
মনের মালিন্য-মাখা হেতু? ধূমময়
চারিদিক, নাহি কূল—অকূল পাথার,
অনন্ত ধূম্রল শূন্যে গিয়াছে মিশা'য়ে;
জীবনের বৃন্ত ছাড়ি ফুল মনোহর
রাশি রাশি ভাসে কত লহরী-হৃদয়ে!
করাল উজান ভাঁটি, ডাক ভয়ঙ্কর,
দুরন্ত ঘূর্ণার বায়ু সদা করে খেলা,
আঁখি পালটিতে তরি যায় তলাইয়ে!
কালসিন্ধো! তব জলে কে ভাসা'বে ভেলা?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বিজ্ঞান দর্পণ।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। সম্পাদক শ্রীপ্রাণানন্দ কবিভূষণ। আমরা ইহার চারি সংখ্যা পাইয়াছি। চারি সংখ্যা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, এতদিনে বাঙ্গালী চিন্তাশীল হইতে শিখিয়াছে, বাঙ্গালী আপনার ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া প্রকৃত

প্রবন্ধটীতে চিন্তাশীলতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞান বিষয়ে সম্পাদকের অধিকার আছে। এতদিনের পর তিনি আমাদের যে অভাবটী পূরাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। বাঙ্গালায় এইরূপ রাজনীতি শাস্ত্রপূর্ণ কোনও সাময়িক পত্র লিখিয়া কেহ কি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিতে পারেন না?

A New Letter Writer—by Jagan Nath, Delhi—পাঠ করিয়া দেখা গেল, এ খানি সাধারণের পক্ষে অতি উপাদেয় এবং উপযোগী হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার পত্র-লিখন-পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী 'কাউপার' প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখকদিগের এক একখানি পত্র অতি বিচক্ষণতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দৈনিক সংসার হিসাব হইতে আরম্ভ করিয়া সদাগরি আপিষের 'বুক কিপিং' পর্য্যন্ত সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইযাছে। সংগ্রহকার যে এ পুস্তকখানির জন্য বিশেষ খাটিয়াছেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রধানতঃ কেরাণী মহলে ইহা বিশেষ আদর পাইবার যোগ্য।

রামের বনবাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। মহর্ষি বাল্মীকি যে কি এক অপূর্ব্ব কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কে বর্ণনা করিবে? সে কাব্যের মধ্যে এই অংশটুকু লিখিবার সময় কবির প্রাণ কত কাঁদিয়াছিল কে বলিবে? কিন্তু রামায়ণের এই শোকের জলন্ত চিত্রটী যখন পাঠ করা যায়, তখনই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, শোকে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। সেই বাল্মীকির চরণসেবী কৃত্তিবাসের 'রামবনবাস গানে' বাঙ্গালী বহুদিন হইতে কাঁদিতেছে। সে গান যখনি শোনে, তখনি তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গিয়া অজস্রধারে কাঁদিতে থাকে। এমন প্রাণ-কাঁদান কথা বুঝি আর নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু সেই কথা ধরিয়া এই নাটক লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার নাটক পড়িতে পড়িতে কত সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। কল্পনাবলে তিনি যে দুই একটী চিত্র নূতন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর এবং মনোমদ হইয়াছে। লক্ষ্মণ যেখানে রামচন্দ্রকে সাজাইবার জন্য ফুলের মালা গাঁথিতেছেন আর আপনাআপনি মনের হরষে ভবিষ্য সুখ

এই কথা ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই। বঙ্কিম বাবু লেখিলেন, 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।' মাইকেল মধুসূদন কবিতা রচনা করিলেন "কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী" আবার এক দিন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস পাঁচালীতে গাহিয়াছিলেন—"পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরে পিরালী খোঁটা" —ইত্যাদি। মনে করিলে অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কিন্তু ফল কথা, এ কথার ব্যবহার আদৌ হইল কিসের জন্য? মৃণাল পদ্মের কোন্ পদার্থ? চলিত কথায় মৃণালকে মোলাম বলে। মোলাম দেখিতে সাদা, খাইতে বড় নরম, উহাতে কাঁটার সম্পর্কও থাকে না—মূল হইতে যে মোটা শিকড়টী মাটীর ভিতর প্রবেশ করে তাহাকে মোলাম বা মৃণাল কহে। মৃণালে কণ্টক—এ কথা কে বলিল? কণ্টক থাকে পদ্মের ডাঁটার গায়ে: সে ডাঁটাকে মৃণাল বলে না, তাহার নাম 'পদ্মনাল।' আমরা এই ভ্রমের কথা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এ অন্যায় ভ্রম দূর হওয়া উচিত। উপেন্দ্র বাবুর বোধ হয় এই প্রথম রচনা। লেখায় অনেক অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইল। ভাষা মন্দ হয় নাই, চরিত্র গুলি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। মোটের উপর, আমরা এখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মাঝে মাঝে গান গুলার ব্যবস্থা না করিলে বোধ হয় ভাল হইত।

বিলাতী সতী।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল, বিষয়ও ভাল; কিন্তু লেখা ভাল বলিতে পারিলাম না। গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধেও একটী কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে—গ্রন্থকার পুস্তক লিখিলেন বাঙ্গালা ভাষায়, লিখিলেন—বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের পড়িবার জন্য; কিন্তু 'বিলাতী' কেন? পৃথিবী মধ্যে ভারত চিরদিন হইতে আদর্শ-সতীত্বের আকরভূমি, ভারতললনাকে সতীত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ভারত ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাতে যাইবার কি দরকার ছিল? সীতা সাবিত্রীর ন্যায় তেমন সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোন্ স্থানে পাইবে?